দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী সমন্বিত

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

সার সংকলন

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ মাঘ ১৩৬৭

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীমন্মথনাথ পান

নবীন সরস্বতী প্রেস

১৭, ভীম ঘোষ লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভূমিকা	১
পুরাণ পরিচয়	৫
মার্কণ্ডেয় পুরাণের সার সংকলন	২৫
চটক পক্ষীদের কথা	২৫
চতুর্ব্যূহ অবতার কথা	৩২
ইন্দ্র বিক্রিয়া কাহিনী	৩৪
বলদেবের ব্রহ্মহত্যা	৩৫
হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান	৩৭
আড়ি বকের যুদ্ধ	৪৮
জন্ম মৃত্যু জন্মান্তর ও নরক বর্ণনা	৪৯
বিপশ্চিৎ রাজার নরক ভোগ	৫৩
পতিব্রতার কাহিনী	৫৮
দত্তাত্রেয়র কথা	৬২
কুবলয়াশ্ব ও মদালসার উপাখ্যান	৬৫
অলর্কের উপাখ্যান	৭৯
ব্রহ্মার উৎপত্তি ও তাঁর আয়ুর পরিমাণ	৮৫
সৃষ্টির কথা	৮৯
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা	৯৫
জম্বু দ্বীপ তথা বর্ষ-বর্ণনা	৯৬
স্বরোচির উপাখ্যান	১০২
উত্তমের উপাখ্যান	১১৪
তামসের উপাখ্যান	১২৩
রৈবতের উপাখ্যান	১২৫
চাক্ষুষের উপাখ্যান	১২৯
বৈবস্বত ও সাবর্ণির উপাখ্যান	১৩১

শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য

মধু কৈটভ বধ	১৩৬
মহিষাসুর বধ	১৪২
দেবীস্তব	১৪৮
শুম্ভ ও নিশুম্ভ কথা	১৫৬
ধূম্রলোচন বধ	১৬৪
চণ্ড মুণ্ড বধ	১৬৫
রক্তবীজ বধ	১৬৭
নিশুম্ভ বধ	১৭০
শুম্ভ বধ	১৭২
দেবীর বরদান	১৭৩
দেবীমাহাত্ম্যের ফলশ্রুতি	১৮১

রুচির উপাখ্যান	১৮৫
ভূতির উপাখ্যান	১৮৮
সূর্যের কথা	১৯০
রাজ্যবর্ধনের উপাখ্যান	১৯৭
ইলার কথা	২০০
পৃষধ্রের কথা	২০০
নাভাগের উপাখ্যান	২০১
বৎসপ্রীর উপাখ্যান	২০৫
খনিত্রের উপাখ্যান	২০৭
ক্ষুপ ও বিবিংশের কথা	২০৯
খনীনেত্র করন্ধম অবীক্ষিত ও মরুত্তের উপাখ্যান	২০৯
নরিষ্যন্ত ও দমের উপাখ্যান	২২৩
মার্কণ্ডেয় পুরাণের ফলশ্রুতি	২২৭

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভূমিকা

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং এই পুরাণের মতে এর ক্রম সপ্তম। বিষ্ণুপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত নারদপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বরাহপুরাণ মৎস্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণে এই মত সমর্থিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে এর শ্লোক সংখ্যা ষোল হাজার এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে আঠারো হাজার। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি পুরাণের মতে এর শ্লোক সংখ্যা নয় হাজার। এখন যে পুরাণ পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ নয়। এতে ৬,৯০০ শ্লোক আছে। অনেকে মনে করেন যে এটি প্রথম খণ্ড এবং শেষ খণ্ডটি পাওয়া যায় না। এই মত যুক্তিযুক্ত মনে হয় এই কারণে যে সূর্য বংশের পরিচয়ে নরিষ্যন্ত চরিতের পর আর কোন রাজার বিবরণ নেই। সূর্য বংশে এই রকমের অনেক রাজা ছিলেন, এই কথা বলেই গ্রন্থ শেষ হয়েছে এবং পরের অধ্যায়ে পুরাণের ফলশ্রুতি। এটি আকস্মিক বলেই মনে হয়। অনেকের ধারণা যে এর পরে ইক্ষ্বাকু চরিত, তুলসী চরিত, রামচন্দ্র কথা, কুশ বংশ, সোম বংশ, পুরূরবা, নহুষ ও যযাতি চরিত, যদু বংশ, কৃষ্ণের বাল্য ও মাথুর লীলা, দ্বারকা চরিত, সাংখ্য কথা, প্রপঞ্চতত্ত্ব ও মার্কণ্ডেয় চরিত বর্ণনার পর গ্রন্থ শেষ হয়েছিল। এই অংশ যুক্ত হলে শ্লোক সংখ্যা নিঃসন্দেহে নয় হাজার হবে।

অধ্যাপক উইলসন এই পুরাণকে প্রাচীন বলে মেনে নিলেও এর রচনা কাল নবম বা দশম শতাব্দী বলে স্থির করেছেন। কিন্তু এই মত নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য বাণ ও ময়ূর ভট্টের রচনায় এই পুরাণের উল্লেখ আছে। কাজেই এই পুরাণ খানি যে সেকালে প্রচলিত ছিল, তা মেনে নিতেই হয়।

এই পুরাণে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নেই এবং এতে এমন অনেক কথা আছে যা অন্য কোন পুরাণে নেই। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে এই মহাপুরাণে প্রক্ষিপ্ত কিছু আছে বলে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই একে প্রাচীন ও নির্ভেজাল বলে মনে করাই সঙ্গত।

আর একটি বিস্ময়ের কথা এই যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোনখানে বেদব্যাস নামের উল্লেখ নেই। মার্কণ্ডেয় ঋষিও এর বক্তা নন, তাঁর বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে পক্ষীদের কথায়। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মার্কণ্ডেয়র নিকটে এসেছিলেন মহাভারতের কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এবং মার্কণ্ডেয় তাঁকে পক্ষীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই মীমাংসার প্রসঙ্গেই অন্য বিষয়বস্তু এসে পড়েছে।

এই পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী নামে বিখ্যাত। মহাভারতে যেমন গীতা, তেমনি মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ রূপে স্বীকৃত। একে দুর্গাস্তবও বলা হয়। এক সময়ে বাঙলায় নিত্য চণ্ডীপাঠের প্রথা ছিল এবং অনেক গৃহেই চণ্ডীমণ্ডপ থাকত। এখনও দুর্গাপূজা ও শুভকাজে চণ্ডী পাঠের প্রথা অব্যাহত আছে। এই কথা স্মরণ রেখে এই পুরাণের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য অংশের সার সংকলন না করে প্রায় সম্পূর্ণ অনুবাদ করা হয়েছে এবং স্তোত্রগুলি পাঠের উপযোগী করে অনূদিত হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্য মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলিও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হল।

মন্বন্তরের কথাতেই দেবীমাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ। স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র বংশের রাজা সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মহর্ষি মেধসের নিকটে মহামায়ার স্বরূপ অবগত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পূজা করে তাঁরই বরে সূর্যের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে সাবর্ণি মনু হয়েছিলেন। এই কাহিনীই দেবী মাহাত্ম্যের কাহিনী। এরই প্রচলিত নাম চণ্ডী।

রাজা সুরথ দেবীর কী রূপের মূর্তি নির্মাণ করে কোন্ ঋতুতে পূজা করেছিলেন, দেবী মাহাত্ম্যে তার উল্লেখ নেই। তবে এ

কথা আছে যে রাজা তিন বৎসর দেবীর আরাধনা করে তাঁর দর্শন লাভ করেছিলেন। কী রূপে কখন দেবী তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, তা জানা যায় না। তবে কিংবদন্তী আছে যে রাজা সুরথ বসন্তকালে পূজা করেছিলেন এবং শরৎকালে পূজা করেছিলেন রাম। এই জন্যেই বসন্তে বাসন্তী ও শরতে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে।

গত জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। বিষ্ণুপুরাণের জনপ্রিয়তায় তা সম্ভব হল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। কোন দৈনিক সংবাদপত্রে এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'সার সংকলন করতে গিয়ে তাঁকে বহু অংশ বর্জন করতে হয়েছে, ফলত উপাখ্যানের পূর্ণাঙ্গ ঘটনা বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। শাম্বের মত ত্যাগী উজ্জ্বলতম ব্যক্তির কথা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন পাঠকের মনঃপূত নাও হতে পারে।' এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণে শাম্বের কোন উপাখ্যান নেই, বলরামের বারম্বের কথায় শাম্বের বিবাহের উল্লেখ মাত্র আছে। মহাভারতের মৌষল পর্বে শাম্বের মুষল প্রসবের কাহিনী তাঁর ভিন্ন চরিত্রের পরিচয় দেয়। কৃষ্ণ যে জন্য শাম্বকে শাপ দেন, তাও তাঁর নিন্দনীয় চরিত্রের প্রমাণ। অবশ্য শাম্ব নামের একখানি উপপুরাণ আছে। তার আলোচনা এখানে অবান্তর। শুধু এইটুকু বলা দরকার যে সার সংকলনে কোন উপাখ্যান বাদ দেওয়া হয় নি, সংক্ষেপ করে মূলের রসও ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। কিছু পুনরুক্তি বা অবান্তর প্রশ্নোত্তর বর্জন করে কাহিনীকে সাবলীল ও সরস করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত মূল ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করে এই পুরাণ প্রকাশিত হচ্ছে। পুরাণ পরিচয়ের উপাদান

সংগৃহীত হয়েছে মুখ্যত নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত 'বিশ্বকোষ', দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাস' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারতকোষ' থেকে।

গ্রন্থকার

'রম্যাণি'
বি-এফ. ৭৭, সল্ট লেক সিটি
কলিকাতা-৭০০০৬৪।

পুরাণ পরিচয়

পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরা ভবম্ ইতি পুরা-ট্যু বা তুট, নিপাতনে তুড় ভাব বা 'ত' লোপ পেয়ে পুরাণ হয়েছে। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর এক বিশেষ গ্রন্থের নাম ছিল পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে এর উৎপত্তির কথা আছে। অথর্ব বেদে আছে যে যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট থেকে ঋক্ সাম ছন্দ ও পুরাণ উৎপন্ন হয়েছিল।—ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুবাণং যজুসা সহ (অথর্ব ১১. ৭. ২৪)। এই রকমেরই কথা আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ (২. ৪. ১০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪. ৬. ১০. ৬)।—ভিজে কাঠের আগুন থেকে যেমন পৃথক ধোঁয়া বার হয়, তেমনি সমস্ত বেদ ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সেই মহান ভূতের নিঃশ্বাস। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ।—ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম (৭.১.১)। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের প্রার্থনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল, কতকটা সেই ভাবেই ঋষিরা পুরাণও পেয়েছিলেন। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে 'পুরাণ বেদ, এ সেই বেদ' এই কথা বলে অধ্বর্যু পুরাণ কথা বলেন।—অধ্বর্যুস্তার্ক্ষ্যো বৈ পশ্যতো রাজেত্যাহ···পুরাণং বেদঃ সোহয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত (১৩. ৪. ৩. ১৩)।

এখন যেমন পুরাণকে ইতিহাস মনে করা হয় না, সেকালেও তা হত না। ইতিহাস শব্দটিও প্রচলিত ছিল এবং তার একটি বিশেষ অর্থ ছিল। বেদের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন যে বেদে দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি ঘটনার নাম ইতিহাস।—দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। এবং আগে অসৎ ছিল, আর কিছু ছিল না, ইত্যাদি জগতের আদিম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির বিবরণের নাম পুরাণ।—ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং

জগতঃ প্রাগবস্থানুপক্রম্য সর্গ প্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্। শঙ্করাচার্যও তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে একই কথা লিখেছেন—উর্বশী পুরূরবার সংবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস এবং সর্বাগ্রে শুধু অসৎ ছিল ইত্যাদি বিবরণের নাম পুরাণ।

একালে অবশ্য পুরাণের এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেকালে যা ইতিহাস বলা হত, তাও এখন পুরাণের অন্তর্গত হয়েছে। অর্থাৎ সেকালের মানুষ যা ইতিহাস বলে মনে করতেন, একালের মানুষ তা আর ইতিহাস মনে করেন না। দেবাসুরের যুদ্ধ বা উর্বশী পুরূরবার কাহিনী এখন পুরাণেরই অন্তর্গত হয়েছে। সূর্য বংশের রাম বা চন্দ্র বংশের কৃষ্ণকে এখন আর ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে পুরাকালে পুরাণ নামে একখানি পবিত্র গ্রন্থ ছিল। কিন্তু আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র মনু-সংহিতা ও মহাভারতে পাওয়া যায় যে পুরাণের সংখ্যা অনেক। শিব পুরাণের রেবা খণ্ডে আছে যে বেদব্যাস ছিলেন অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা।—অষ্টাদশ পুরাণানাং বক্তা সত্যবতী সুতঃ। পদ্ম পুরাণের সৃষ্টি খণ্ডেও ঠিক একই কথা আছে। কিন্তু মৎস্য পুরাণে স্পষ্ট ভাষায় আছে যে প্রথমে একখানি পুরাণই ছিল। পুরাণমেকমেবাসীৎ (৫৩.৪)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও আছে যে সকল শাস্ত্রের আগে ব্রহ্মা পুরাণ প্রকাশ করেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়।—

প্রথমং সর্বশাস্ত্রানাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা॥ (১.৫৮)

এই পুরাণে এ কথাও স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে বেদব্যাস একখানি মাত্র পুরাণ সংহিতা প্রচার করেন।

এই সব পৌরাণিক উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মহর্ষি বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতাটি প্রচার করেছিলেন, তাতে তিনি প্রাচীন

পুরাণ ও ইতিহাসকে একত্র করে তাকেই পুরাণ সংহিতা বলেছিলেন। সংহিতা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এই রকম। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে পুরাণ, তাতে এই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচীন ঋষিদের বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার কথা ছিল। এই অংশের রচয়িতার নাম জানা যায় না বলেই তাকে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসের কথা, পূর্বে যা ইতিহাস নামেই প্রচলিত ছিল। এই একখানি গ্রন্থ থেকেই পরবর্তী কালে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি রচিত ও প্রচলিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বেদব্যাস যদি নিজে এই মহাপুবাণগুলি রচনা করতেন, তাহলে একই বিষয়বস্তু সকল গ্রন্থে আলোচিত হত না এবং বিভিন্ন পুরাণে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হত না।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে বেদব্যাস আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পশুদ্ধি দিয়ে পুরাণ সংহিতাটি রচনা করেন। নিজের চোখে দেখে যা লেখা হয় তার নাম আখ্যান, উপাখ্যান হল পরম্পরাশ্রুত কথা, পরলোক ও অন্যান্য বিষয়ে গীতের নাম গাথা এবং শ্রাদ্ধকল্পাদি নির্ণয়কে কল্পশুদ্ধি বলা হয়। বেদব্যাস তাঁর সূত জাতীয় শিষ্য রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণকে এই পুরাণ সংহিতা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের অধিকাংশ পুরাণই এই সূতের মুখে বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সূত নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই বলে যে সূত তাঁদের জাতায় নাম এবং পুরাণ পাঠ তাঁদের জাতীয় ধর্ম। বেদব্যাসের শিষ্য সূতের বর্ণনায় শ্রোতাদের দেহ রোমাঞ্চিত হত বলেই তাঁর নাম রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ হয়েছিল। সেদিন এই পুরাণ ছিল প্রাচান ভারতের ইতিহাস। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে বেদব্যাসের কাল পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এই পুরাণ সংহিতায় বিধৃত হয়েছিল।

সেকালে পুরাণ সংহিতা কোন ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হত না। তা হলে বেদব্যাস সূতকে পুরাণ সংহিতা দিতেন না। সূতের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পুরাণ সংহিতা ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হলে বেদব্যাস নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে এই গ্রন্থ দিতেন। বেদের মতো পুরাণও ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত হত। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দ্বিতীয় ভাগে ঠিক এই কথাই লিখেছেন, 'পুরাণে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের চরিত্র বিষয়ের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ দেওয়া ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখনকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথন, দেবার্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। যদি ধর্মোপদেশ দান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্বতন পুরাণেরও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সূত জাতির ব্যবসায় না হইয়া অধুনাতন ব্রাহ্মণ কথকের ন্যায় ষটকর্মশালী ব্রাহ্মণ বর্ণেরই বৃত্তি বিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত। ঋষি, মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির ব্যবসায় হওয়া কদাচ সম্ভব নয়।'

রোমহর্ষণের ছয়জন শিষ্য ছিল বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে তিনজন কশ্যপ বংশীয়ের নাম শাংসপায়ন অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। এঁরা তিনজন গুরুর কাছ থেকে পাওয়া মূল পুরাণ সংহিতা অবলম্বন করে এক একখানি নূতন পুরাণ রচনা করেন। এই ভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচয়িতা পুরাণগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। পুরাণগুলির ভাষা ভাব ও রচনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করে এই কথাই প্রমাণ হয় যে একটি সুবিস্তৃত কালের মধ্যে পুরাণগুলি রচিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণু পুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে,

কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন, যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এক এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণু পুরাণ কিংবা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না।'

এই প্রসঙ্গেই পুরাণগুলির রচনা কালের কথা এসে পড়ে। সাধারণ ভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা এবং তিনি দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। পুরাণেই এই হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু প্রফেসর এইচ. এইচ. উইলসন বলেছেন, 'And the testimony that establishes their existence three centuries before Christianity, carries it back to a much more remote antiquity—to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world.' তাঁর মতে খ্রীষ্টের জন্মের তিনশো বছর আগে এই পুরাণগুলি যে বিদ্যমান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সব প্রমাণ দেখা যায় তাতে আরো অনেক প্রাচীন-কালে—প্রাচীন পৃথিবীর কোন জাতির কল্পনায়ও যা আসতে পারে না, তেমন অতীতে—এই সব পুরাণ বিদ্যমান ছিল বলা যেতে পারে। এই সশ্রদ্ধ মন্তব্যে এ দেশের পণ্ডিতরা সুখী হতে পারেন না। পাঁচ হাজার বছরকে তিনশো বছর বলায় তাঁদের সংস্কারে বোধহয় আঘাত লেগেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, বিষ্ণু পুরাণে ভবিষ্যৎ রাজ-বংশের কথায় বুদ্ধ ও নন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরুষের উল্লেখ দেখেই

তাঁর মনে হয়েছে যে গ্রন্থখানি এই সময়ের পরে রচিত। ভবিষ্যৎ রাজবংশের কথা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে, সে কথা তাঁর মনে হয় নি, বা হলেও সে সম্ভাবনার কথা তিনি মেনে নেন নি। সে যুগে ছাপাখানার সৃষ্টি হয় নি। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তখন হাতে লিখে রক্ষা করা হত এবং পণ্ডিতরা এই কাজ করবার সময়ে যে কিছু যোগ করতেন না, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক গ্রন্থেই অনেক শ্লোক অনায়াসে প্রক্ষিপ্ত হত।

যে পুরাণে শুধু সৃষ্টি রহস্যের বিবরণ ছিল, নিঃসন্দেহে তা বৈদিক যুগের। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের কল্পনায় উদিত হয়েছিল, এই পুরাণও তেমনি তাঁদের তপস্যার ফল। বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড মৎস্য প্রভৃতি পুরাণেই পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ পাওয়া যায়। সেগুলি হল সর্গ বা সৃষ্টিসত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা লয় ও পুনস্‌সৃষ্টি, দেবতা ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। বংশানুচরিতে সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদের বিবরণ। বৈদিক পুরাণে শুধু সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনা ছিল বলে মেনে নিতে হয় যে পরবর্তী কালেই পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। হতে পারে যে বেদব্যাস সঙ্কলিত প্রথম পুরাণ সংহিতার এই পঞ্চ লক্ষণ পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার আদর্শ বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বেদব্যাস সঙ্কলিত মূল পুরাণ সংহিতাও যে অতি প্রাচীন কালে রচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাকে পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন বলা উচিত কিনা তার বিচার এখন অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে অনেক পরবর্তীকালের রচনা, তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম নিয়েও কিছু মতবিরোধ আছে। যেমন, কেউ বলেন যে বিষ্ণু পুরাণের পর শিব পুরাণ, কেউ বলেন বায়ু পুরাণ বিষ্ণু পুরাণের পর। কারও মতে শিব ও বায়ু পুরাণ একই, আবার অন্যের মতে এই দুটি পুরাণ ভিন্ন। শিব পুরাণও দুখানি আছে।

ভাগবত নিয়েও এই রকম মতভেদ আছে। বৈষ্ণবরা শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বলেন ; কিন্তু শাক্তরা বলেন দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ। কাজেই এই দুই পুরাণের একটিকে মহাপুরাণ ও অন্যটিকে উপপুরাণ বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতই মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত।

এই সব পুরাণের ক্রম নিয়েও পুরাণে পুরাণে বিরোধ আছে। এই বিষয়ে বিষ্ণু পুরাণের মতই সর্বাধিক গ্রাহ্য। ক্রমানুসারে বিষ্ণু পুরাণ তৃতীয়। কাজেই তার পরে যে সব পুরাণ রচিত হয়েছে তার ক্রম নির্দেশ যে বিষ্ণু পুরাণে সম্ভব নয়, তাও স্বীকার করতে হয়। মোটামুটি ভাবে সমন্বয় করে যে ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই ভাবেই পুরাণগুলির আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় উইলসন সাহেবের মতও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

প্রথম ব্রহ্ম পুরাণ। এর পূর্ব ভাগে সৃষ্টি প্রসঙ্গে দেবাসুরের জন্ম বৃত্তান্ত এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনায় বিষ্ণু পুরাণের সঙ্গে মিল অত্যন্ত বেশি। এতে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নেই। উড়িষ্যার মন্দিরের বর্ণনা দেখে মনে হয় যে এই পুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দের পরে রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ম পুরাণ। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণ দ্বিতীয় বৃহত্তম। অথচ পুরাণের প্রকৃত লক্ষণ এতে নেই। সৃষ্টি খণ্ডে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ভূমি খণ্ডে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল, স্বর্গ খণ্ডের প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরে তীর্থের মাহাত্ম্য ও ধর্মালোচনা, পাতাল খণ্ডে রামায়ণের একটি অংশ এবং উত্তর খণ্ডে ধর্মতত্ত্বের বিবৃতি। এই পুরাণে ভারতে ম্লেচ্ছের আগমন জৈন আচার ও আধুনিক বৈষ্ণবদের চিহ্ন ধারণের প্রসঙ্গ দেখে অনেকেই এটি দ্বাদশ শতাব্দের পরের রচনা মনে

করেন এবং শেষ খণ্ডটি পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দে রচিত বলে অনুমান করেন।

তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ। এই পুরাণ ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সৃষ্টি বিবরণ ও ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে ভরত বংশের বিবরণ ও জম্বু দ্বীপ ও সপ্ত পাতাল প্রভৃতির বর্ণনা, তৃতীয় অংশে মন্বন্তর ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি, চতুর্থ অংশে সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, পঞ্চম অংশে কৃষ্ণের কথা ও ষষ্ঠ অংশে কলির বর্ণনা আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে ভবিষ্য রাজবংশের বিচার করে একাদশ শতাব্দের মধ্য ভাগ পাওয়া যায়। বৌদ্ধরাও এ দেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। কাজেই এই সময়ের মধ্যেই বিষ্ণু পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

চতুর্থ বায়ু বা শিব পুরাণ। বায়ু পুরাণ নামে যে পুরাণ এখন প্রচলিত আছে, তা সব চেয়ে প্রাচীন ও পুরাণের সমস্ত লক্ষণ যুক্ত। ছটি সংহিতায় বিভক্ত শিব পুরাণের একটি সংহিতার নাম বায়বীয় সংহিতা, পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ নামে তার ছুটি ভাগ। শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে শিবের বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম, কাশী মাহাত্ম্য ও শিবপূজার বিধি এই পুরাণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম শ্রীমদ্ভাগবত। অনেকের মতে রচনার গুণ ও সাহিত্যিক মূল্যে এটি শ্রেষ্ঠ পুরাণ। অনেকেরই ধারণা যে এটি বেদব্যাস বিরচিত এবং বিষ্ণু পুরাণের সমকালীন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার এই পুরাণের উদ্দেশ্য বলে বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থের পূজা করেন। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি স্কন্ধ আছে এবং অন্যান্য পুরাণের ন্যায় নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণনাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পুরাণের মতে সকলের

উপরে ভক্তি এবং ভক্তি থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শাক্ত মতে দেবী ভাগবতই পঞ্চম পুরাণ। এই পুরাণটিও দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত এবং দুটি ভাগবতেই শ্লোকের সংখ্যা আঠারো হাজার। দেবী ভাগবতে দেবী দুর্গার চরিত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ নারদ পুরাণ। চার পাদে বিভক্ত এই পুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্তন করা হয়েছে। হরির উপাসনায় যে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তা নানা উপাখ্যান দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা আছে। নারদীয় ও বৃহন্নারদীয় নামে একই রকমের দুখানি পুরাণ আছে। এই পুরাণের শেষাংশে আছে যে দেবনিন্দক ও গোঘাতকের নিকট যেন এই পুরাণ পাঠ না করা হয়। এর থেকেই অনুমান করা হয় যে মুসলমান অধিকারের পর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দে এই পুরাণ রচিত হয়েছে। এতে পুরাণের লক্ষণ নেই বলে একে পুরাণ না বলে ভক্তিগ্রন্থ বললেই ভাল হত।

সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই পুরাণে সৃষ্টি রহস্য, দর্শন, তীর্থ মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ তো আছেই, তার উপরে নানা সুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে আছে দেবী মাহাত্ম্য নামে দুর্গা স্তব। এই দুর্গা স্তব চণ্ডী নামে হিন্দুর গৃহে পূজার মতো শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করা হয়। পুরাকালে চণ্ডীমণ্ডপে নিত্য চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা ছিল। এই পুরাণটি অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন এবং নবম বা দশম শতাব্দে সংগৃহীত বলে অনুমান করা হয়।

অষ্টম অগ্নি পুরাণ। অগ্নির নিকট থেকে পাওয়া বলে এই পুরাণ অগ্নি পুরাণ নামে অভিহিত। এই পুরাণে অবতারের কথা, রামায়ণ মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনী এবং পূজা ও ব্রত পদ্ধতি, দেব-দেবীর আকার বর্ণনা ও তীর্থ মাহাত্ম্যের সঙ্গে নানা শাস্ত্রের আলোচনা আছে। যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও পশু চিকিৎসা, সাহিত্য ব্যাকরণ ছন্দ-

প্রকরণ রাজধর্ম ও রত্ননিরূপণ এবং ব্যাকরণ অংশে ধাতু ও শব্দ-রূপও পাওয়া যায়। যুদ্ধপ্রণালী ও অস্ত্রাদি নির্মাণের পদ্ধতি, দুর্গ ও নগর নির্মাণের কৌশল, এমন কি তন্ত্রের বীজমন্ত্রও এই পুরাণে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে কোন প্রাচীন পুরাণ বলে মনে হয় না, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংকলন।

নবম ভবিষ্য পুরাণ। এই পুরাণের পাঁচটি পর্বে ব্রহ্মের প্রাধান্য প্রকাশের প্রয়াস আছে। প্রথম চারটি পর্বে সংক্ষেপে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনার পরে বিষ্ণু শিব ও সূর্য পূজা ও এই দেবতাদের মাহাত্ম্যের বিশদ বর্ণনা আছে। পঞ্চম পর্বে স্বর্গের বর্ণনা। প্রাচীন রাজবংশের কাহিনীও এই পুরাণে আছে। এরই মধ্যে শাক দ্বীপের সূর্য-উপাসক মগ জাতির উল্লেখ দেখে উইলসন সাহেব মনে করেন যে এতে ইরাণের অগ্নি-উপাসকদের কথা বলা হয়েছে। বম্বে থেকে প্রকাশিত ভবিষ্য পুরাণে মোগল বাদশাহ আকবরের কথা, কলকাতার বর্ণনা এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের নাম দেখে অনেকে একে পুরাণ না বলে আধুনিক গ্রন্থ কিংবা কতকগুলি বিষয়কে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত। ব্রহ্ম খণ্ডে সৃষ্টির ব্যাপারে কৃষ্ণের দেহ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি দেখানো হয়েছে, প্রকৃতি খণ্ডে সৃষ্টি কার্যে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী ও রাধা এই পঞ্চ প্রকৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, গণেশ খণ্ডে গণেশের কথা এবং কৃষ্ণের জন্ম খণ্ডে কৃষ্ণলীলার কথা। প্রকৃতি ও গণেশ খণ্ডে অনেক পৌরাণিক কাহিনাও স্থান পেয়েছে। রাধার প্রসঙ্গ আর কোন পুরাণে পাওয়া যায় না বলে অনেকেই মনে করেন যে এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেই রাধা কৃষ্ণ লীলার কথা প্রচলিত হয়েছে।

একাদশ লিঙ্গ পুরাণ। দুই ভাগে বিভক্ত এই পুরাণের উদ্দেশ্য শিব মাহাত্ম্য ও লিঙ্গ পূজার পদ্ধতি প্রচার। প্রথম ভাগে সৃষ্টি বিবরণের পর লিঙ্গের উদ্ভব ও পূজা, শিবের বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে বিষ্ণু ও শিব মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে আছে যে প্রলয়ের পরে যে অগ্নিময় লিঙ্গের উৎপত্তি হয়, তার জ্যোতিতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জ্যোতির্ময় হয়েছেন। এই লিঙ্গ থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে পুরাণটি আধুনিক হলেও এই সময় থেকেই লিঙ্গ পূজার প্রচলন হয়েছে।

দ্বাদশ বরাহ পুরাণ। এই পুরাণে বরাহ অবতারের লীলা প্রসঙ্গ আছে। পুরাণের লক্ষণ, সৃষ্টি বিবরণ, দশাবতার তত্ত্ব, পূজাপার্বণ, ব্রত কথা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। অনেকে এটিকেও লিঙ্গ পুরাণের মতো পুরাণ না বলে একখানি ধর্মগ্রন্থ বলেন। রামানুজের কালের কথা দেখে এই পুরাণকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়।

ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ। এই বৃহত্তম পুরাণটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। কাশী উৎকল ও প্রভাস খণ্ডে এই তিনটি তীর্থ ও দেবতার মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। মহেশ্বর খণ্ডে শিবের ও বৈষ্ণব খণ্ডে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ব্রহ্ম খণ্ডে রামেশ্বর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক তীর্থের কথা আছে। অনেকে বলেন যে অবন্তী খণ্ড নামে আর একটি খণ্ডে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ আছে। এই খণ্ডগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত বলে মনে করা হয়। স্কন্দ পুরাণে এত তীর্থের বিবরণ আছে যে এটিকে তীর্থের পুরাণ বললে অনুচিত হবে না।

চতুর্দশ বামন পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর বামন অবতারের কাহিনীই প্রধান। অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী থাকলেও এই পুরাণে বিষ্ণু

প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তিন চার শো বৎসর পূর্বে কাশীবাসী কোন ব্রাহ্মণ এই পুরাণ সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

পঞ্চদশ কূর্ম পুরাণ। এই পুরাণের চারটি সংহিতার মধ্যে এখন শুধু ব্রহ্ম সংহিতাই পাওয়া যায় এবং এই সংহিতাটিই কূর্ম পুরাণ নামে প্রচলিত। এতে সৃষ্টি ও বংশ বিবরণ থেকে শুরু করে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও ক্রিয়া মাহাত্ম্য আছে। ঈশ্বর গীতায় দর্শন তত্ত্বের আলোচনায় ভক্তি সাঙ্খ্য ও জ্ঞান যোগ প্রভৃতি এবং ব্যাস গীতায় ব্রহ্মচারী ধর্মের কথা আছে। অনেকের মতে এই ঈশ্বর গীতা শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সঙ্গে তুলনীয়। শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য এই পুরাণে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এই পুরাণের মতে শিব পুরাণ ও বায়ু পুরাণ এই দুইটি মহাপুরাণ। এতে কয়েকটি তন্ত্র শাস্ত্রের উল্লেখ দেখে মনে করা হয় যে পুরাণখানি বেশি পুরাতন নয়।

ষোড়শ মৎস্য পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের কাহিনী প্রধান হলেও আরও অনেক পৌরাণিক কাহিনী, সূর্য ও চন্দ্র বংশ ও ভবিষ্য রাজ বংশের বিবরণ আছে। এতে মহাপুরাণের পঞ্চ লক্ষণ আছে; কিন্তু এই পুরাণে উপপুরাণের বর্ণনা দেখে অনেকে একে বেশি প্রাচীন বলে স্বীকার করেন না।

সপ্তদশ গরুড় পুরাণ। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণে গরুড়ের কোন কথা নেই। এতে অনেক পূজা প্রায়শ্চিত্ত ব্রতকথাদি আছে, রত্ন পরীক্ষা, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ, স্ত্রী বশীকরণ, মশক নিবারণের কথাও আছে! এ ছাড়া সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ নানা পৌরাণিক কাহিনী ও নরকের বর্ণনা আছে। এই পুরাণে অনেক নীতি কথা ও রাজ ধর্মের কথাও পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। স্কন্দ পুরাণের সব কয়টি খণ্ড যেমন একত্রে পাওয়া যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও পাওয়া যায় না। বায়ু পুরাণের শেষ অংশের নাম ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হয়েছে কিনা বোঝা যায় না। এখন যা পাওয়া যায় তাতে অনেক পৌরাণিক কথা আছে। তার মধ্যে প্রধান হল সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই রামায়ণের অন্তর্গত রাম গীতায় অনেক দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে।

উপরে উক্ত পুরাণগুলির সংকলন কাল সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতেরা যে মত প্রকাশ করেছেন, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত তা মেনে নিলেও অনেকে তা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেন যে প্রধান পুরাণগুলির সঙ্কলন কাল বৈদিক যুগের ঠিক পরেই। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের অনুবাদ করেছিলেন ডক্টর বুহ্লার। তিনি ঐ গ্রন্থখানি তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলে মনে করেন, এমন কি পাণিনির পূর্বেও তা রচিত হয়ে থাকতে পারে বলেছিলেন। এই গ্রন্থে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবের কোন উল্লেখ না থাকায় এটি খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দে রচিত বলে মনে করা হয়। আর এই গ্রন্থে কোন পুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণের মতে ভবিষ্য পুরাণের ক্রম নবম বলে সে সময়ে এর পূর্বেকার আটখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল ভাবলে অনুচিত হবে না। যবদ্বীপে যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাওয়া যায় তা এ দেশের পুরাণ থেকে অভিন্ন। পঞ্চম শতাব্দে হিন্দুরা এই গ্রন্থ যবদ্বীপে নিয়ে যান এবং সেখানকার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভবিষ্য রাজবংশের উল্লেখ নেই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণের শেষ পুরাণ এবং এর থেকেই প্রমাণ হয় যে পঞ্চম শতাব্দের পূর্বেই সমস্ত পুরাণগুলি রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্য রাজবংশ এর পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতে তখন গুপ্ত যুগের শেষ অবস্থা। অনুমান করা যেতে পারে যে ষষ্ঠ শতাব্দে গুপ্ত যুগের শেষ রাজারাই

নিজেদের নাম পুরাণে প্রক্ষেপ করিয়েছেন। এই ভাবে বিচার করলে মেনে নিতে আপত্তি হবে না যে বিষ্ণু পুরাণ পরীক্ষিতের সময়, গরুড় পুরাণ জনমেজয়ের পর এবং জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সংকলিত হয়েছিল।

বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতা সঙ্কলন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য কোথাও লিপিবদ্ধ করে না গেলেও অনুমান করা শক্ত নয় যে সেটি শিক্ষামূলক গ্রন্থ ছিল। কী ভাবে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, প্রাণীর জন্ম হয়েছে কী ভাবে এবং পুরাকালে যে ইতিহাস প্রচলিত ছিল তাই সযত্নে সঙ্কলন করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য শ্রাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যে পরবর্তী কালে এই পুরাণ প্রচারের উদ্দেশ্য হয়েছিল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও শক্তির মহিমা প্রচার। অষ্টাদশ পুরাণে এই উদ্দেশ্যই উৎকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শৈব পুরাণকার শিবকে বলেছেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা, তেমনি বৈষ্ণব পুরাণকার বিষ্ণুকে এই সম্মান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে শাক্ত পুরাণকার ভগবতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তির জননী রূপেও প্রচার করেছেন। আবার সৌরগণের বর্ণনায় সূর্যই সকলের প্রসবিতা। লিঙ্গ পুরাণে শিব বলছেন, তোমরা দুই মহাবলই আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তুমি লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার ডান পাশে ও তুমি হৃদয়োদ্ভব বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমার বাম পাশে উৎপন্ন হয়েছ। শিব তাই বিষ্ণুকে বৎস বলে সম্বোধন করেছেন। এই ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলছেন, আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করছি এবং শিব তাঁর বশে সংহার করছেন। এই ব্রহ্মাই আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যে বলছেন, হে দেবী, তুমি আমার বিষ্ণুর ও শিবের শরীর উৎপাদন করেছ। ভবিষ্য পুরাণে সূর্যকেই সকলের প্রসবিতা বলা হয়েছে।

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে অষ্টাদশ

পুরাণের মধ্যে দশটিতে শিবের, চারটিতে ব্রহ্মের, দুটিতে বিষ্ণুর এবং দুটিতে ভগবতীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এই পুরাণেরই সম্ভব কাণ্ডে পাওয়া যায় যে শিব লিঙ্গ স্কন্দ ব্রহ্মাণ্ড ভবিষ্য মার্কণ্ডেয় মৎস্য কূর্ম বরাহ ও বামন এই দশটি পুরাণে শিবের, বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় ও নারদ এই চারখানি পুরাণে বিষ্ণুর, ব্রহ্ম ও পদ্ম এই দুটি পুরাণে ব্রহ্মার, অগ্নি পুরাণে অগ্নির ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সূর্যের মহিমা প্রচারিত হয়েছে। শাস্ত্রকাররা এই অষ্টাদশ পুরাণকে প্রধানত সাত্ত্বিক তামসিক ও রাজসিক অথবা বৈষ্ণব শৈব ও ব্রাহ্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বিষ্ণু নারদ শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় পদ্ম ও বরাহ এই ছখানি পুরাণ সাত্ত্বিক বা বৈষ্ণব পুরাণ, শিব লিঙ্গ মৎস্য কূর্ম স্কন্দ ও অগ্নি এই ছখানি পুরাণ তামসিক বা শৈব পুরাণ এবং ব্রহ্ম বামন মার্কণ্ডেয় ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত ও ব্রহ্মাণ্ড এই ছখানি রাজসিক বা ব্রাহ্মপুরাণ। শেষ পুরাণগুলিতে ব্রহ্মের প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে। এই বিভাগেও মতান্তর দেখা যায়। শুধু মতের বিরোধ নয়, সাম্প্রদায়িক বিরোধ। বিভিন্ন পুরাণে এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে বিরোধ, পুরাণকাররা নিজেরাই তার কারণ বলেছেন। বিরোধ ভঞ্জনের জন্য বলেছেন যে কল্প ভেদে রচনা ভেদ হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণ কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায়। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকেই দেবতা অনেক ও তাদের প্রত্যেকের উপাসনা প্রচলিত আছে। ঋষিরাও নিজেদের মনোমত দেবতার উপাসনা করতেন এবং সেই দেবতাকে সকলের প্রিয় করবার জন্য নানা ভাবে তাঁদের মহিমা কীর্তন করতেন। পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার সময়ে এই মনোভাবের জন্যই পুরাণে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে।

উপপুরাণগুলি সম্বন্ধেও নানা মত দেখা যায়। উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারো, এই কথাই সাধারণ ভাবে স্বীকৃত। সেগুলির নাম—আদ্য, নারসিংহ, স্কন্দ, শিবধর্ম, দুর্বাসা, নারদীয়, কাপিল, বামন,

উশনা, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পরাশর, মারী ও ভার্গব। অন্যত্র আরও পাঁচটি নাম পাওয়া যায়—বায়বীয় নান্দিকেশ্বর, পাদ্ম, দেবী ও ভাস্কর। এ ছাড়াও মহাপুরাণ বলে স্বীকার না করলে আরও কয়েকখানি মূল্যবান পুরাণ উপপুরাণের পর্যায়ে পড়বে। যেমন, শিব ও বায়ু পুরাণের মধ্যে যে কোন একখানি। নারদীয় পুরাণ শিব পুরাণকে মহাপুরাণ বলেছেন, আর পণ্ডিতরা বলেছেন যে কল্পভেদে কখনও বায়ু পুরাণ কখনও শিব পুরাণ মহাপুরাণ এবং অপরটি উপপুরাণ। তেমনি ভাগবত তিনখানি— শ্রীমদ্ভাগবত, দেবী ভাগবত ও বিষ্ণু ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বললে অন্য দুখানি উপপুরাণ। মহাভারতকেও অনেকে মহাপুরাণ বলেন। সে ক্ষেত্রে অন্য একখানি মহাপুরাণ উপপুরাণের তালিকায় আসবে। শৈব বৈষ্ণব ও শক্তি উপপুরাণ ছাড়াও আরও অনেক উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। সৌর গাণপত্য ও 'সঙ্কীর্ণ' উপপুরাণ। এই সমস্ত মিলিয়ে উপপুরাণের সংখ্যা একশোরও বেশি হতে পারে। এই সবের মধ্যে কল্কিপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু পুরাণের মতো বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণও আছে। বৌদ্ধরা তাদের নখানি পুরাণকে নবধর্ম বলে। জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের নামে এক একখানি পুরাণ আছে। তার মধ্যে আদি পদ্ম উত্তর ও অরিষ্টনেমি এই চারখানি পুরাণ প্রধান।

পুরাণের দেবতত্ত্ব বা অবতারবাদ আলোচনা করতে হলে বেদে এই দুটি প্রসঙ্গের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা দরকার। প্রাচীন আর্য সমাজে ব্রহ্মাই ছিলেন উপাস্য দেবতা। কিন্তু বিষ্ণু শিব ও শক্তির উল্লেখও বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। চারটি বেদেই বিষ্ণুর বহু মন্ত্র আছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণুও যে একজন প্রধান উপাস্য

দেবতা ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে যখন বেদের ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদগুলি রচিত হয় তখন অন্যান্য দেবতার চেয়ে ব্রহ্মার উপাসনাই প্রবল হয়ে ওঠে। চার বেদেই আমরা রুদ্রের নাম পাই। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় সংহিতায় রুদ্রাধ্যায় আছে। তাতে রুদ্রের শত নামের মধ্যে শিব ও মহাদেব আছে। সূর্যও প্রধান দেবতা, সমস্ত বেদেই তাঁর স্তব আছে। দুর্গা বা শক্তির উপাসনাও যে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে আছে, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রচিত পুরাণে এই বৈদিক দেবতারা সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছেন।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ব্রহ্মের উপাসনাই সবচেয়ে প্রাচীন, অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা পরে প্রচলিত হয়েছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি প্রধান দেবতাদের উপাসনাও প্রচলিত ছিল না বলে বৈদিক গ্রন্থে তার বর্ণনা নেই। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বৈদিক গ্রন্থে দেবতত্ত্বের যেরূপ আভাস, পুরাণে তাহাই সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছে। ফলতঃ পূর্বতন দেবতা বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত করিয়া পৌরাণিক বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বহুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তজনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া হিন্দু ধর্মের অভিনব রূপ উৎপাদন করা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র ক্রমশঃ কতই পরিবর্তিত ও কি বিপর্যস্তই হইয়াছে!'

এই অভিযোগ সর্বতোভাবে অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক গ্রন্থে আমরা অনেকগুলি অবতারের নাম দেখতে পাই। ঋগ্বেদে বামন অবতারের কথা, শতপথ ব্রাহ্মণে বামন মৎস্য কূর্ম ও বরাহ অবতারের কথা, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কূর্ম অবতারের কথা, তৈত্তিরীয়

সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের কথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরশুরাম এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষ্ণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব বৈদিক গ্রন্থে অবতার ব্রহ্মার, বিষ্ণুর নয়। বৈষ্ণব পুরাণকারেরা এই সব অবতার বিষ্ণুর নামে প্রচার করেছেন অনেক পরবর্তী কালে। ঠিক একই ভাবে শৈব পুরাণকার ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে শিবের নানা অবতারের কথা বলেছেন। সূর্যের অবতারের কথা বলা হয়েছে ভবিষ্য প্রভৃতি সৌর পুরাণে। শাক্ত পুরাণকারেরা মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে দেবীর অবতারের কথা বর্ণনা করেছেন।

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হবে যে বৈদিক গ্রন্থে এই অবতারবাদ পৃথিবীর সভ্যতার বিবর্তন প্রকাশে সহায়তা করেছিল। পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিল, তখন মৎস্য ছিল ব্রহ্মের বা ব্রহ্মার অবতার, পৃথিবী কর্দমাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হলে জন্ম হয় কূর্মের, তারপর ক্রমে ক্রমে বরাহ, বামন ও মনুষ্যের। এই ভাবেই পূর্ণাবয়ব মানুষ পৃথিবীতে এসেছে।

পুরাণে যে প্রাচীন ভারতের একটা বিশ্বস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে কোন সংশয় নেই। অন্তত এ দেশে লিখিত ইতিহাসের পূর্বে যে সব রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, তার পরিচয় শুধু পুরাণেই আছে। এ কথা বলেছিলেন এ দেশের পণ্ডিত ডি. আর. ভাণ্ডারকর এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেকে এ কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক ভি. এ স্মিথ বলেছিলেন যে মৎস্য পুরাণের অন্ধ্র রাজবংশ ও রাজাদের রাজত্ব কাল ভুল নয়। এ. বি. কীথ পুরাণের ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেও এফ. ই. পার্জিটার ও এল. ডি. বার্নেট মনে করেন যে বেদের চেয়ে পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। সব কথা হয়তো সত্য নয়, কিংবা কিছু অসঙ্গতিও হয়তো আছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি যে মুখ্যত এ দেশের ঐতিহাসিক দলিল, তাতে সন্দেহের

কোন অবকাশ নেই। সূর্য বংশের ইক্ষ্বাকু অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। তাঁর এক পুত্র নিমি ছিলেন বিদেহের রাজা। এই সূর্য বংশেরই এক রাজা বৈশালীতে রাজত্ব করতেন, আর একজন গুজরাতে। সূর্য বংশের কন্যা ইলা ও চন্দ্র বংশের পুরূরবা প্রতিষ্ঠান বা এলাহাবাদে রাজত্ব করেন। পুরূরবার পুত্র অমাবসু কনৌজে রাজা হয়েছিলেন, আর কাশীর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পৌত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। আধুনিক পণ্ডিতরা হিসাব করে দেখেছেন যে এইসব রাজকুলের আদি পুরুষ ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় দু হাজার বছর আগের মানুষ। অর্জুনের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের কথাও পুরাণে আছে। তারপরে ভবিষ্য রাজবংশের কথাও অনেক পুরাণে আছে। এই সব রাজাদের নাম আমাদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন শিশুনাগ নন্দ মৌর্য শুঙ্গ কণ্ব অন্ধ্র ও গুপ্তরাজাদের কথা। কী ভাবে এই সব নাম পুরাণে এসেছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শক, হূণ, যবন, আভীর প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী জাতির কথাও পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণে আছে বলেই এদের কথা ইতিহাস নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সৃষ্টি রহস্য ও প্রাচীন ইতিহাস ছাড়াও আরও অনেক রকমের কথা পুরাণে আছে। শুধু পূজাপদ্ধতি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দর্শন তত্ত্ব ও তীর্থ-মাহাত্ম্য নয়, রাজধর্ম যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা আয়ুবিদ্যা ও পশু চিকিৎসা সাহিত্য ব্যাকরণ ছন্দপ্রকরণ প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্মাণ দুর্গ নির্মাণ নগর ও গ্রাম পত্তনের কথাও আলোচিত হয়েছে। এই সব আলোচনায় তৎকালীন উৎকর্ষের পরিচয় জানা যায়। এক কথায়, এই সব পুরাণ প্রাচীন হিন্দু জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রায় বিশ্বস্ত ইতিহাস। শ্রদ্ধা সহকারে এই পুরাণগুলি পাঠ না করলে ভারতবাসী

তার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা অবহিত হতে পারবে না। ইদানীং দুষ্প্রাপ্য বলেই পুরাণ তার মূল্য হারিয়েছে, কিন্তু তাই বলে তার সত্য মূল্য বিন্দুমাত্র কমে নি। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো পুরাণও ভারতের অমূল্য রত্ন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

সার সঙ্কলন

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

যোগীরা পবিত্র চিত্তে যাঁর বন্দনা করেন, যা ভবভয়ার্তি বিনাশ করে, আবির্ভূত হয়েই যা ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোক অতিক্রম করেছিল, সেই হরির চরণ কমল যুগল সকলকে পবিত্র করুক। যিনি ক্ষীর সমুদ্রে ফণি-মণ্ডলে শয়ান, যিনি সকল পাপ তাপ ভেদে দক্ষ, যাঁর নিঃশ্বাসে জল আন্দোলিত ও উৎক্ষিপ্ত হয়ে সমুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্তিতে নৃত্য করে, তিনি সবাইকে পালন করুন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নরোত্তম নর, নারায়ণ, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসকে নমস্কার করে জয়প্রদ শাস্ত্র পাঠ করতে হয়।

চটক পক্ষীদের কথা

ব্যাসের শিষ্য মহাতেজা জৈমিনি তপ ও স্বাধ্যায় নিরত মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে বললেন, ভগবন, মহাত্মা ব্যাস যে ভারতকথা বলেছেন, তা অমল শাস্ত্রে পূর্ণ। বিষ্ণু যেমন দেবতাদের মধ্যে, ব্রাহ্মণ মানুষের মধ্যে, চূড়ামণি ভূষণের মধ্যে, বজ্র আয়ুধের মধ্যে ও মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান, তেমনি মহাভারত সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট। এতে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এবং তাদের প্রয়োগ বিধিও বর্ণিত আছে। এইজন্যই মহাভারত একাধারে উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও

মোক্ষশাস্ত্র। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের এই পঞ্চম বেদ মহাভারত একটি মহা হ্রদের মতো। কথা এর জল, বিবিধ আখ্যান পদ্ম ও সুমধুর শব্দ হংস। এই মহাভারতেরই কিছু কথা যথাযথ জানবার জন্য আমি আপনার নিকটে এসেছি। বিষ্ণু নির্গুণ হয়েও কী জন্য মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দ্রৌপদী কেন একা পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী হয়েছিলেন, পাপের প্রশমন কর্তা হয়েও বলদেব নিজে কেন তীর্থ যাত্রায় ব্রহ্মহত্যার পাপ করেছিলেন এবং দ্রৌপদীর পুত্ররা কেন অনাথের মতো নিহত হয়েছিলেন—আপনি আমার এই সব প্রশ্নের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

জৈমিনির এই প্রশ্ন শুনে মার্কণ্ডেয় বললেন, এখন আমাদের ক্রিয়াকাল উপস্থিত, তাই সবিস্তারে বলবার সময় এ নয়। যে পক্ষীরা সবিস্তারে বলে তোমার সন্দেহ দূর করবে, আমি তাদের বৃত্তান্ত বলছি, শোন। পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপুত্র ও সুমুখ—দ্রোণের এই চার পুত্রই তত্ত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞ। তুমি বিন্ধ্য পর্বতের কন্দরে তাদের নিকটে গিয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা কর।

মার্কণ্ডেয়র এই কথা শুনে জৈমিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, পাখি মানুষের মতো কথা বলতে পারে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। পাখি হয়েও এ রকম জ্ঞান তাদের কেমন করে হল? দ্রোণ কে? তাদের দ্রোণের পুত্রই বা কেন বলা হয়?

মার্কণ্ডেয় বললেন, পুরাকালে নন্দন কাননে যা ঘটেছিল, তাই তোমাকে বলছি, শোন। একদিন দেবর্ষি নারদ নন্দনে গিয়ে দেখলেন যে দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরাদের মধ্যে বসে তাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। দেবর্ষিকে দেখেই তিনি উঠে তাঁর নিজের আসনটি তাঁকে দিলেন। দেবাঙ্গনারাও বিনয়াবনত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর উভয়ে উপবেশন করে কথা বলতে লাগলেন। কথান্তরে দেবরাজ বললেন, এখানে রম্ভা, মিশ্রকেশী, উর্বশী, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা প্রভৃতি সবাই উপস্থিত আছে।

এদের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ হয় তাকেই নাচতে বলুন। দেবরাজের কথায় দেবর্ষি সবিশেষ চিন্তা করে অপ্সরাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে নিজেকে যে রূপে গুণে সবার সেরা মনে কর, সে আমার সামনে নাচুক। দেবর্ষির কথা শুনে সবাই পরস্পরকে বলতে লাগল, আমি সেরা, তুমি নও। তাই দেখে ইন্দ্র তাদের বললেন, তোমরা দেবর্ষিকেই এই কথা জিজ্ঞাসা কর। অপ্সরারা তাই করলে নারদ বললেন, মহর্ষি দুর্বাসা এখন হিমাচলে তপস্যা করছেন। তোমাদের মধ্যে যে তাঁকে ক্ষুভিত করতে পারবে, আমার মতে তারই গুণ সবচেয়ে বেশি। তাঁর কথায় সবার দেহ কেঁপে উঠল। বলতে লাগল, এ অসাধ্য কাজ। কিন্তু তাদের মধ্যেই বপু নামের একজন অপ্সরা পূর্বে অনেকবার মুনিদের বিক্ষোভ সাধন করেছিল বলে গর্ব ভরে বলল, আমি আজই হিমাচলে গিয়ে দেহরথের অধিকারী দুর্বাসাকে স্মর-রূপ শস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন-রশ্মি করে তাঁর বুদ্ধি-রূপ সারথিকে বিপথে আনব। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বর হলেও কাম বাণে তাঁর চিত্ত আমি ক্ষত বিক্ষত করব। এই কথা বলেই সে হিমাচলে গিয়ে দেখল যে মহর্ষির তপের প্রভাবে বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও তাঁর আশ্রমে শান্ত স্বভাবে বাস করছে। বপু তাঁর আশ্রম থেকে ক্রোশ মাত্র ব্যবধানে থেকে কোকিলের মতো গান গাইতে লাগল। ঋষি বিস্মিত হয়ে তার নিকটে গিয়ে তাকে দেখেই তার দুরভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। আত্মাকে সংযত করে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মদোন্মত্তা হয়ে আমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটিয়ে দুঃখ দিতে এসেছ! আমার শাপে তোমাকে পাখি হয়ে জন্ম নিয়ে ষোল বছর কাটাতে হবে। তোমার চারটি পুত্র হবে এবং তাদের লালন পালন না করেই তুমি স্বর্গে ফিরে যাবে। বলে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে মন্দাকিনীতে চলে গেলেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, অরিষ্টনেমির পুত্র পক্ষিরাজ গরুড়ের বংশে জন্ম কঙ্ক ও কন্ধর নামে দুই ভ্রাতার। একদিন কঙ্ক কৈলাস শিখরে গিয়ে

দেখল যে কুবেরের এক অনুচর নিশাচর বিদ্যুদ্রূপ মদ্যপান করে তার স্ত্রীর সঙ্গে আসীন। কঙ্ককে দেখেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তুমি এখানে এসেছ কেন? দেখতে পাচ্ছ না, এখন আমি আমার স্ত্রীব সঙ্গে আছি? কঙ্ক বলল, এই হিমাচলে সবার সমান অধিকার, যেমন তোমার তেমনি আমারও এখানে আসার অধিকার আছে। এই কথা বলা মাত্র রাক্ষস তাকে খড়্গের আঘাতে কেটে ফেলল।

কন্ধর তার ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিদ্যুদ্রূপকে হত্যা কবতে কৈলাসে এল। প্রথমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি সমাধান করে হিমাচল লঙ্ঘন করে রাক্ষসেব দেশে এল। দেখল যে বিদ্যুদ্রূপ পানাসক্ত চিত্তে স্বর্ণময় পালঙ্কে তাব স্ত্রী মদনিকাব সঙ্গে অবস্থান করছে। কন্ধর বলল, এস, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমার ভাইকে হত্যা করার জন্য আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। বিদ্যুদ্রূপ বলল, আমি তোমার ভাইকে মেরেছি, আজ তোমাকেও হত্যা করব। বলে তার খড়্গ তুলল। কন্ধর সেই খড়্গ ভেঙে ফেললে দুজনের তুমুল বাহু যুদ্ধ হল এবং যুদ্ধে রাক্ষসই নিহত হল। মদনিকা কন্ধরের শরণাপন্ন হয়ে বলল, আমি তোমার পত্নী হব। কন্ধব তাকে গ্রহণ কবে নিজের গৃহে ফিরে এল। মেনকার কন্যা মদনিকা ইচ্ছা করলেই নানা রূপ ধাবণ করতে পারত। কন্ধরের গৃহে সে পাখির রূপ ধারণ করল এবং তার্ক্ষী নামে তার এক কন্যা হল। এই কন্যাই অপ্সরা বপু, দুর্বাসার শাপে তাকে পাখি হয়ে জন্মাতে হল।

মন্দপালের কনিষ্ঠ পুত্র বেদ-বেদাঙ্গপারগ ধর্মাত্মা দ্রোণ কন্ধরের অনুমতি নিয়ে তার্ক্ষীকে বিবাহ করল। তার্ক্ষী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কুরুক্ষেত্রে গিয়ে দেখল যে কুরু পাণ্ডব দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। ভগদত্তের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হচ্ছিল। অর্জুনেব একটি ভল্লের আঘাতে তার্ক্ষীর গর্ভাশয় থেকে চাবটি অণ্ড ভূমিতে পড়ল এবং প্রায় একই সময়ে ভগদত্তের হাতীর গলার ঘণ্টাটিও অণ্ডের উপরে পড়ে সেগুলি আচ্ছাদিত করে রাখল। যুদ্ধ শেষ হবার পরে শমীক নামে

এক সংযমী ব্রাহ্মণ সেখানে পদার্পণ করে পাখির চিচীকুচী শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর সেই ঘণ্টা সরিয়ে দেখতে পেলেন পিতা মাতা ও পক্ষহীন চারটি চটক বা চড়াই পাখি। আশ্চর্য হয়ে তিনি তাঁর শিষ্য মুনিপুত্রদের বললেন, দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিপীড়িত হয়ে অসুরদের পলায়ন করতে দেখে দৈত্যগুরু শুক্র ঠিকই বলেছিলেন, তোমরা পালিয়ে যেও না, পালিয়ে কোথাও মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না। বিধাতা সৃষ্টি করে যতক্ষণ মৃত্যু কল্পনা না করেন, ততক্ষণ পালাও বা যুদ্ধ কর, বেঁচে থাকবেই। তা না হলে নিজের ঘরে শুয়ে মরবে, পালিয়েও মরবে। ভোগ করতে করতে বা যোগাভ্যাসে নিরত থেকে তপস্যা করতে কবতেও মরবে। ইন্দ্র একবার শম্বর অসুরের হৃদয়ে বজ্রাঘাত করেও মারতে পারেন নি, সেই ইন্দ্রই কাল পূর্ণ হলে বজ্রাঘাতেই দৈত্য নিধন করেছেন। এই সব কথা ভেবে তোমরা ভয় না পেয়ে নিবৃত্ত হও। তাঁর কথাতেও দৈত্যরা মৃত্যুভয় ত্যাগ করে নিবৃত্ত হয়েছিল। তোমরা দেখ যে এই পাখিরাও শুক্রের কথা সত্য বলে প্রমাণ করেছে। তা না হলে এই রক্ত মাংস ও মেদের আস্তরণের উপরে ঘণ্টায় চাপা পড়ে এরা এতদিন রক্ষা পায় কী করে! এরা যে সামান্য পাখি নয় তা বোঝা যাচ্ছে। তোমরা এদের নিয়ে আশ্রমে যাও এবং ইঁদুর বেড়াল নকুল ও শ্যেন নেই, এমন জায়গায় এদের রাখো।

শমীকের আদেশে তাঁর শিষ্যরা পাখিদের আশ্রমে নিয়ে গেল। মহর্ষি শমীকও বন্য ফল মূল ফুল ও কুশ সংগ্রহ করে বেদ বিধি অনুসারে দেবতাদের পূজা করলেন। তিনি আহার ও পানীয় দিয়ে পাখিদের পালন করলেন। এক মাসের মধ্যেই তারা সূর্যের গতি-পথে যেতে লাগল এবং রথচক্রাকৃতি পৃথিবী পরিদর্শন করে ক্লান্ত হয়ে আশ্রমে ফিরতে লাগল। একদিন তারা মহর্ষি শমীকের চরণযুগল প্রদক্ষিণ করে বলল, ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হাত থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন এবং আবাস আহার ও পানীয় দিয়ে আমাদের প্রতিপালন

করেছেন। তাই আপনিই আমাদের পিতা ও গুরু। এখন আমরা প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানযোগ বিশিষ্ট হয়েছি। তাই আপনার কী করব, সেই আজ্ঞা করুন।

পুত্র শৃঙ্গী ও শিষ্য পরিবৃত মহর্ষি শমীক তাদের এই রকম সংস্কার সম্পন্ন স্ফুট বাক্য শুনে রোমাঞ্চিত দেহে পরম কৌতূহল ভরে বললেন, তোমাদের বাক্‌স্ফূর্তির কারণ বল। আর কার শাপেই বা তোমাদের এই বিক্রিয়া হয়েছিল?

পক্ষীরা বলল, আমরা বিখ্যাত মুনি বিপুলস্বানের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকৃষের পুত্র। বিনয় আচার ও ভক্তিতে আমরা পিতার নিকট নম্র থাকতাম এবং তিনি তপশ্চরণে নিরত হলে আমরা সমিধ পুষ্পাদি আহরণ করতাম। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র একটি জরাজীর্ণ পক্ষীর মূর্তি ধারণ করে সেখানে এলেন। তাঁর প্রকাণ্ড আকার, কিন্তু পক্ষদ্বয় ভগ্ন ও আত্মা শিথিল ভাবাপন্ন। তিনি পিতার পরীক্ষা ও আমাদের শাপের জন্যই সেখানে এসেছিলেন। তাই এসেই পিতাকে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত। বিন্ধ্যগিরির কন্দরে ছিলাম, প্রবল ঝড়ে মাটিতে পড়ে মোহাবিষ্ট ও লুপ্ত-স্মৃতি হয়েছিলাম। আট দিন পর চেতনা লাভ করে খাদ্যের জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। পিতা বললেন, আপনি যে খাদ্য চান তাই দেব। কী রকম আহারের আয়োজন করব তাই বলুন। পক্ষীরূপী ইন্দ্র বললেন, মানুষের মাংসেই আমার তৃপ্তি হয়। আমাদের পিতা বললেন, তুমি নিশ্চয়ই বৃদ্ধ। এই বয়সে সকলেরই বাসনাজাল বিগলিত হয়। এই অবস্থাতেও তুমি এমন নৃশংস কেন? কিন্তু অঙ্গীকার যখন করেছি, তখন আমাকে তা রাখতেই হবে। বলে আমাদের ডেকে বললেন, পিতা যদি পরম গুরু বলে তোমাদের পূজনীয় মনে হয় তো তোমাদের রক্ত ও মাংসে এই পক্ষীর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর কর। এই কথায় আমরা খুব ব্যথিত ও ভীত হয়ে বললাম, কী কষ্টের কথা! কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি পরের জন্য

নিজের দেহ নষ্ট করতে পারে! আমরা আমাদের দেহ দিতে পারব না।

আমাদের এই কথা শুনে পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, আমার প্রতিশ্রুত বাক্য তোমরা লঙ্ঘন করলে বলে আমার শাপে তোমরা তির্যগ্ যোনিতে পতিত হবে। তারপর শাস্ত্রানুসারে নিজের অন্ত্যেষ্টি ও ঔর্ধ্বদেহিক বিধি সমাধা করে ইন্দ্রকে বললেন, এইবারে তুমি আমাকে ভক্ষণ কর। সত্য পালনই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, এতেই তার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। কিন্তু ইন্দ্র বললেন, আমি জীবিত জীব ভক্ষণ করি না বলে তুমি যোগযুক্ত হয়ে দেহত্যাগ কর। পিতা তৎক্ষণাৎ যোগ আশ্রয় করলে ইন্দ্র তাঁর নিজ মূর্তি ধারণ করে বললেন, আমি তোমাকে পরীক্ষার জন্য এই অপরাধ করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ঐন্দ্রজ্ঞান লাভ হবে, তপস্যা ও ধর্মে তার কখনও কোন বিঘ্ন হবে না।

ইন্দ্র এই কথা বলে প্রস্থান করলে আমরা পিতাকে প্রণাম করে বললাম, আমরা বেঁচে থাকতে চাই বলেই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিলাম। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের এই দেহের প্রাকার হল প্রজ্ঞা, অস্থি এর স্থূল বা অবলম্বন কাষ্ঠ, ধর্ম এর ভিত্তি এবং মাংস ও শোণিত এর লেপন। নটি দ্বারে এই দেহ স্নায়ু মণ্ডলে বেষ্টিত। এর মধ্যে অবস্থান করেন চৈতন্য বিশিষ্ট পুরুষরূপী রাজা। বুদ্ধি ও মন তাঁর দুই মন্ত্রী। কিন্তু এদের পরস্পরের মিলন নেই এবং পরস্পর বৈর নির্যাতনের জন্য সর্বদা যত্ন করে। যে চারজন শত্রু সারাক্ষণ রাজার বিনাশ চায়, তারা হল কাম ক্রোধ লোভ ও মোহ। নটি দ্বার রোধ করে থাকলেই শত্রুরা রাজাকে অভিভূত করতে পারে না। রাগ পাঁচটি দ্বারে প্রবেশ করে মনকে জয় করতে সক্ষম এবং তা দেখেই বুদ্ধি পলায়ন করে। তার পরেই শত্রু পরিবৃত হয়ে রাজার বিনাশ হয়। রাগ থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে লোভ, লোভ থেকে সম্মোহ এবং সম্মোহ থেকে স্মৃতির বিলোপ হয়। এর

পরেই বুদ্ধি নাশ হয়ে লোকে বিনষ্ট হয়। আমরাও বাঁচার আশায় লোভের বশবর্তী হয়েছিলাম বলেই আমাদের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল। আপনি প্রসন্ন হয়ে আপনার শাপ প্রত্যাহার করুন। কিন্তু আমাদের পিতা বললেন, জীবনে আমি মিথ্যা বলি নি বলে আমার কথা মিথ্যা হবে না। দৈবই প্রধান হয়ে আমাকে দিয়ে এই অকার্য করিয়েছে। কিন্তু প্রণাম করে আমাকে তোমরা প্রসন্ন করেছ বলে আমার আশীর্বাদে তোমরা পাখি হলেও পরম জ্ঞানী হবে এবং জৈমিনির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমরা শাপমুক্ত হবে। দৈব বশেই আজ আমাদের এই অবস্থা।

পক্ষীদের এই কথা শুনে শমীক শিষ্যদের বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে এরা সামান্য পক্ষী নয়। তারপর তাঁর অনুজ্ঞা পেয়ে পক্ষীরা বিন্ধ্য পর্বতে গিয়ে তপস্যা সমাধি ও স্বাধ্যায়ে আসক্ত হয়ে এখনও অবস্থান করছে। তুমি তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।

বলে মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে এই পরামর্শ দিলেন।

চতুর্ব্যূহ অবতার কথা

মার্কণ্ডেয়র কথায় জৈমিনি বিন্ধ্য পর্বতে পক্ষীদের নিকটবর্তী হয়ে তাদের পঠন ধ্বনি শুনতে পেলেন। পাখিরা অতি স্পষ্ট ভাবে অবিশ্রাম পাঠ করছে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন যে সরস্বতী কাউকেই ত্যাগ করেন না। তিনি গিরি কন্দরে প্রবেশ করে তাদের অভিবাদন করে বললেন, আপনাদের মঙ্গল হোক। আমি ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি, আপনাদের কাছেই এসেছি।

পক্ষীরা জৈমিনিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করে বলল, আপনার দর্শন পেয়ে আমাদের জীবন আজ সার্থক হল। আশা করি আপনার ও আশ্রমের মৃগ পক্ষী গুল্ম সার ও তৃণ জাতীয় বৃক্ষ—সবারই কুশল। অবশ্য আপনার সঙ্গে যাদের বাস, তাদের কুশল ছাড়া আর কিছু

হতে পারে না। জানি না আমাদের কোন্ ভাগ্যে আজ আপনার এখানে আগমন।

জৈমিনি বললেন, আমি এখানে কেন এসেছি তা শুনুন ভারত শাস্ত্রে আমার বিবিধ সন্দেহ জন্মেছে। মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনিই আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

পক্ষীরা বলল, আমাদের জানা থাকলে কেন বলব না। আপনি বলুন।

জৈমিনি বললেন, যিনি সকল কারণের কারণ ও সকলের আধার, সেই বিষ্ণু নির্গুণ হয়েও কেন মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন, দ্রৌপদীই বা কেন পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী হয়েছিলেন, বলদেব কেন তীর্থ যাত্রা করে ব্রহ্মহত্যার পাপ করলেন এবং দ্রৌপদীর পুত্ররা কেন অকৃতদার অবস্থায় অনাথের মতো নিহত হলেন?

পক্ষীরা বলল, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে প্রণাম করে অদ্ভুতকর্মা ব্যাসের মতো আমরা নিবাচন করব। তত্ত্বদর্শী ঋষিরা জলকে নার বলেন। পূর্বে এই নার বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হয়েছিল বলেই তার নারায়ণ নাম। নারায়ণ নিজেকে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে চার অংশে বিভক্ত করে তাতেই সমস্ত ব্যাপ্ত করে বিরাজমান। তার মধ্যে এক মূর্তির কোন নির্দেশ হয় না। পণ্ডিতরা সেই মূর্তিকে নিরবচ্ছিন্ন শুক্ল বর্ণ দেখেন, যোগীদের তা চরম বা একমাত্র নিষ্ঠার স্বরূপ। ত্রিগুণের অতীত এ মূর্তিই বাসুদেব। মমত্বহীন না হলে কোনমতে তাঁর দর্শন সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মূর্তি শেষ নামে বিখ্যাত, তিনি এই পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে আছেন। তিনি তির্যগ্‌যোনি আশ্রয় করেছেন বলে এই মূর্তি তামসী। তৃতীয় মূর্তিতে তিনি প্রজা পালন করেন ও কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ও ধর্ম সংস্থাপনকারী। চতুর্থ মূর্তিতে তিনি জলে নাগশয্যায় শয়ন করে আছেন। এঁর রজঃ গুণ এবং এই মূর্তিতেই তিনি সর্বদা সৃষ্টি করে থাকেন। তৃতীয় মূর্তিতেই বিষ্ণু নিয়ত ধর্ম ব্যবস্থাপন করেন,

অসুরদের সংহার করেন এবং সাধু ও ধর্ম রক্ষা পরায়ণদের পালন করেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি জৈমিনে।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ॥

হে জৈমিনি, যখনই ধর্মে গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন। তিনি বরাহ হয়ে দংষ্ট্রা দিয়ে পৃথিবীকে জল থেকে পদ্মের ন্যায় উদ্ধার করেছেন। আবার নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপু ও বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবকে নিহত করেছেন। বামন প্রভৃতি অন্যান্য অবতারের সংখ্যা বলতে সাহস ও সামর্থ্য হয় না। সম্প্রতি মাথুর নামে অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। এই তৃতীয় মূর্তিই প্রদ্যুম্ন নামে রক্ষার কাজে ব্যাপৃত আছেন। বাসুদেবের ইচ্ছাক্রমেই এই মূর্তি দেবত্ব মনুষ্যত্ব বা তির্যকত্ব স্বভাব পরিগ্রহ করেন।

ইন্দ্র বিক্রিয়া কাহিনী

পক্ষীরা বলল, পুরাকালে প্রজাপতি ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা অধোমুখে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হলে দেবরাজ ইন্দ্র ভয়ে তাঁকে হত্যা করেন। এই ব্রহ্মহত্যার পাপে তাঁর তেজের হানি হয়। তাঁর তেজ ধর্মে প্রবেশ করে এবং তিনি নিস্তেজ হন। এদিকে পুত্রের নিধন সংবাদ পেয়ে ক্রোধান্বিত ত্বষ্টা একগাছা জটা উপড়ে বললেন, আজ ইন্দ্র ও ত্রিলোক আমার বীর্য দেখুক। বলে সেই জটা আগুনে আহুতি দিতেই সেই আগুন থেকে বৃত্র আবির্ভূত হল। তার যেমন প্রকাণ্ড শরীর, তেমনি বিশাল দংষ্ট্রা এবং ত্বষ্টার তেজে প্রতিদিন বর্ধিত হতে লাগল। ভীত ইন্দ্র সন্ধির জন্য সপ্তর্ষি মণ্ডলীকে বৃত্রের নিকটে পাঠালেন। তাঁরা কতিপয় নিয়ম বন্ধন করে দুজনের সন্ধি করালেন। কিন্তু ইন্দ্র সেই নিয়ম বন্ধন ছিন্ন করে বৃত্রকে হত্যা করেন। এই অপরাধে তাঁর বল বিভ্রষ্ট হয়ে বায়ুতে প্রবেশ করল। তারপর গৌতমের রূপ ধারণ করে অহল্যাকে ধর্ষণ করার পাপে তাঁর মনোরম রূপ লাবণ্য অশ্বিনী

কুমারে আবিষ্ট হয়। এই ভাবে দেবরাজ ধর্মহীন তেজোহীন বলহীন ও রূপহীন হয়েছেন জেনে জয়ের জন্য কৃতোদ্যম হয়ে দৈত্যরা বীর্যশালী নৃপতিদের বংশে জন্মগ্রহণ করতে লাগল

কিছুকাল পরেই পৃথিবী তাদের ভারে অবসন্ন হয়ে মেরু শিখরে দেবতাদের সভায় সমাগত হয়ে বললেন, অসুররা আপনাদের হাতে নিহত হয়ে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করছে। তাদের ভারে অবসন্ন হয়ে আমি পাতালে যাচ্ছি। আপনারা আমার শান্তির ব্যবস্থা করুন।

দেবতারা তখন পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্য নিজ নিজ তেজের অংশে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করতে লাগলেন। এতেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম হল, পবন তাঁর বল মোচন করলে ভীম জন্মালেন, ইন্দ্রের বীর্যে অর্জুনের এবং তাঁরই রূপাংশে যমজ যুগলের উদ্ভব হল। ইন্দ্রই পঞ্চ পাণ্ডব রূপে অবতরণ করলেন এবং তাঁর পত্নী শচী অগ্নি থেকে দ্রৌপদী রূপে আবির্ভূত হলেন। দ্রৌপদী একমাত্র ইন্দ্রের পত্নী, আর কারও নন। যোগীশ্বররা বহু দেহ ধারণ করতে পারেন এবং কেন পাঁচজনের এক পত্নী হয়েছিল, তা আপনাকে বললাম।

বলদেবের ব্রহ্মহত্যা

পক্ষীরা বলল, এই বারে বলদেবের বৃত্তান্ত শুনুন। কৃষ্ণ অর্জুনকে অতি মাত্রায় প্রীতি করেন জেনে কী করলে সব দিক রক্ষা পায়, বলদেব এই কথাই বার বার ভাবতে লাগলেন। ভাই কৃষ্ণকে ছেড়ে দুর্যোধনের নিকটে যাওয়া যায় না। অথচ দুর্যোধন তাঁর শিষ্য জামাতা ও রাজা। পাণ্ডবের পক্ষ নিয়ে তাকে সংহার করাও চলে না। তাই তাঁর কোন পক্ষই অবলম্বন করা উচিত নয়। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ যতদিন শেষ না হয়, ততদিন আত্মা দ্বারা আত্মাকে তীর্থ সলিলে প্লাবিত করবেন। মনে মনে এই কথা ঠিক করে কৃষ্ণ অর্জুন ও দুর্যোধনকে আমন্ত্রণ করে নিজের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি স্বসৈন্যে বেষ্টিত হয়ে দ্বারকায় গেলেন। সেখানে পৌঁছে

তীর্থ যাত্রার পূর্ব দিন মধুপান করে অপ্সরাসদৃশ রেবতীর হাত ধরে রৈবত উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু মধুপানে মত্ত হওয়াতে তাঁর পদস্খলন হতে লাগল। ক্রমে সেই রমণীয় বন তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। এই বনে সব ঋতুর ফল ও ফুল হয়, নানা জাতের পাখির গান শোনা যায়। তিনি সেখানে আম্র, আম্রাতক, বীজপূরক, দাড়িম্ব, আবিল্বক, ভব্য, তিন্দাক, নারিকেল, পারাবত, পনস, কঙ্কোল, নলিন, অম্ল বেতস, নীপ, মোচ, লকুচ, ভল্লাতক, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, করমর্দ, আমলক, হরিতক, বিভীতক প্রভৃতি বৃক্ষ দেখতে পেলেন। এ ছাড়াও অশোক, কেতকী, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক, কার্ণিকার, মালতী, পারিজাত, কোবিদার, মন্দার, বদর, পাটল, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষও দেখতে পেলেন। চকোর, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবঞ্জীবক, প্রিয়পুত্র চাতক প্রভৃতি পক্ষীরা সমধুর শব্দ করে সেখানে বিচরণ করছে। সরোবরগুলিতে কুমুদ, পুণ্ডরীক, নীলোৎপল, কহ্লার ও কমল বিকশিত হয়ে আছে এবং জলে কাদম্ব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, কূর্ম, মদ্‌গু প্রভৃতি বিচরণ করছে। স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে বলদেব এইসব দেখতে দেখতে লতাগৃহে উপনীত হলেন।

কৌশিক ভার্গব ভরদ্বাজ প্রভৃতি বংশের ব্রাহ্মণেরা সেখানে কথা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে কুশ বৃষী প্রভৃতি আসনে আসীন ছিলেন এবং তাঁদের মাঝখানে বসে সূত পৌরাণিক কথা কীর্তন করছিলেন। মধুপানে অরুণলোচন বলদেবকে মত্ত জেনে ব্রাহ্মণেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পূজা করতে লাগলেন। কিন্তু সূত উঠলেন না, পূজাও করলেন না। তাই দেখে বলদেব রোষান্বিত হয়ে সূতকে সংহার করলেন। ব্রাহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত সূতকে হত্যা করাতে ব্রাহ্মণেরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বলদেব তখন আত্মাকে পাপপঙ্কিল ও স্বপদভ্রষ্ট মনে করে ভাবলেন, আমি গুরুতর পাপ কাজ করেছি। আমার আত্মা কলুষিত

বোধ হচ্ছে। মদ্যপানে ধিক্! অমর্ষে ধিক্! এ সবে আবিষ্ট হয়েই আমি এই পাপ করলাম। এই পাতক পরিহারের জন্য আমি বারো বছর ব্রত চর্যা করব এবং আমার এই মহা পাপের কথা সকলকে বলে বেড়াব। তাতেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হবে। এই তীর্থ যাত্রায় আমি প্রতিলোমবাহিনী সরস্বতীতে গমন করব।

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

পক্ষীরা বলল, এই বারে দ্রৌপদীর পুত্রদের কথা শুনুন। ত্রেতা যুগে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, ধর্মিষ্ঠ ও কীর্তিমান ছিলেন। তাঁর অধিকারে দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু ছিল না। অধর্মে অভিরুচি ছিল না পৌরবর্গের এবং কেউই বল বীর্য ধন ও তপোমদে মত্ত ছিল না। স্ত্রীলোকেরাও যৌবন প্রাপ্ত হবার আগে সন্তানের জন্ম দিত না। একদিন অরণ্যে মৃগের অনুসরণ করবার সময়ে তিনি শুনতে পেলেন, কতিপয় স্ত্রী বারংবার বলছে, আমাদের পরিত্রাণ কর। তৎক্ষণাৎ তিনি মৃগকে ত্যাগ করে বলে উঠলেন, তোমাদের ভয় নেই, আমি শাসনকর্তা থাকতে কোন দুর্মতিকে অন্যায় করতে দেব না।

এই সময়ে সব কাজের বিঘ্নবিধাতা প্রচণ্ড প্রকৃতির বিঘ্নরাজ ভাবলেন, বীর্যবান বিশ্বামিত্র ভবাদি বিদ্যার সাধনা করছেন এবং তারাই ভয়ার্ত হয়ে রোদন করছে। বিশ্বামিত্র নিয়মী হয়ে বাক্য মন ও ক্রোধ সংযম করেছেন। তাঁর নিকট আমরা সবাই তো বলহীন। তাই হরিশ্চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করেই নিজের উদ্দেশ্য সাধন করা যাক। এই ভেবে তিনি রাজার দেহে প্রবেশ করলেন এবং রাজা সকোপে বলে উঠলেন, কোন্ পাপাত্মা নিজের বস্ত্রাঞ্চলে পাবক বন্ধন করছে? সে কি জানে না যে আমার মতো পালন কর্তা এখানে উপস্থিত আছে এবং আমার শর নিক্ষেপে তার দীর্ঘ নিদ্রা উপস্থিত হবে?

রাজার এই কথা শুনেই বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁর ক্রোধের

উদয় হতেই বিদ্যারা অন্তর্ধান হলেন। রাজাও বিশ্বামিত্রকে দেখে ভয়ে অশ্বত্থ পত্রের মতো কাঁপতে লাগলেন। বললেন, ভগবন্, আর্তকে রক্ষা করা আমাদের ধর্ম। আমি স্বধর্ম পালন করেছি, কোন অপরাধ করি নি। আপনি ক্রোধ পরিহার করুন। ধর্মজ্ঞ রাজা ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবেন, দান করবেন ও রক্ষা করবেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, যদি তোমার অধর্মে ভয় থাকে তো বল, কাকে দান, কাকে রক্ষা ও কার সঙ্গে যুদ্ধ করা কর্তব্য। উত্তরে রাজা বললেন, ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি প্রধান ও যাঁরা ক্ষীণ বৃত্তি তাঁদের দান করতে হয়, যারা ভয়ে ভীত তাদের রক্ষা করতে হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিপক্ষের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হয়। ঋষি বললেন, আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ করে আমি ঐশ্বর্য ভোগে উৎসুক হয়েছি। তুমি আমাকে মনোমত দক্ষিণা দাও। এই কথা শুনে রাজা পুনর্জাত হয়েছেন ভেবে আহ্লাদিত মনে বললেন, আপনাকে কী দিতে হবে তা বলুন। সুবর্ণ বা হিরণ্য, পুত্র বা কলত্র, দেহ বা প্রাণ, রাজ্য পুর বা লক্ষ্মী— নিতান্ত দুর্লভ হলেও আমি তা দেব। বিশ্বামিত্র বললেন, আমি তোমার প্রদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করলাম। প্রথমে আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দাও। রাজা বললেন, আমি আপনাকে তাই দেব। এবারে আপনি যা নেবার তা নিন। ঋষি বললেন, আমি তোমার পুত্র ও কলত্র এবং মৃত্যুর পরে যে ধর্ম সঙ্গে যায় তা চাই না। আমাকে তুমি এই পৃথিবী তোমার রাজ্য ও যাবতীয় বস্তু দাও। রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে অম্লান বদনে বললেন, তাই দিলাম। তখন ঋষি বললেন, এবারে বল কে এখন প্রভু? রাজা বললেন, আপনিই প্রভু, আপনিই রাজা। ঋষি বললেন, তাহলে তুমি বল্কল পরে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আমার রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাও। রাজা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যখন প্রস্থানে উদ্যত হলেন, তখন ঋষি পথ রোধ করে বললেন, আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা না দিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? রাজা বললেন, আপনাকে সর্বস্ব দেবার পর তো এখন আমাদের এই তিনটি দেহ মাত্র

অবশিষ্ট আছে। ঋষি বললেন, যজ্ঞের দক্ষিণা আমাকে দিতেই হবে। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। রাজা বললেন, এখন তো আমার কিছুই নেই, পরে দেব। ঋষি বললেন, কত দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে বলে যাও, তা না হলে আমার কোপানলে তোমাকে দগ্ধ হতে হবে। রাজা বললেন, এক মাসের মধ্যে আমি দক্ষিণা দেব, এখন আমাকে যাবার অনুমতি দিন। ঋষি বললেন, যাও, স্বধর্ম রক্ষা কোরো। পথে তোমার যেন বিপদ না হয়। বিপক্ষেরও ক্ষয় হয়।

পক্ষীরা বলল, রাজা যাত্রা করলেন। যে শৈব্যা কোন দিন পায়ে হাঁটেন নি, তিনিও তাঁর সঙ্গে চললেন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে রাজাকে পুরের বাহিরে দেখে পৌরবর্গ চিৎকার করে বলতে লাগল, কেন আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছেন! আপনি আমাদেরও সঙ্গে নিন। তারা নানাভাবে শোক প্রকাশ করছে দেখে রাজা পথের উপরে একটু দাঁড়ালেন। তাদের কথায় রাজাকে ব্যাকুল দেখে ঋষি এসে বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী ও দুর্বৃত্ত। আমাকে রাজ্য দিয়েও তুমি ফিরে আসতে চাইছ! ঋষির কথায় রাজা সভয়ে স্ত্রীর হাত ধরে টেনে বললেন, আমি যাচ্ছি। কিন্তু কোমলাঙ্গী স্ত্রী পরিশ্রমে কাতর বলে রাজা তাঁকে সেইভাবে আকর্ষণ করছেন দেখে ঋষি বিশ্বামিত্র সহসা দণ্ডকাষ্ঠে তাঁকে প্রহার করলেন। স্ত্রীকে প্রহৃত হতে দেখেও রাজা দ্বিরুক্তি না করে শুধু বললেন, আমরা যাচ্ছি।

এই সময়ে পাঁচজন বিশ্বদেবতা রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুরবস্থা দেখে পরস্পর বলতে লাগলেন, জানি না এই পাপিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কোন্ লোকে যাবে! এই পাপাত্মা যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ রাজাকেও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করল। এখন আমরা কার যজ্ঞে মন্ত্রপূত সোমরস পান করে আহ্লাদিত হব! বিশ্বামিত্র এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, তোমরা মানুষ হয়ে জন্মাবে, কিন্তু বিবাহ ও সন্তানলাভের পূর্বেই পুনরায় দেবতা হবে। বিশ্বামিত্রের শাপেই বিশ্বদেবরা দ্রৌপদীর পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন।

পক্ষীরা বলল, এবারে কী শুনতে চান বলুন।

জৈমিনি বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা শোনবার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে।

পক্ষারা বলল, পুত্র ও সহধর্মিণী শৈব্যাকে নিয়ে হরিশ্চন্দ্র বারাণসীতে গেলেন। কিন্তু সেই পুরী মহাদেবের এবং মানুষের কোন অধিকার নেই ভেবে দুঃখিত চিত্তে নিষ্ক্রান্ত হলেন। প্রবেশ-দ্বারে বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে সবিনয়ে বললেন, আমার এই পুত্র পত্নী ও নিজের প্রাণ অবশিষ্ট আছে। এর মধ্যে আপনি যাকে চান তাকেই গ্রহণ করুন, কিংবা কাউকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিন। ঋষি বললেন, আজ তোমার প্রতিশ্রুত এক মাস পূর্ণ হয়েছে। অতএব নিজের অঙ্গীকার যদি ভুলে না থাক তো আমার দক্ষিণা দাও। রাজা বললেন, দিনের অর্ধেক এখনও বাকি, এই সময়টুকু অপেক্ষা করুন। ঋষি বললেন, বেশ, আমি আবার আসব। কিন্তু যদি আজই না দাও তো তোমাকে শাপ দেব। বলে বিশ্বামিত্র প্রস্থান করলে রাজা ভাবতে লাগলেন, কী করে দক্ষিণা দেওয়া যায়—প্রাণত্যাগ করবেন না পালিয়ে যাবেন, দাসত্ব স্বীকার করবেন না আত্মবিক্রয় করবেন। রাজাকে ব্যাকুল দেখে শৈব্যা বললেন, সত্যভ্রষ্ট হলে মানুষ শ্মশানের ন্যায় বর্জনীয়, তাই সত্য পালন করতে হবে। রাজা কৃতি সাতটি অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করেও একবার মাত্র মিথ্যা ভাষণের জন্য স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন। আমার তো পুত্র হয়েছে—বলেই রাণী সরবে রোদন করতে লাগলেন। রাজা বললেন, এই বালক তো কাছেই আছে। এইভাবে না কেঁদে যা বলতে চেয়েছিলে তাই বল। রাণী বললেন, মানুষ পুত্রের জন্যই বিবাহ করে। আমার যখন পুত্র হয়েছে, তখন আমাকে বিক্রয় করে সেই ধন ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিন।

এ কথা শুনেই রাজার মোহ উপস্থিত হল। তারপর সংজ্ঞালাভ করে বললেন, তুমি কেমন করে এ কথা বলতে পারলে! যে কথা

বলতে আমার কষ্ট হয়, তা কেমন করে আমি করব। বলে তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। রাণী তাই দেখে করুণ ভাবে বলতে লাগলেন, কার শাপে এ রকম হল। ব্রাহ্মণদের যিনি কোটি কোটি গাভী ও বিত্ত দান করেছেন, তার আজ এই অবস্থা। এই বলে তিনিও মূর্ছিত হলেন। পিতা মাতা উভয়কে মূর্ছিত দেখে পুত্র বলে উঠল, বাবা আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। মা, আমাকে খেতে দাও। এই সময়ে বিশ্বামিত্র এসে রাজাকে মূর্ছিত ও ভূলুণ্ঠিত দেখে জল ছিটিয়ে বললেন, রাজা ওঠ, আমার দক্ষিণা দাও। সেই শীতল জলাসেচনে সংজ্ঞা লাভ করে রাজা ঋষিকে দেখে পুনরায় মোহাচ্ছন্ন হলেন এবং ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, ধর্মে মতি থাকলে আমার দক্ষিণা দাও।--

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

দেখ, সূর্য সত্য বলেই তাপ দান করে। মেদিনীও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যই পরম ধর্ম ও একমাত্র সত্যই স্বর্গের অধিষ্ঠান। তুলায় সহস্র অশ্বমেধের চেয়েও সত্যের ভার বেশি হবে। কিন্তু তোমার মতো অনার্য পাপাশয় ক্রূর মিথ্যাবাদী ও প্রভাবশালী রাজার কাছে এই সামবাদের প্রয়োজন নেই। সোজা কথায় বলছি যে আজ দক্ষিণা না দিলে সূর্যাস্তের পরেই তোমাকে শাপ দেব।

এই কথা বলে ঋষি প্রস্থান করলে রাজা ভীত হয়ে ভাবতে লাগলেন। তাই দেখে রাণী বললেন, শাপে দগ্ধ না হয়ে আমি যা বলেছি তাই করুন। অতি নির্দয় পুরুষও যা করে না, আমি তাই করব। তোমাকেই বিক্রয় করব। এই বলে তিনি নগরে গিয়ে বাষ্পাকুল নয়নে বলতে লাগলেন, নগরবাসীরা আমার কথা শোন। আমি অতি নির্দয় ও অমানুষ, রাক্ষস বা তার চেয়েও পাপাত্মা।

সেইজন্যই আমার স্ত্রীকে বিক্রয় করতে এসেছি, নিজে প্রাণত্যাগ করতে পারলাম না। একে যদি কারও দাসী করে নেবার প্রয়োজন হয় তো সে আমার প্রাণ থাকতেই যেন তা করে।

একজন ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বললেন, আমাকে দাসী দাও, আমার স্ত্রী গৃহকর্মে অক্ষম। তোমার স্ত্রীর দক্ষতা বয়স রূপ ও স্বভাবের অনুরূপ এই অর্থ দিলাম। বলে তিনি রাজার বল্কল প্রান্তে সেই অর্থ বেঁধে দিলেন এবং শৈব্যার কেশপাশ আকর্ষণ করলেন। মাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বালক রোহিতাশ্বও মার আঁচল ধরে কাঁদতে লাগল। রাণী ব্রাহ্মণকে বললেন, আমাকে একটু ছেড়ে দিন, আমি ছেলেকে একবার দেখে নিই। বলে রোহিতাশ্বকে বললেন, আমি এখন দাসী হয়েছি, আমাকে আর ছুঁয়ো না। কিন্তু বালক তার বস্ত্র ধরে মা—মা বলে কাঁদতে লাগল দেখে ব্রাহ্মণ তাকে পদাঘাত করলেন। তবু রোহিতাশ্ব মাকে ধরে কাঁদতে লাগল দেখে রাণী ব্রাহ্মণকে বললেন, আপনি এই বালককেও ক্রয় করুন। ব্রাহ্মণ বললেন, এই অর্থ নিয়ে বালক আমাকে দাও। স্ত্রী-পুরুষের মতো বালকের কোন বেতন নিরূপিত হয় নি বলে আরও কিছু অর্থ রাজার বল্কল প্রান্তে বেঁধে দিয়ে দুজনকেই একসঙ্গে বদ্ধ করলেন। রাজা যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন, ব্রাহ্মণ তখন তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঠিক এই সময়েই বিশ্বামিত্র উপস্থিত হয়ে দক্ষিণা চাইলেন। রাজা তাঁকে স্ত্রী-পুত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিলে বিশ্বামিত্র কুপিত হয়ে বললেন, ক্ষত্রিয়াধম, এই সামান্য অর্থ তুমি আমার যোগ্য দক্ষিণা মনে কর? রাজা বললেন, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আমি অবশিষ্ট ধন দেব। ঋষি বললেন, দিবসের আর চতুর্ভাগ বাকি
সেই ...। এইটুকু সময় আমি অপেক্ষা করতে পারি। বলে ঋষি
এ ক...তেই রাজা অধোমুখে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, ধন দিয়ে
করে বলে... ক্রীতদাস করবার কারও প্রয়োজন থাকলে সূর্যাস্তের পূর্বেই

বলুক। এর পর ধর্ম চণ্ডাল বেশ ধারণ করে ত্বরিত পদে সেখানে এলেন। তাঁর শরীর দুর্গন্ধ, রুক্ষ ও বিকৃত। দশন পংক্তি ও শ্মশ্রু দীর্ঘ ও বিপুলায়ত, বর্ণ কৃষ্ণ, দেহ কৃশ ও উদর লম্বিত, অক্ষি যুগল রুক্ষ ও পিঙ্গলবর্ণ, গলায় শবের মালা, হাতে কপাল যষ্টি ও পক্ষীপুঞ্জ, মনে ঘৃণার লেশ নেই। কুকুর বেষ্টিত হয়ে আকারে প্রকারে অতি ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড ব্যক্তি কর্কশ গলায় রাজাকে বললেন, তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। কত মূল্য চাই বল। রাজা বললেন, তুমি কে? চণ্ডাল বলল, আমি প্রবীর নামে চণ্ডাল। এই পুরীতে বধ্যের বধ ও শবের কম্বল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করি। রাজা বললেন, চণ্ডালের দাস হবার চেয়ে বিশ্বামিত্রের শাপে দগ্ধ হওয়া ভাল। এই সময়েই বিশ্বামিত্র আবার এসে রুষ্ট স্বরে বললেন, এই চণ্ডাল তোমাকে অনেক ধন দেবে। তবে কেন তুমি আমার যজ্ঞ দক্ষিণা শোধ করবে না? রাজা বললেন, সূর্য বংশে আমার জন্ম, সামান্য ধনের জন্য কি আমি চণ্ডালের দাস হতে পারি! ঋষি বললেন, এই চণ্ডালের নিকট নিজেকে বিক্রয় করে যদি তুমি আমাকে ধন না দাও তবে তোমাকে আমি শাপ দেব। এই কথায় হরিশ্চন্দ্র বিহ্বল হৃদয়ে ঋষির দু পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি আপনার দাস, আপনি প্রসন্ন হোন, চণ্ডাল সম্পর্ক খুবই ক্লেশজনক। ঋষি বললেন, তুমি আমার দাস হলে বলে আমি তোমাকে অর্বুদ বিত্তে চণ্ডালকে দিলাম। চণ্ডাল তখনই হৃষ্ট মনে ঋষিকে অর্বুদ বিত্ত দিয়ে রাজাকে বন্ধন করে নিজের পত্তনে নিয়ে গেল।

রাজার কষ্টের সীমা ছিল না। চণ্ডালের দণ্ডের আঘাতে তিনি ব্যাকুল হয়ে স্ত্রী পুত্রের জন্য বিলাপ করতেন। চণ্ডাল পত্তনে তাঁকে শববস্ত্র আহরণে দিবা নিশি নিযুক্ত থাকতে হত। প্রত্যেক শবে রাজাকে ষড় ভাগ, অবশিষ্ট তিন ভাগ চণ্ডালকে ও অপর দুই ভাগ তাঁর বেতন নির্ধারিত হয়। চণ্ডাল এই নিয়ম করলে রাজা দক্ষিণ দিকে বারাণসীর প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত শব মন্দিরে এলেন। শত শত

শিয়াল ও কুকুর ঐ শ্মশানকে ঘিরে রেখেছে এবং সারাক্ষণ ভয়ঙ্কর শব্দ হচ্ছে। শবে পূর্ণ, ধূম ও গন্ধে আচ্ছন্ন। মৃতের আত্মীয় বন্ধুরা সারাক্ষণ আর্তনাদ করছে। জ্বলমান মাংস মেদ ও চর্বির ছমচ্ছমিত শব্দে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। চিতাগ্নির মধ্যে অর্ধদগ্ধ শ্যামবর্ণ শব যেন দশন পংক্তি বিকশিত করে সহাস্যে বলছে, শরীরের এই দশা। অগ্নির চটচট শব্দ, অস্থিতে পক্ষীর পতনের শনশন শব্দ, বান্ধবদের চিৎকার, চণ্ডালদের হর্ষধ্বনি এবং ভূত পিশাচ বেতাল ও রাক্ষসদের শব্দ একত্র মিলিত হয়ে প্রলয় কালের মতো মনে হচ্ছে। ঐ শ্মশান যেন সাক্ষাৎ নরক। এরই মধ্যে রাজা নিজের ভাগ্যের জন্য শোক প্রকাশ করছেন, এবং চণ্ডালের আদেশে ছুটোছুটি করে নিজের কাজ করছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ রুক্ষ, মলে লিপ্ত ও দুর্গন্ধ। জীর্ণ বস্ত্রে গ্রন্থি দিয়ে তারই কাঁথা গায়ে কোন্ শবে কী মূল্য পাওয়া গেছে, কাকে কী দিতে হবে তার হিসাব করতে করতে তিনি চতুর্দিকে ছুটছেন। তাঁর মুখ বাহু উদর ও পদদ্বয় চিতা ভস্ম ও শ্মশানের ধূলায় পূর্ণ। নিজের হাতের আঙুল শবের মেদ মজ্জা ও চর্বিতে লিপ্ত। শবান্নে তিনি উদর পূর্ণ করেন, তাঁর দীর্ঘশ্বাসের বিরাম নেই। কি দিবা কি রাত্রিতে নিদ্রার সম্পর্ক নেই, তিনি শুধু হাহাকার করেন। এই অবস্থায় বারো মাস অতিবাহিত হবার পর রাজা শ্রান্ত দেহে শয়ন করেই নিদ্রায় অভিভূত হলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, যেন অন্য দেহ ধারণ করে গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিচ্ছেন। তাতে বারো বছর দুঃখ দান থেকে তাঁর নিষ্কৃতি হয়েছে। তিনি আরও দেখলেন যে চণ্ডাল বালক রূপে তাঁর জন্ম হয়েছে এবং সাত বছর বয়সে মৃত অবস্থায় তাঁকে শ্মশানে এনেছেন কোন ব্রাহ্মণ। তাঁর ধন নেই বলে মূল্যার্থী হলে ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের আচরণ উল্লেখ করে বললেন, ব্রহ্মস্ব হরণ করার অপরাধে চণ্ডাল হবার পরেও তিনি তাঁকে ক্ষমা না করে শাপ দিয়েছিলেন, নরাধম, তুমি ঘোর নরকে যাও। রাজা স্বপ্নেই দেখলেন যে যমদূতেরা তাঁকে পাশে বেঁধে নিয়ে

গিয়ে শত বর্ষ নরকে মগ্ন করে রাখল। তারপর পৃথিবীতে এসে কুকুর প্রভৃতি প্রাণী হয়ে জন্মাতে লাগলেন। এই ভাবে একশো বছর কাটবার পর নিজের বংশে জন্মালেন এবং পাশা খেলায় তিনি সর্বস্ব হারিয়ে একাকী বনে গেলেন। একটা সিংহ যেন তাঁকে খেয়ে ফেলল। তিনি তাঁর পুত্র ও পত্নীকেও একবার দেখতে পেলেন। তারপর দেখলেন যে কেউ তাঁর পত্নীকে সবলে নিয়ে যাচ্ছে আর তিনি বাঁচান বাঁচান বলে চিৎকার করছেন। তারপরেই দেখলেন, অন্তরীক্ষ থেকে তাঁর পত্নী বলছেন, বিশ্বামিত্র আপনার জন্য যমকে জানিয়েছেন, আপনি এখানে আসুন। বলে সর্পপাশে বদ্ধ করে সবলে নিয়ে যেতে লাগলেন। বারো বছর দুর্দশা ভোগের পর তিনি যমের দর্শন পেলেন। যম তাঁকে বললেন, বিশ্বামিত্রের কোপ নিবারণ সহজ নয়। ঋষি তোমার পুত্রেরও মৃত্যু ঘটাবেন। অতএব তুমি মনুষ্য লোকে গিয়ে দুঃখ ভোগ কর। তারপর দুঃখের শেষ ও শ্রেয়লাভ হবে। এর পর যমদূতেরা তাঁকে যমলোক থেকে ফেলে দিতেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি বললেন, কী কষ্ট, স্বপ্নেও আমার দুঃখ দর্শন হল! তারপরেই চণ্ডালদের জিজ্ঞাসা করলেন, স্বপ্নে আমি যে বারো বছর দেখলাম তা কি অতীত হয়েছে? কেউ বলল, না। আবার কেউ বলল, তাই বটে। রাজা দুঃখিত চিত্তে দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে বললেন, আপনারা আমার শৈব্যার ও বালকের কল্যাণ করুন। বলে চণ্ডালের কাজে নিযুক্ত হলেন। এর পরই তাঁর স্মৃতি বিলোপ হল।

এই সময়ে তাঁর পুত্রের সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী মৃত পুত্রকে নিয়ে বিলাপ করতে করতে শ্মশানে এলেন। রাজা সেই বিলাপ শুনে মৃতের কম্বলের জন্য ত্বরিত পদে সেখানে এলেন। কিন্তু স্মৃতি শক্তি লোপের জন্য স্ত্রীকে চিনতে পারলেন না। রাণীও শুষ্ক বৃক্ষের মতো জটাচ্ছন্ন রাজাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু রাজা রাজলক্ষণ যুক্ত বালককে দেখে ভাবতে লাগলেন, এ কোন্ রাজার

ঘরের ছেলে! আমার ছেলে রোহিতাশ্ব বেঁচে থাকলেও এত বড় হত। এই সময়ে রাণী বিলাপ করছিলেন, কোন্ পাপে আজ আমার এই অবস্থা হল! বিধি, তুমি হরিশ্চন্দ্রের কী না করলে! তাঁর রাজ্য গেল, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিয়োগ হল, স্ত্রী পুত্রও বিক্রীত হল! এই কথায় রাজা উভয়কে চিনতে পেরে 'আমার রোহিতাশ্ব আর শৈব্যা! কী কষ্ট!' বলে মূর্ছা গেলেন। শৈব্যাও রাজাকে চিনতে পেরে মূর্ছিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই চেতনা লাভ করে শোকে বিলাপ করতে লাগলেন। রাণী রাজার হাতে দণ্ড দেখেই কেঁদে বললেন, ধিক দৈব, দেবতার মতো রাজাকে তুমি চণ্ডালে পরিণত করেছ! এ স্বপ্ন, না সত্য! এ যদি সত্য হয় তো বুঝব যে সংসারে আর ধর্ম নেই। রাণীর কথা শুনে রাজা উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাঁর চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির কথা বললেন। রাণীও পুত্রের মৃত্যু পর্যন্ত সব কথা জানালেন। রাজা বললেন, আমি যদি চণ্ডালের অনুমতি না নিয়ে আগুনে প্রবেশ করি তাহলে পরজন্মে আবার আমাকে চণ্ডালের দাস হতে হবে ও মৃত্যুর পর নরক ভোগ করতে হবে। কিন্তু পুত্র-শোকের চেয়ে সে দুঃখ কম। চিতা জ্বলে উঠলেই পুত্রের সঙ্গে আমি চিতায় উঠব। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। জীবনে যদি কোন পুণ্য করে থাকি তবে পরলোকে নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারব। এখন তুমি ব্রাহ্মণের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সেবা কর, নিজেকে রাণী ভেবে তাঁর অবজ্ঞা কোরো না। রাণী বললেন, আমি আর দুঃখের ভার বহন করতে পারছি না, আমিও আপনার সঙ্গে আগুনে প্রবেশ করব।

পক্ষীরা বলল, এর পর রাজা চিতা তৈরি করে পুত্রকে শুইয়ে পত্নীর সঙ্গে বাসুদেবের চিন্তা করতে লাগলেন। তাই দেখে ইন্দ্রাদি দেবতা ধর্মকে সামনে রেখে সেখানে এলেন এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে ধর্ম ইন্দ্র ও বিশ্বামিত্র অবতরণ করলেন। ইন্দ্র বললেন, হরিশ্চন্দ্র, তোমরা সনাতন লোক জয় করেছ, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে এবারে

স্বর্গে চল। এই বলে তিনি চিতার নিকট যেতেই আকাশ থেকে অপমৃত্যু বিনাশন অমৃতময় বর্ষ ও তার সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি ও দেব দুন্দুভি নিস্বন হল এবং মৃত পুত্র পূর্বের ন্যায় সুকুমার কলেবরে উঠে বসল। হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যাও দিব্য বস্ত্র ও মাল্য ধারণ করে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। তাই দেখে ইন্দ্র বললেন, এইবারে তোমরা স্বর্গে চল। হরিশ্চন্দ্র বললেন, আমার প্রভু চণ্ডাল অনুমতি না দিলে তো আমি কোথাও যেতে পারি না। ধর্ম বললেন, তোমার এই ক্লেশ হবে, আত্মমায়া বলে এই কথা জেনে আমিই চণ্ডাল হয়ে এই চপলতা দেখিয়েছি। ইন্দ্র বললেন, পৃথিবীর সব মানুষ যে স্থান চায়, তুমি সেই স্থানে চল। রাজা বললেন, দেবরাজ, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রসন্ন হয়েছেন বলেই প্রশ্রয় পেয়ে বলছি, কোশল নগরের যে অধিবাসীরা শোকে মগ্ন হয়ে আছে, তাদের ছেড়ে আমি কেমন করে যাব! ব্রহ্মহত্যা, গুরুত্যাগ, গোহত্যা ও স্ত্রীবধ করলে যে পাপ হয়, ভক্ত ত্যাগেও সেই পাপ। আমি তাই স্বর্গে যেতে চাই না। তাদের সঙ্গে যদি যেতে পারি, তবেই যাব। তাদের সঙ্গে আমি নরকেও যেতে পারি। ইন্দ্র বললেন, তাদের তো পৃথক পাপ-পুণ্য আছে, তাদের সঙ্গে একত্রে কী ভাবে তুমি স্বর্গ ভোগ করবে? রাজা বললেন, দেবরাজ, আমার পুণ্যফল তারা সমানে ভোগ করুক। আমি যা বহুকাল ভোগ করব, আপনার প্রসাদে যেন সবাই মিলে একদিন তা ভোগ করতে পারি। ইন্দ্র বললেন, তথাস্তু।

সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য বিমান এল। তাঁরা অযোধ্যায় গিয়ে অধিবাসীদের বললেন, তোমরা সকলে স্বর্গে চল। ইন্দ্রের এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র রাজার প্রতি প্রীতিমান হয়ে রোহিতাশ্বকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসালেন। এর পরে সকলে স্বর্গে চললেন। তারা নানা বিমানে উঠছে দেখে হরিশ্চন্দ্রের হর্ষের সীমা রইল না। তাঁরা স্বর্গে পৌঁছলে দৈত্যগুরু শুক্র গাথা গান করলেন, হরিশ্চন্দ্রের সমান রাজা হয় নি, হবেও না। তাঁর চরিত কথা শুনলে স্বর্গার্থীর

স্বর্গলাভ, পুত্রার্থীব পুত্রলাভ, ভার্যার্থীব ভার্যালাভ ও বাজ্যার্থীর বাজ্যলাভ হয। দান ও তিতিক্ষাব বা মহিমা, এই দুই-এর সহায়ে তাব স্বর্গ ও ইন্দ্রপদ লাভ হল।

আড়ি বকের যুদ্ধ

পক্ষীবা বলল, এব পবে বাজসূয যজ্ঞেব বিপাকে পৃথিবীব ক্ষয ও তাব জন্য যে তুমুল আড়ি বকের যুদ্ধ হযেছিল, তা শুনুন। হবিশ্চন্দ্রেব পুবোহিত বশিষ্ঠ বাবো বৎসব গঙ্গাবাসেব পর জল থেকে বহির্গত হয়েই বিশ্বামিত্রেব আচবণ ও হবিশ্চন্দ্রেব দুদশাব সব কথা শুনলেন। এতে তিনি বাজাব প্রতি যেমন প্রীতিমান হলেন, তেমনি বিশ্বামিত্রেব প্রতি জাতক্রোধ হযে বললেন, সে আমাব শত পুত্রের প্রাণ সংহাব কবাতেও আমার এত ক্রোধ হয নি, কিন্তু আমাব আশ্রিত এই নিষ্পাপ বাজাকে এত কষ্ট দেবাব জন্য আমি তাকে শাপ দিচ্ছি, সে বক যোনি প্রাপ্ত হবে। বিশ্বামিত্রও প্রতিশাপ দিলেন তুমিও আড়ি অর্থাৎ শালিক পক্ষী হযে জন্মাবে। পবস্পরের শাপে তাঁবা তাই হলেন। উভয়েই মহা পবাক্রান্ত হযে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। আড়ি পরিমাণে দু হাজাব যোজন ও বক তিন হাজার ছিয়ানব্বই যোজন সমুচ্ছিত। তাদেব পক্ষ প্রহারেব পবনে পবত প্রচয় প্রক্ষিপ্ত হযে পৃথিবীতে পতিত হল। তাতে আহত হযে বসুন্ধবা কম্পিত হলেন এবং তাব জন্য জলবাশি উদ্বৃত্ত হল। এতে পৃথিবী পাতালগামী হয়ে এক দিকে নত হযে পড়লেন ফলে কেউ গিবি নিপাতে, কেউ সাগর সলিলে, কেউ বা মহী সঞ্চলনে প্রাণত্যাগ কবল। হাহাকারে পূর্ণ হল জগৎ। তাই দেখে পিতামহ দেবতাদেব সঙ্গে এসে বললেন, তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। কিন্তু তাঁবা ক্ষান্ত হলেন না দেখে পিতামহ তাদেব তির্যগ্ভাব দূব কবলেন। তারা স্বরূপ ফিরে পেতেই ব্রহ্মা বললেন, বৎস বশিষ্ঠ, যুদ্ধ ত্যাগ কর। বৎস বিশ্বামিত্র, তুমিও যুদ্ধ কোরো না। তামস ভাবের প্রভাবেই তোমরা যুদ্ধ কবছিলে।

হরিশ্চন্দ্রের এই রাজসূয় যজ্ঞ বিপাক ও তোমাদের যুদ্ধে পৃথিবীর ক্ষয় দশা উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের কেবল অপকার করেন নি, তাঁকে স্বর্গে পাঠিয়েছেন। তপস্যার বিঘ্ন কাম ক্রোধের বশীভূত না হয়ে তোমরা তা ত্যাগ কর। পিতামহের কথায় তাঁরা লজ্জিত হয়ে প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ক্ষমা করলেন। তারপর সবাই স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

জন্ম মৃত্যু জন্মান্তর ও নরক বর্ণনা

জৈমিনি বললেন, জন্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব কী রূপে হয়, এবারে আমাকে তাই বলুন। মাতৃগর্ভে তার জন্ম ও বৃদ্ধি, মৃত্যুকালে চেতনা লোপ ও তারপরে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ—এই সব কথা বলুন।

পক্ষীরা বলল, জন্ম মৃত্যুর এই প্রশ্ন সহজে নির্ণয় করা যায় না। পুরাকালে সুমতি নামে এক ধর্মাত্মা তাঁর পিতাকে যা বলেছিলেন, তাই শুনুন। ভৃগু বংশীয় এক ব্রাহ্মণ তাঁর জড়-রূপী পুত্র সুমতিকে বার বার বলতেন, বেদ পড়, গুরুর সেবা করে ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর পূর্ণ কর, তারপর গার্হস্থ্য আশ্রমে যজ্ঞাদি করে পুত্র লাভের পর অরণ্যবাসী হও। বনবাসে পরিব্রাজক বৃত্তি অবলম্বন ও পরিগ্রহ ত্যাগ করলে পরব্রহ্ম লাভ করবে। তাঁকে পেলে তোমাকে আর শোক করতে হবে না। পিতার নিকট অনেক বার এই সব কথা শোনবার পর পুত্র সুমতি উচ্চস্বরে হেসে উত্তর করলেন, তাত, আপনি যা বললেন তা অনেক বার অভ্যাস করেছি। ইতিপূর্বে আমি যে অযুত অযুত বার জন্মেছি, তাও আজ মনে পড়ে গেল। কত পিতা মাতা দেখেছি. কত সুখ দুঃখ অনুভব করেছি, কতবার গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করেছি—সে সবই মনে পড়ছে। আমার এই এক জন্ম নয়, শত শত বার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হয়ে জন্মেছি, পশু পক্ষী কীট হয়েও জন্মেছি। ভৃত্য হয়েছি, দাস হয়েছি, স্বামী হয়েছি, দণ্ড-

মুণ্ডের কর্তাও হয়েছি। কতবার হত্যা করেছি, কতবার নিহত হয়েছি। কত সন্তোষ ও কত ক্লেশ ভোগ করে আমার যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, তাতে বুঝেছি যে বেদের ক্রিয়াকলাপ সর্বথা বিফল ও অসম্যক। বিশ্বগুরু পরমাত্মাকে অবগত হয়ে মায়া মোহ তিরোহিত হয়েছে। আমি জেনেছি যে এই সংসার দুঃখের পরম্পরা মাত্র, ভয় উদ্বেগ হর্ষ অমর্ষ ও জরা প্রভৃতি দোষে আতুর ভাবাপন্ন এবং আসক্তির পাশে আবদ্ধ। তাই আমি অধর্মে পূর্ণ বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করে পরব্রহ্মকে আশ্রয় করব বলে স্থির করেছি।

পুত্রের কথা শুনে পিতা সহর্ষে ও সবিস্ময়ে বললেন, তুমি জড় ছিলে, কোথা থেকে তোমার এই জ্ঞান জন্মাল? কোন মুনি বা দেবতার শাপে কি তোমার বিকৃত দশা হয়েছিল? পুত্র বললেন, পূর্বজন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, আমার মন ছিল পরমাত্মায় সন্নিবিষ্ট। আচার্য হয়ে শিষ্যদের সন্দেহ নিরাকরণে আমার প্রাধান্য জন্মেছিল। তারপর আমার গুণে দোষের উৎপত্তি হয় এবং প্রমাদ বশে অপমৃত্যু হয়। কিন্তু প্রথম জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করার জন্য আমি জাতিস্মর হই। এটি জ্ঞান দানের সাক্ষাৎ ফল। বৈদিক ধর্মের আশ্রয় করে জাতিস্মর হওয়া যায় না। আপনার হৃদয়ে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে তা নিরাকরণ করে আমি আপনার ঋণ শোধ করব।

পক্ষীরা বলল, আপনি আমাদের যে প্রশ্ন করেছেন, সুমতির পিতাও তাঁকে সেই প্রশ্নই করেছিলেন। পুত্র উত্তর দিয়েছিলেন, এই সংসার চক্র জীর্ণ হয় না, এর স্থিতিও নেই। বায়ু কুপিত হয়ে মর্মস্থান ভেদ করে। যারা অন্ন জল ও রস দান করে, তারা মৃত্যুর সময়ে আহ্লাদ অনুভব করে। যারা আস্তিক, দেবদ্বিজে ভক্তি করে, মিথ্যা বলে না, প্রীতিভেদ করে না, কাম ক্রোধ দ্বেষের বশে ধর্মত্যাগ করে না, তাদের সুখমৃত্যু হয়। যারা লোকের মোহ উৎপাদন করে, কুট সাক্ষ্য দেয়, মিথ্যা বলে, অসৎ অনুশাসন ও বেদের নিন্দা করে, সেই নরাধমদের অতি উগ্র বেদনায় মোহমৃত্যু হয়। যমদূতেরা

তাদের পাশে বদ্ধ করে দণ্ড প্রহার করতে করতে কণ্টকময় পথে যমলোকে নিয়ে যায়। দ্বাদশ দিনে তারা তাদের যাতনা গৃহ দর্শন করে ও সেখানেই বান্ধব প্রদত্ত পিণ্ড ভক্ষণ ও জল পান করে। তারপর এক ভয়ঙ্কর লৌহপুরে যমকে দেখতে পায়। তাঁর বদন দংষ্ট্রাকরাল, আকৃতি বিরূপ ও ভ্রূকুটি সংসর্গে দারুণ ভাবাপন্ন। তাঁর বাহু যুগল বিশাল, হাতে পাশ ও দণ্ড। ভীষণ ও বক্র স্বভাব ব্যাধিরা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। এইখানেই মৃতের শুভাশুভ গতি নির্দিষ্ট হয়। মিথ্যা ভাষণ ও কুট সাক্ষ্য প্রদানের জন্য রৌরব নরকে যেতে হয়। দুই যোজন বিস্তৃত এই নরকের জানু প্রমাণ গর্ত অঙ্গারে পূর্ণ, পাপীকে সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে ছুটোছুটি করতে হয়। তারপর অন্য সব নরক ভোগের পর তির্যগ্ যোনিতে কৃমি কীট প্রভৃতি হয়ে জন্মাতে হয়। মানুষ হয়েও প্রথমে কুব্জ কুৎসিত বামন ও চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। তারপর শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পাপের জন্যই নরকে যেতে হয় ও নীচ জাতিতে জন্মাতে হয়। আবার পুণ্য কাজের জন্য ধর্মরাজ শুভ গতি নির্দিষ্ট করেন। তারা দিব্য মাল্যে শোভিত বিমানে আরোহণ করে, তাদের সামনে গন্ধর্বরা গান ও অপ্সরারা নৃত্য করে।

পুত্র বললেন, আমি আপনার নিকট জীবের বিপত্তি বর্ণনা করলাম। এইবারে তার গর্ভলাভের কথা শুনুন। পুরুষ স্ত্রীর রজে যে বীজ ফেলে, স্বর্গ বা নরক থেকে বিমুক্ত জীব তাতে প্রবেশ করে। নারিকেল যেমন কোষ সমেত বর্ধিত হয়, তেমনি ঐ কোষও অধোমুখে থেকে বর্ধিত হতে থাকে। জননীর ভুক্ত খাদ্যে তার পুষ্টি হয়। ঐ সময়ে তার প্রাক্তন জন্ম পরম্পরা তার স্মৃতিপথে উদিত থাকে এবং জন্মযন্ত্রণা স্মরণ করে ভাবে যে এবারে জন্মের পর এমন কাজ করবে যে আর যেন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। কিন্তু দশ মাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়েই মূর্ছা যায় এবং পুনরায় চেতনা লাভ করলেও আত্মজ্ঞান ভ্রষ্ট হয়। তাতেই সে বাল্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং কৌমার যৌবন ও

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কর্মফল অনুসারে আবার স্বর্গ ও নরক ভোগ, তারপর পুনর্জন্ম। এই সংসার চক্রে ঘটি যন্ত্রের মতো সে পরিভ্রামিত হয়। নরকের সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে নরকে পতনের সময়ে পাপীরা স্বর্গের সুখভোগ দেখতে পায়। আবার স্বর্গেও সারাক্ষণ এই দুঃখ যে তাকেও একদিন সেই দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাত, এই দুঃখসঙ্কুল সংসারে কিছুমাত্র সুখ নেই। সেই জন্যই আমি মোক্ষ কামনা করছি। আর কি আমি বৈদিক ধর্মের অনুসরণ করতে পারি!

পিতা বললেন, বৎস, তুমি জ্ঞান বিতরণ করে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছ তার বলে অন্য সব নরকের বৃত্তান্তও বল।

পুত্র বললেন, মহারৌরব চারিদিকে সাতান্ন সহস্র যোজন। তার তাম্রময় ভূমির নিচে আগুন এবং তাপে সব দিক দগ্ধ হচ্ছে। যমদূতরা পাপীর হাত পা বেঁধে তার মধ্যে ছেড়ে দেয়। যারা দুষ্ট বুদ্ধি নিয়ে পাপ করে, তারা অযুত বর্ষের পরে এই নরক থেকে মুক্তি পায়। তমো নামক নরকে অত্যন্ত শীত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পাপাত্মারা শীতে অভিভূত হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও আশ্রয় করে থাকে। হিমের খণ্ড বহন করে বাতাস তাদের অস্থি ভেদ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা গলিত মজ্জা ভক্ষণ করে, রক্ত পান করে। দুষ্কৃতির ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত এই নরকে বাস করতে হয়। তারপর নিকৃন্তন নামে বিশাল ও ভয়ঙ্কর নরক। সেখানে শত শত কুলাল চক্র বা কুমোরের চাকা ঘোরানো হচ্ছে। তার উপর চড়িয়ে যমকিঙ্করর৷ কাল সূত্র দিয়ে পাপাত্মাদের আপাদ মস্তক কর্তন করে। সহস্র বর্ষ ছেদন করার পরেও তাদের মৃত্যু হয় না, দেহের ছিন্ন খণ্ডগুলি এক হয়ে যায়। কাউকে জলের মধ্যে ঘটির মতো ঘটি যন্ত্রে বদ্ধ করে ভ্রমণ করানো হয়, তাতে তারা রক্ত বমি করে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপের ক্ষয় যতদিন না হয়, ততদিন এইভাবে তাদের ঘোরানো হয়। তারপর সহস্র যোজন বিস্তৃত অসিপত্রবন নামের

নরকের কথা। এই নরকের সর্বত্রই আগুনে আচ্ছন্ন এবং মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য কিরণ। এরই মধ্যে স্নিগ্ধ পত্রের রমণীয় বন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বনের পত্র খড়্গের ফলকের মতো এবং তার পিছনে বাঘের মতো ভয়ঙ্কর বদন ও দশন বিশিষ্ট কুকুর চিৎকার করছে। তৃষ্ণায় নিপীড়িত নারকীরা সেই বনের দিকে ধাবমান হলে বাতাসে সেই খড়্গের মতো পাতা তাদের দেহে এসে পড়ে এবং তারপর ভূমির আগুনে পড়ে লকলক করে জ্বলে ওঠে। কুকুরগুলো এসে তাদের কামড়াতে থাকে। এরপর তপ্ত কুণ্ড নামক নরকের কথা শুনুন। এই নরকের তপ্তকুণ্ডগুলি বহ্নিশিখায় পরিবৃত এবং তা তৈল ও লৌহচূর্ণে পূর্ণ। যমদূতেরা পাপীদের তাতে নিক্ষেপ করলে তারা সিদ্ধ হতে থাকে। তারপর যমদূতেরা তাদের ছেদন করতে আরম্ভ করলে প্রচণ্ড আকারের গৃধ্ররা তাদের উপরে তুলে পুনরায় কুম্ভে ফেলে দেয়। আবার তাদের তেলে পাক করা হয়। তাতে তাদের দেহের অস্থি মাংস ত্বক শির ও স্নায়ু গলে যায় এবং যমদূতেরা তা দর্বী দিয়ে ঘেঁটে জ্বলন্ত তেলে মথিত করে।

বিপশ্চিৎ রাজার নরক ভোগ

নরক বর্ণনার পর পুত্র পিতাকে বললেন, সাত জন্ম আগে আমি এক বৈশ্য বংশে জন্মে পান ভূমিতে গরুদের জল খেতে দিই নাই। এই অপরাধে আমার নরক বাস হয়। আগুনে ভয়াবহ ও লৌহমুখ পাখিতে পূর্ণ সেই নরক। তাপে সবাই দগ্ধ হচ্ছে ও রক্তে কর্দমাক্ত হচ্ছে ভূমি। একশো বছর পর হঠাৎ একদিন শীতল বাতাসে শরীরের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল এবং পরম শান্তি অনুভব করলাম। আহ্লাদে বিস্ফারিত ও বিস্মিত হয়ে একজন পুরুষকে দেখতে পেলাম। বজ্র সদৃশ দণ্ড হাতে এক ভীষণদর্শন যমদূত তাঁকে পথ দেখিয়ে বলছে, এই দিকে আসুন। চারিদিকে নরক যন্ত্রণা দেখে সেই পুরুষ বললেন, আমি এমন কি দুষ্কর্ম করেছি যার জন্য এই নরকে আসতে হল?

জনক বংশে বিপশ্চিৎ নামে বিখ্যাত রাজা হয়ে আমি জন্মেছিলাম। অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্মানুসারে পৃথিবী পালন করেছি। অতিথিকে বিমুখ করি নি। সংগ্রামেও বিমুখ হই নি। পরস্ত্রী ও পরধনে লোভ কখনও করি নি। দেবতা ঋষি পিতৃগণ ও ভৃত্য কারও উপরে অত্যাচার ক.র নি। পর্বে পিতৃগণ ও তিথিতে দেবতারা আসতেন পান ভূমিতে ধেনুর মতো। তাঁরা বিমুখ হয়ে নিঃশ্বাস ফেললে গৃহস্থের ইষ্ট ভ্রষ্ট হয়। পিতৃগণের নিঃশ্বাসে সাত জন্মের পুণ্য ও দেবগণের নিঃশ্বাসে তিন জন্মের সুকৃত নষ্ট হয় বলে আমি যথাবিহিত ব্যবহার করেছি। তবু আমার এ রকমের নরক ভোগ হল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে যমদূত বিনীত ভাবে বলল, মহারাজ, আপনি যে সামান্য পাপ করেছেন তা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনার এক পত্নী বিদর্ভ রাজকন্যা পীবরী ঋতুমতী হলে আপনি তাঁর ঋতু রক্ষা করেন নি। আপনি তখন দ্বিতীয় পত্নী পরম সুন্দরী কৈকেয়ীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন। কামে আসক্তির জন্যই আপনার এই নরক ভোগ। আপনার আর কোন পাপ নেই। তাই আসুন, এইবারে পুণ্য ভোগ করতে চলুন। রাজা বললেন, আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে। কী পাপ বা নিন্দিত কাজ করে এসে এখানে এরা এমন কষ্ট পাচ্ছে, তাই আমাকে বল। যমদূত বলল, আমি সংক্ষেপে আপনাকে সব কথা বলছি। সব মানুষই পর্যায়ক্রমে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে। ভোগেই কর্মের ক্ষয় হয়। পাপীরা যেমন ক্লেশের পর ক্লেশ ভোগ করে। তেমনি পুণ্যবানরা সুখের পর সুখ ভোগ করে। মানুষ শত সহস্র জন্ম গ্রহণ করে পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে ও তার ফল ভোগ করে। এই পাপীরা দিবানিশি নরকে আবদ্ধ থেকে কৃত পাপের ক্ষয় করছে। যারা দুষ্ট চোখে পরস্ত্রীকে দর্শন ও দুষ্ট মানসে পর ধনে লোভ করেছে, তাদের চোখ এই লৌহমুখ পাখিরা বার বার উপড়ে ফেলছে। যারা অসৎ মন্ত্রণা বা অসৎ উপদেশ দিয়েছে

বা শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করেছে অথবা দেবতা গুরু বা বেদের নিন্দা করেছে, তাদের জিহ্বা বার বার হরণ করা হচ্ছে। যে যতবার এই কাজ করেছে, তাকে তত হাজার বছর এই কষ্ট ভোগ করতে হবে। যারা পিতাপুত্র পতিপত্নী সুহৃৎ স্বজন প্রভৃতি যে কোন রকম ভেদ সাধন করেছে, তাদের ঐ করপত্রে বিদীর্ণ করা হচ্ছে। যারা পরের আহ্লাদ নষ্ট করে বা সন্তাপ ঘটায় অথবা সাধুদের দুঃখ দেয়, তাদের ঐ তপ্ত বালির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছে। যে শঠ অর্থাৎ মুখে এক অথচ মনে ভিন্ন, তার জিহ্বা কেটে দু টুকরো করা হয়। যারা অগ্নি ব্রাহ্মণ গুরু গুরুজন বৃদ্ধ ও গরুর গায়ে পা দিয়েছে, তাদের জানু পর্যন্ত দগ্ধ করা হচ্ছে। যারা ক্রোধ বা লোভের বশে দেবালয় বা সভা ভেঙেছে বা ধ্বংস করেছে, তাদের দেহের ত্বক খণ্ড খণ্ড করা হচ্ছে। দত্তা কন্যাকে অন্য পাত্রে যারা দিয়েছে, তাদের খণ্ড খণ্ড করে ক্ষার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যারা আত্মম্ভরি হয়ে দুর্ভিক্ষ বা বিপদের সময়ে পুত্র কলত্র বন্ধু ও ভৃত্যকে বর্জন করেছে, ক্ষুধার সময় তাদেরই মাংস কেটে খাওয়ানো হচ্ছে। যাবজ্জন্মার্জিত পুণ্য প্রদান করলে শিলায় নিষ্পিষ্ট হতে হয়। গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করলে পাশবদ্ধ অবস্থায় তাদের বৃশ্চিক ও কৃমির ভক্ষ্য হতে হয়। পরস্ত্রী হরণ ও দিবসে মৈথুন করলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হতে হয়। কণ্টক পরিবৃত লোহার শাল্মলীতে তাদের আরোপ করা হচ্ছে এবং পরদারমর্ষীকে মুষায় সন্নিবিষ্ট করে বিনাশ করা হচ্ছে। উপাধ্যায়ের অবমাননা করে অধ্যয়ন বা শিল্প গ্রহণ করলে মাথায় শিলা বহন করতে হয়। জলে মল মূত্র শ্লেষ্মা ত্যাগ করলে দুর্গন্ধ নরকে পড়তে হয়। পরস্পর আতিথ্য বিধানে ভোজন না করার জন্য ওরা পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করছে। পতিতের প্রতিগ্রহ গ্রহণ ও তার যাজন ও নিত্য সেবা করে পাষাণের কীট হতে হয়েছে। ঐ দেখুন, উপকারীর উপকার স্বীকার না করার জন্য ঐ নরাধমকে অন্ধ বধির ও মূক হয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুরতে হচ্ছে। আর ঐ ব্যক্তি মিত্রদের অপকার

করার পাপে তপ্ত কুণ্ডে পতিত হয়েছে। এর পরেও ওর ভাগ্যে আরও অনেক রকম যন্ত্রণা আছে। পরস্পর সংমিলিত হয়ে শ্রাদ্ধে ভোজন করার জন্য ঐ ব্রাহ্মণদেব এখন সর্বাঙ্গ থেকে বিনিঃসৃত ফেন পান করতে হচ্ছে। আর ঐ দেখুন, স্বর্ণ চুরি সুরা পান গুরুপত্নী গমন ও ব্রহ্মহত্যার জন্য এদের আগুনে দগ্ধ হতে হচ্ছে। বহু সহস্র বছর দগ্ধ হবার পর ওরা কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগাদি নিয়ে জন্মাবে, মরে আবার নরকে আসবে। তারপরেও জন্ম নিয়ে আধিব্যাধি ভুগবে। কল্পান্ত পর্যন্ত এই ভাবেই চলবে। গোহত্যাতেও তিন জন্ম নরক ভোগ।

যমদূত বলল, নরক থেকে মুক্ত হয়েই নিষ্কৃতি নেই। যে পাপে যে যোনিতে জন্ম হবে এবারে তাই বলছি। পতিতের প্রতিগ্রহ করলে দ্বিজাতি নরক মুক্তির পরে গর্দভ হয়ে জন্মায় এবং তাদের যাজন করলে কৃমি হয়। উপাধ্যায়ের পত্নী বা অন্য কোন দ্রব্য মনে মনে কামনা করলে বা পিতা মাতার অবমাননা করলে গাধা হয়ে জন্মাতে হয়। পিতা মাতার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করলে শালিখ হয়। ভ্রাতার পত্নীকে অবমাননা করলে কপোত ও পীড়ন করলে কচ্ছপ হয়। প্রভুর অভীষ্ট সাধনে বিমুখ হলে বানর হতে হয়। গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করলে কৃমি হয় এবং অসূয়াপর হলে রাক্ষস হতে হয়। মাছ হয় বিশ্বাসঘাতকতা করলে এবং মূষিক হয় শস্য হরণ করলে। পরদার হরণ করলে প্রথমে নেকড়ে ও পরে একে একে কুকুর শেয়াল বক শকুন সাপ ও কঙ্ক পাখি হয়। ভ্রাতৃজায়াকে অবমাননা করলে পুংস্কোকিল হতে হয়। শূকর হতে হয় বন্ধুপত্নী গুরুপত্নী বা রাজপত্নীকে ধর্ষণ করলে। দান যজ্ঞ বা বিবাহে বিঘ্ন ঘটালে কিংবা দত্তা কন্যা পুনর্দান করলে কৃমি হতে হয়। দেব দ্বিজ ও পিতৃগণকে নিবেদন না করে নিজে ভোজন করলে কাক হতে হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করলে ক্রৌঞ্চ হতে হয়। শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণী গমন করলে কৃমি হতে হয় এবং তার সন্তান হলে প্রথমে কাঠের কীট ও পরে শূকর কৃমি পানকৌড়ি ও চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। কৃতঘ্ন

ও অকৃতজ্ঞ হলে কৃমি কীট পতঙ্গ বৃশ্চিক মৎস্য বায়স কূর্ম ও চণ্ডাল হয়ে জন্মাতে হয়। শাস্ত্রহীন পুরুষকে বধ করলে গাধা এবং স্ত্রী হত্যা বা শিশু হত্যা করলে কৃমি হয়। খাদ্য হরণ করলে সাধারণ ভাবে মাছি হয়। কিন্তু বিশেষ রকমের খাদ্যের জন্য নানারূপ পশু পাখি হয়ে জন্মাতে হয়। এই ভাবে সব রকমের পাপের জন্য জন্মান্তরে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিতে হয়।

এই কথা বলে যমদূত রাজাকে নিয়ে গমনে উদ্যত হলে নরকবাসীরা বলে উঠলেন, মহারাজ, আপনি আর একটু থাকুন, আপনার অঙ্গসঙ্গী বাতাসে আমাদের সর্বাঙ্গের পরিতাপ দূর হয়ে আহ্লাদ উপস্থিত হয়েছে। এই কথা শুনে রাজা যমদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এমন কী পুণ্য করেছিলাম যার প্রভাবে এঁদের এই আহ্লাদ হচ্ছে? যমদূত বলল, আপনি পিতৃগণ দেবতা অতিথি ও পোষ্যদের আগে খাইয়ে অবশিষ্ট অন্নে শরীর পোষণ করেছিলেন বলে আপনার অঙ্গসঙ্গী বাতাস আহ্লাদজনক হয়েছে এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে এই নরকের নানাবিধ পীড়নের ব্যবস্থা আপনার তেজেই পরাহত হয়েছে। রাজা বললেন, আমার ধারণা যে আর্তের যাতনা দূর করে যে সুখ, তা স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকেও পাওয়া যায় না। আমার সান্নিধ্যে যদি এদের দুঃখ দূর হয় তো আমি এখানেই থাকব। যমদূত বলল, রাজা, আপনার আর নরকে থাকবার প্রয়োজন নেই। এবারে চলুন, নিজের পুণ্যবলে অর্জিত সুখ ভোগ করবেন। রাজা বললেন, যতদিন এরা আমার সান্নিধ্যে সুখ ভোগ করবে, ততদিন আমি এখান থেকে যাব না। এর জন্য আমি নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতেও স্বীকৃত আছি। কাজেই তুমি এখান থেকে যেতে পার। যমদূত বলল, এই দেখুন, ধর্ম ও ইন্দ্র আপনাকে নিতে এসেছেন। তখন ধর্ম বললেন, এই বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে চল। রাজা বললেন, এই লোকেরা নরকের সহস্র যাতনায় কাতর হয়ে আমাকে ত্রাণ করতে বলছে। কাজেই আমি যাব না। ইন্দ্র বললেন, এরা

পাপ করেই নরক ভোগ করছে, তুমি তোমার পুণ্যবলেই স্বর্গে যাবে। রাজা বললেন, আপনারা যদি জানেন তবে বলুন আমি কত পুণ্য সঞ্চয় করেছি? ধর্ম বললেন, রাজা, সাগরের জলবিন্দু আকাশের তারা বর্ষার ধারা বা গঙ্গার বালুকণার মতো তোমার পুণ্যেরও সংখ্যা নেই। আজ এই নরকবাসীদের অনুকম্পা করাতে তা শত সহস্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তাই তুমি এখন স্বর্গসুখ ভোগের জন্য চল, আর এরা এখানেই তাদের পাপের ক্ষয় করুক। রাজা বললেন, আমার যা কিছু পুণ্য আছে, তারই প্রভাবে এরা নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করুক! ইন্দ্র বললেন, এতে তোমার স্বর্গ থেকেও উচ্চ লোক লাভ হল। এই দেখ, এই পাপীরা নরক থেকে মুক্তি লাভ করল।

পুত্র তাঁর পিতাকে বললেন, রাজার উপরে তখন পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং ইন্দ্র তাঁকে বিমানে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। আমিও অন্যান্য নরকবাসীর সঙ্গে মুক্ত হয়ে ভিন্ন যোনিতে উৎপন্ন হলাম।

পতিব্রতার কাহিনী

পিতা বললেন, সংসার যদি ঘটি-যন্ত্রের মতো এই রকম হেয়, তবে আমার কিরূপ অনুষ্ঠান করা বিধেয়?

পুত্র বললেন, আপনি গার্হস্থ্য ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ নিন। তারপর অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ ও আত্মায় আত্মাকে সন্নিহিত করে একদিন অন্তর ভোজন করুন। সেই অবস্থায় যোগপরায়ণ হয়ে বাহ্যজ্ঞান রহিত হলে ব্রহ্মযোগ লাভ করবেন।

পিতা বললেন, যে যোগ প্রাপ্ত হলে ভূতের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে আর ক্লেশ ভোগ করতে হয় না, এবারে তুমি মুক্তির হেতু সেই যোগের কথা বল।

পুত্র বললেন, অলর্কের প্রশ্নের উত্তরে দত্তাত্রেয় যে যোগের কথা বলেছিলেন, আমি সেই কথা আপনাকে বলছি শুনুন।

পিতা বললেন, দত্তাত্রেয় কার পুত্র এবং অলর্কই বা কে?

পুত্র বললেন, পুরাকালে কুশিক বংশের এক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করতেন। তিনি পূর্ব জন্মের পাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ও অভিভূত হন.। তাঁর পত্নী তাঁকে দেবতার মতো সেবা ও অর্চনা করতেন, মল মূত্র পরিষ্কার স্নান ভোজন প্রভৃতি সমস্ত কাজ করেও প্রিয় সম্ভাষণ করতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর নিষ্ঠুর কোপন স্বভাব বশত নিরন্তর অনুযোগ করতেন। তবু তাঁর পত্নী বীতরাগ না হয়েও তাঁর কুষ্ঠরোগে বীভৎস আকৃতির স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। ব্রাহ্মণের চলৎশক্তি না থাকলেও একদিন স্ত্রীকে বললেন, সেদিন আমি রাজমার্গে গৃহস্থিতা যে বেশ্যাকে দেখেছিলাম, আমাকে তুমি তার কাছে নিয়ে চল। দেখে অবধি তার রূপ আমাব হৃদয় থেকে অপসৃত হচ্ছে না। সে আমাকে আলিঙ্গন না করলে তুমি আমাকে মৃত দেখবে। তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী এই কথা শুনে ভাবলেন যে স্বামীর মনস্তুষ্টি বিধানই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। তাই তখনই বদ্ধপরিকর হয়ে অনেক পরিমাণে শুল্ক নিলেন এবং স্বামীকে কাঁধে করে মৃদু গমনে চলতে লাগলেন। তখন রাত্রিকাল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। বিদ্যুতের আলোতেই শুধু রাজপথ দেখা যাচ্ছিল। সেই পথের ধারে মাণ্ডব্য ঋষিকে চোর সন্দেহে শূলে বিদ্ধ করে স্থাপন করা হয়েছিল। অন্ধকারে দেখতে না পাওয়ার জন্য সেই ব্রাহ্মণের পা ঋষির গায়ে লাগে। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে আমার দেহে পদাঘাত করে কষ্ট দিল, সেই নরাধম সূর্যোদয়ে প্রাণ ত্যাগ করবে। ব্রাহ্মণের পত্নী এই শাপের কথা শুনেই ব্যথিত হয়ে বললেন, সূর্যের আর উদয় হবে না।

এর পর সূর্যের উদয় না হওয়াতে বহু দিন রাত্রিই রয়ে গেল। দেবতারা ভীত হয়ে ভাবলেন, সূর্য না উঠলে স্নান দানাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত, হোম যজ্ঞাদি লোপ পাবে। সৃষ্টি রক্ষাই বা হবে কী করে! দেবতারা মিলিত হয়ে যখন এইরূপ বলাবলি করছেন, তখন প্রজাপতি বললেন, তেজের দ্বারা তেজের ও তপস্যার দ্বারা তপস্যার উপশম হয়। এক পতিব্রতার মাহাত্ম্যে সূর্যোদয় হচ্ছে না, তোমরা আর

এক পতিব্রতা অত্রির পত্নী অনসূয়াকে সূর্যোদয়ের জন্য প্রসাদিত কর। দেবতারা গিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করলে অনসূয়া বললেন, আমি পতিব্রতার মাহাত্ম্যের হানি করব না, তাঁর সম্মান রক্ষা করে আমি দিন সৃষ্টি করব। তাতে অহোরাত্রের ব্যবস্থা হবে, কিন্তু সেই সাধ্বীর স্বামী মরবেন না। এই বলে তিনি সেই পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর গৃহে গেলেন। তাঁর ও স্বামীর মঙ্গল ও ধর্ম জিজ্ঞাসা করে বললেন, কল্যাণি, পুরুষের পাঁচটি ঋণ সর্বতোভাবে শোধ করাই কর্তব্য। নিজের বর্ণধর্মানুসারে ধন উপার্জন করতে হয় এবং তা সৎপাত্রে ন্যস্ত করতে হয়, সর্বদা ঋজু ও সত্যশীল হতে হয়, তপস্যা দান ও ধ্যান করতে হয় এবং রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রতিদিন এই কাজে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করলেই তাদের প্রাজাপত্য প্রভৃতি লোক লাভ হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে এ রকম ক্লেশ স্বীকার করতে হয় না, শুধু স্বামী সেবা করেই তারা পুরুষের কষ্টার্জিত পুণ্যের অর্ধাংশের ভাগী হয়। স্ত্রীদের কোন পৃথক যজ্ঞ শ্রাদ্ধ বা উপবাসাদি অনুষ্ঠান করতে হয় না। স্বামী সেবার দ্বারাই তারা অভীষ্ট লোকে গমন করে।—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং নাপ্যুপোষিতম্।
ভর্তৃ শুশ্রূষয়ৈবৈতান্ লোকানিষ্টান্ ব্রজন্তি হি॥

স্বামীই যখন স্ত্রীদের একমাত্র গতি, তখন তাঁরই উপাসনায় সর্বদা মনোনিয়োগ করবে। পুরুষ যেমন পিতৃগণ দেবতা ও অতিথিদের অর্চনা করে পূণ্য ফল অর্জন করে, নারী তেমনি অনন্য চিত্তে স্বামার সেবা করেই তার অর্ধেক ফল পেয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণের পত্নী অনসূয়ার কথার সাদরে উত্তর দিলেন, আজ আমি ধন্য হলাম। আমিও জানি যে নারীদের পতি সেবার সমান দ্বিতীয় গতি নেই। স্বামীই নারীর দেবতা, তাই স্বামী প্রসন্ন হলে শুধু ইহলোকে নয় পরলোকেও তার সুখ ভোগ হয়।—

জানাম্যেতন্ন নারীনাং কাচিৎ পতিসমা গতিঃ।
তৎ প্রীতিশ্চোপকারায় ইহলোকে পরত্র চ॥

এবার বলুন, আপনি কী জন্য আমাদের গৃহে এসেছেন? আমি বা আমার স্বামীকে কী করতে হবে?

অনসূয়া বললেন, তোমার কথায় দিন রাত্রি লোপ ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রহিত হয়েছে বলে দেবতারা দুঃখিত হয়ে আমার কাছে এসে বলেছেন যে আবার যেন আগের মতো দিন রাত্রি হয়। এতে একদিন জগতের উচ্ছেদ হবে। এই আপদ থেকে তুমি যদি জগৎকে উদ্ধার করতে চাও তো সূর্যের উদয় হোক।

ব্রাহ্মণী বললেন, কিন্তু সূর্যের উদয় হলেই যে ঋষির শাপে আমার স্বামীর মৃত্যু হবে!

অনসূয়া বললেন, যদি তোমার সম্মতি থাকে তাহলে আমি তোমার স্বামীকে নবকলেবর দেব।

ব্রাহ্মণের পত্নী এ কথায় সম্মত হতেই তপস্বিনী অনসূয়া অর্ঘ্য উদ্যত করে সূর্যকে আবাহন করলেন। দশ দিন শুধু রাত্রির পর সূর্য অরুণ কলেবরে উদয়াচল শিখরে আরোহণ করলেন। তার অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ প্রাণশূন্য হয়ে ভূপৃষ্ঠে পড়লেন। অনসূয়া বললেন, ভদ্রে, তুমি শোক না করে আমার স্বামী সেবা ও তপস্যার বল দেখ। রূপ চরিত্র বুদ্ধি প্রিয় বাক্য প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণে অন্য পুরুষকে যদি আমার স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভেবে না থাকি, তবে সেই সত্য বলে এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শতবর্ষ জীবিত থাকুন। এই কথা বলামাত্র ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হয়ে উত্থান করলেন। আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি ও বাদ্যধ্বনি হতে লাগল। দেবতারা অনসূয়াকে বললেন, কল্যাণি, তুমি বর নাও। অনসূয়া বললেন, আমাকে যদি বর দানের যোগ্য পাত্রী মনে করেন তো এই বর দিন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার পুত্র হবেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেবতারা তথাস্তু বলে বিদায় নিলেন।

দত্তাত্রেয়র কথা

পুত্র বললেন, এর অনেক দিন পর ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র অত্রি তাঁর অনিন্দিতা স্ত্রী অনসূয়াকে ঋতুস্নাত দেখে মনে মনে ভজনা করলেন। সেই সময়ে বায়ু তাঁকে সবেগে বহন করলে বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মরূপ তেজ দশ দিক গ্রহণ করল। তাতেই সকল প্রাণীর আয়ুর আধার চন্দ্র অত্রির মানস পুত্র রূপে উৎপন্ন হলেন। ঐ সময়ে বিষ্ণুও তুষ্ট হয়ে নিজের শরীর থেকে দত্তাত্রেয়কে জন্ম দিলেন। তারপর রুদ্রের অংশে দুর্বাসার জন্ম হল। এই ভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের অংশে অনসূয়ার তিন পুত্র জন্মাল। ব্রহ্মা সোম রূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে ও শিব দুর্বাসা রূপে জন্ম নিলেন। সোম স্বর্গ থেকে তাঁর শীতল রশ্মি দিয়ে মানুষ ও ওষধিকে আপ্যায়িত করতে লাগলেন, দত্তাত্রেয় দুষ্ট দৈত্য দলন ও শিষ্ট পালন করতে লাগলেন এবং দুর্বাসা রুদ্র মূর্তিতে উদ্ধত ভাবে দুরাত্মাদের দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। এই ভাবে চন্দ্র সোমত্ব, দত্তাত্রেয় যোগস্থ হয়ে বিষয় ভোগ ও দুর্বাসা পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে উন্মত্ত নামের ব্রত অনুসরণে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।

দত্তাত্রেয় সর্বদা ঋষি কুমারে পরিবৃত হয়ে যোগ সাধন করতেন। সংসার সঙ্গ পরিহারের জন্য দীর্ঘকাল সরোবরের জলে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। কিন্তু শতবর্ষ অতীত হলেও ঋষি কুমাররা তাঁকে ত্যাগ করলেন না দেখে তিনি এক সুন্দরী নারীর সঙ্গে জল থেকে উঠে এলেন। স্ত্রী সঙ্গী দেখে তারা তাঁকে ত্যাগ করবে ভেবে তিনি সেই নারীর সঙ্গে সুরাপান গীত বাদ্য বনিতা ভোগে দূষিত ও বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত হলেন। কিন্তু তবু ঋষি কুমারেরা তাঁকে পরিত্যাগ না করে ভাবলেন যে দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ এবং যোগীদের নিয়ন্তা বলে কোন দোষ তাঁকে স্পর্শ করে না।

এদিকে রাজা কৃতবীর্য পরলোক গমন করলে মন্ত্রী পুরোহিত ও পৌরগণ সমবেত হয়ে তাঁর পুত্র অর্জুনকে অভিষেকের জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু অর্জুন বললেন, রাজত্বের পরিণাম নরক, তাই

আমি তা গ্রহণ করব না। রাজা যে জন্য কর গ্রহণ করেন, তা না করে পণ্ড করেন। বণিকরা রাজাকে পণ্যের দ্বাদশ ভাগ কর দেয়, অথচ পথে তারা রাজার অর্থরক্ষী পুরুষদের বদলে দস্যুদের কৃপার উপরে নির্ভর করে যাতায়াত করে। গোপ ও কৃষকেরা তাদের ঘৃত ও শস্যের ষষ্ঠভাগ কর দেয়। তারা যদি বেশিও দেয় এবং রাজা তা গ্রহণ করেন, তাহলে তা চুরি করা হয়। প্রজারা যদি রাজাকে বৃত্তি দেয় অথচ অন্যে তাদের প্রতিপালন করে, তাহলে ঐ ষষ্ঠাংশ গ্রহণের জন্য রাজার নরক ভোগ হয়। প্রাচীন পণ্ডিতরা এই ষষ্ঠ ভাগ রাজার রক্ষণ বেতন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং প্রজাকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে রাজারই চুরির পাপ হয়। তাই আমি এই রকম রাজা হয়ে পাপের ভাগী হতে চাই না। আমি তপস্যা করে পৃথিবী পালনে সমর্থ অদ্বিতীয় শস্ত্রধর রাজা হতে চাই।

তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে বয়োবৃদ্ধ গর্গমুনি বললেন, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো দত্তাত্রেয়র আরাধনা কর। সেই যোগী বিষ্ণুর অংশ ও পৃথিবীর পালক। তাঁরই আরাধনা করে দুরাত্মা দৈত্যদের বধ করে ইন্দ্র তাঁর রাজ্য উদ্ধার করেছেন। অর্জুন বললেন, দৈত্যরা কেন ইন্দ্রত্ব হরণ করেছিল এবং দেবতারাই বা কেন দত্তাত্রেয়র আরাধনা করেন?

গর্গ বললেন, দেবাসুরের যুদ্ধে জম্ভ দৈত্যদের এবং ইন্দ্র দেবতাদের অধিনায়ক হয়েছিলেন। এক বৎসর যুদ্ধের পর বিপ্রচিত্তি প্রমুখ দানবদের হাতে দেবতারা পরাজিত হয়ে বালখিল্য ঋষিদের সঙ্গে বৃহস্পতির শরণ নিলেন। বৃহস্পতি বললেন যে দত্তাত্রেয়কে তুষ্ট করতে পারলে তিনিই দৈত্য বিনাশের বর দেবেন। এই কথা শুনে দেবতারা দত্তাত্রেয়র আশ্রমে গিয়ে দেখলেন যে তিনি লক্ষ্মীর সঙ্গে সুরাপান করছেন এবং গন্ধর্বরা গান গাইছে। দেবতারা তাঁকে প্রণতি জানিয়ে ভোক্ষ্য ভোজ্য ও মাল্যাদি উপহার দিয়ে কার্যসিদ্ধির জন্য স্তব করতে লাগলেন। দত্তাত্রেয় তাঁদের আরাধনা দেখে বললেন, কেন তোমরা

আমার সেবা করছ ? দেবতারা বললেন, জম্ভাদি দানবরা স্বর্গ হরণ করে যজ্ঞভাগও অপহরণ করেছে। আমাদের পরিত্রাণের জন্য আপনি তাদের বধের ব্যবস্থা করুন, আমরা পুনরায় স্বর্গ লাভ করতে চাই। দত্তাত্রেয় বললেন, আমি মদ্যপ ও ইন্দ্রিয়ের বশ। আমি তোমাদের কী সাহায্য করতে পারি ? দেবতারা বললেন, বিদ্যার উদয়যোগ বশে আপনার আত্মা বিশুদ্ধ, আপনি নিষ্পাপ ও কিছুতেই লিপ্ত নন। দত্তাত্রেয় হেসে বললেন, তাহলে তোমরা অসুরদের যুদ্ধে আহ্বান করে আমার চোখের সামনে আনো। দেবতারা,তাই করলেন। দৈত্যরা দেবতাদের প্রহার করতে করতে দত্তাত্রেয়র আশ্রমে এসে তাঁর বাম পাশে লক্ষ্মীকে দেখতে পেল। তাঁর সৌন্দর্যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তারা দেবতাদের ত্যাগ করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এঁকে শিবিকায় তুলে নিজেদের নিলয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। বলে সবাই মিলে লক্ষ্মীকে শিবিকায় তুলে প্রস্থান করল। তাই দেখে দত্তাত্রেয় হেসে দেবতাদের বললেন, তোমরা বিজয়ী হলে। লক্ষ্মী যখন দৈত্যদের দেহের সপ্ত স্থান অতিক্রম করে তাদের মাথায় আরোহণ করেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাদের ত্যাগ করবেন। দেবতারা বললেন, লক্ষ্মী পুরুষের কোন্ স্থানে অবস্থান করলে কী ফল প্রদান করেন ? দত্তাত্রেয় বললেন, পদস্থিতা হলে তিনি নিলয় দান করেন, উরুতে থাকলে বস্ত্র ও ধন, গুহ্যে থাকলে বস্ত্র, কোলে থাকলে সন্তান, হৃদয়ে থাকলে সমস্ত অভীষ্ট বিষয়, কণ্ঠে থাকলে কণ্ঠভূষণ ও মুখে থাকলে কবিত্ব দান করেন। আর মাথায় থাকলে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে অন্য পুরুষের আশ্রয় চান। এই অবসরে অসুরদের তোমরা আঘাত কর, আমি তাদের নিস্তেজ করেছি। তারাও পরদার ধর্ষণের পাপে তেজহীন হয়েছে। দেবতারা অসুরদের অস্ত্র প্রহার করে বধ করলেন এবং লক্ষ্মীও তাদের মস্তক থেকে নেমে দত্তাত্রেয়র পাশে চলে এলেন। তাই বলছিলাম, তুমিও দত্তাত্রেয়র আরাধনা কর।

গর্গের কথায় অর্জুন দত্তাত্রেয়র আশ্রমে গিয়ে তাঁর পূজা করলেন

এবং নানা ভাবে পরিচর্যা করতে লাগলেন। ঋষি তুষ্ট হয়ে বললেন, এই স্ত্রীর সংসর্গে আমি অপবিত্র ও তেজোহীন হয়েছি, আমি তোমার কোন উপকার করতে অশক্ত। তুমি কোন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হও। অর্জুন বললেন, আপনি কেন আমাকে মায়ায় ভুলোতে চাইছেন? আপনি যেমন নিষ্পাপ, তেমনি এই দেবীও সবার জননী। দত্তাত্রেয় বললেন, তুমি আমার স্বরূপ মেনেছ বলে বলছি, তুমি বর নাও। অর্জুন বললেন, আমি যেন সর্বতোভাবে প্রজাপালন করতে পারি, কখনও যেন অধর্মে লিপ্ত না হই। তা ছাড়া পরের অভিপ্রায় বুঝবার জ্ঞান চাই, যুদ্ধে যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হই। সহস্র বাহু ও লঘু হস্ত হতে পারি, সর্বত্র আমার গতি যেন অপ্রতিহত হয় এবং আমার মৃত্যু যেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে হয়। আমি যেন সৎপথের প্রদর্শক হতে পারি, আমার রাজত্বে আমাকে স্মরণ করে যেন কারও কিছু নষ্ট না হয় এবং আপনাতে আমার ভক্তি যেন অবিচল থাকে। ঋষি বললেন, তথাস্তু, আমার প্রসাদে তুমি চক্রবর্তী সম্রাট হবে।

অর্জুন ঋষিকে প্রণাম করে ফিরে এসে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঘোষণা করলেন, দস্যুবৃত্তি বা পরের হিংসা করলে এবং শস্ত্র গ্রহণ করলে আমি তাকে সংহার করব। এর পর রাজ্যে আর শস্ত্রধর কেউ রইল না। তিনিই গ্রাম্যপাল পশুপাল অর্থপাল ও ক্ষেত্রপাল হলেন, তিনিই হলেন ব্রাহ্মণ, বণিক ও তপস্বীদের পরিপালক। তাঁর অধিকারে কারও কোন দ্রব্য নষ্ট হত না। তিনি বহুবিধ যজ্ঞ করলেন, যুদ্ধের পর যুদ্ধ করলেন এবং তপস্যা সঞ্চয় করলেন। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য ও অভিমান দেখে মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছিলেন, কি যুদ্ধ কি দান কি তপস্যা কোন কিছুতেই কেউ তার সমকক্ষ হতে পারবে না।

কুবলয়াশ্ব ও মদালসার উপাখ্যান

পুত্র পিতাকে বললেন, দত্তাত্রেয়র পরে এবারে আমি অলর্কের বৃত্তান্ত আপনাকে বলছি। পুরাকালে শত্রুজিৎ নামে এক মহাবীর্যশালী

রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র ঋতধ্বজও বুদ্ধি বিক্রম ও লাবণ্যে গুরু শুক্র ও অশ্বিনীর সমান। তিনি সর্বদা সমবয়স্ক রাজপুত্রগণে পরিবৃত হয়ে শাস্ত্রের বিচার মীমাংসা করতেন। কখনও কাব্য নাটক ও গীতের সমালোচনা, কখনও অক্ষ বিনোদন, কখনও অস্ত্র ও যুদ্ধশিক্ষা, কখনও বা অশ্ব ও রথ চালনা অভ্যাস করতেন। এই সময়ে অশ্বতর নামে নাগরাজের দুই প্রিয়দর্শন পুত্র পাতাল থেকে ব্রাহ্মণের বেশে পৃথিবীতে এসে অন্যান্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কুমারদের সঙ্গে আমোদে যোগ দিতে লাগলেন। ঋতধ্বজও এই দুজনের সঙ্গ কামনা করতেন।

একদিন নাগরাজ পুত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জন্য প্রতিদিন মর্ত্যে যাচ্ছ? পুত্ররা পিতাকে ঋতধ্বজের সব কথা বললেন। পিতা বললেন, তবে তাঁর প্রীতির জন্য আমার গৃহের যে কোন বস্তু দিতে পার। পুত্ররা বললেন, তাঁর যা আছে, আমাদের পাতালে তা কোথায়! তবে তাঁর একমাত্র প্রয়োজন যা আছে, তা পূরণ করা আমাদের অসাধ্য। পিতা বললেন, অসাধ্য হলেও আমি তা শুনতে চাই। আর যাদের অধ্যবসায় দৃঢ়, তাদের অসাধ্য বলে কিছু নেই। পিঁপড়েও সহস্র যোজন যেতে পারে।—

যোজনানং সহস্রানি ব্রজন যাতি পিপীলিকঃ।

মিত্রের উপকার করলেই তার ঋণ শোধ হতে পারে।

পুত্ররা বললেন, রাজ কুমারের কুমার অবস্থায় যা ঘটেছিল, তা শুনুন। একদিন ঋষি গালব একটি অশ্বে আরোহণ করে রাজা শত্রুজিতের কাছে এসে বললেন, এক দৈত্য তাঁর আশ্রমে এসে তা বিনাশ করতে চাইছে। সে নানাবিধ বন্য পশুর মূর্তি ধারণ করে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তপস্যার ক্ষয় হবে বলেই আমি তাকে দগ্ধ করছি না। এই কথা ভেবেই একদিন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে আকাশ থেকে এই অশ্বটি ভুমিতে পড়ল এবং দৈব বাণী হল যে এই ঘোড়া সূর্যের সঙ্গে সমানে চলতে পারে, পাতালেও এর গতি অপ্রতিহত। এর নাম হবে কুবলয়। যে দৈত্য তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, ঋতধ্বজ এই

ঘোড়ায় চড়ে তাকে বিনাশ করবেন এবং তিনি কুবলায়শ্ব নামে বিখ্যাত হবেন। রাজা, এই জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি।

ঋষির কথায় রাজা ঋতধ্বজকে সেই ঘোড়ায় চড়িয়ে তাঁরই সঙ্গে তাঁর আশ্রমে পাঠালেন। ঋতধ্বজ গালবের রমণীয় আশ্রমে এসে বিঘ্ন নিরাকরণে প্রবৃত্ত হলেন। দানব একদিন শূকর রূপে এসে উপস্থিত হতেই মুনির শিষ্যরা চিৎকার করে উঠলেন এবং ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ তাকে শরবিদ্ধ করলেন। শূকর সবেগে সহস্র যোজন অতিক্রম করে এক গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল। ঋতধ্বজও অশ্বারোহণে তাকে অনুসরণ করে গর্তের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন আলোক ও পাতাল। সেখানে ইন্দ্রপুরীর মতো শত শত স্বর্ণময় প্রাসাদ বেষ্টিত প্রাকার শোভিত পুর। এই পুরে প্রবেশ করেও তাকে দেখতে পেলেন না।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে এক ক্ষীণাঙ্গী ললনাকে দেখলেন। তাকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর না পেয়ে তিনি তাকেই অনুসরণ করে এক প্রাসাদে প্রবেশ করলেন! দেখলেন পর্যঙ্কে আসীন এক পরমাসুন্দরী কুমারীকে। তাঁকে পাতালের দেবতা বলে তাঁর মনে হল। ইনিও ঋতধ্বজকে দেখে মদন বলে মনে করলেন। লজ্জিত ও বিস্মিত হয়ে গাত্রোত্থান করে ভাবতে লাগলেন, ইনি দেবতা না যক্ষ, নাগ না গন্ধর্ব, বিদ্যাধর না মানুষ! একথা ভাবতে ভাবতেই তিনি মাটিতে বসে মূর্ছা গেলেন। ভয় নেই বলে ঋতধ্বজ তাঁকে আশ্বাস দিলেন এবং দেখলেন যে যাকে তিনি পূর্বে দেখেছিলেন সেই ললনা ব্যজন হাতে বাতাস করছে। মূর্ছা ভঙ্গ হলে ঋতধ্বজ এই সখীর মুখে শুনলেন যে তাঁকে দেখেই মূর্ছা হয়েছিল। এই সখীই বলল, ইনি দেবলোকের গন্ধর্ব রাজ বিশ্বাবসুর কন্যা, নাম মদালসা। বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু অন্য এক পাতালে আছে। সে মদালসাকে উদ্যানে একাকী পেয়ে মায়ার সাহায্যে হরণ করে এনেছে এবং আগামী ত্রয়োদশীতে বিবাহ করবে বলে স্থির করেছে। ইনি

আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে সুরভি নিষেধ করে বলেছেন, এই দুরাত্মা তোমাকে পাবে না। এই দানব মর্ত্যে গেলে যিনি তাকে শরবিদ্ধ করবেন, তিনি তোমার স্বামী হবেন। আমি এঁর সখী, আমার নাম কুণ্ডলা। আমি বিন্ধ্যাবানের কন্যা ও পুষ্করমালীর পত্নী। শুম্ভ আমার স্বামীকে সংহার করেছে। তারপর থেকে আমি পরলোকের জন্য ব্রত নিয়ে দিব্য গতিতে তীর্থে তীর্থে বিচরণ করি। পাতালকেতু বাণবিদ্ধ হয়েছে, এ খবর নিয়ে আমি এখানে এসেছি। ইনি যে আপনাকে দেখেই মূর্ছিত হয়েছেন তা বুঝতেই পারছেন। আপনি কে এবং কী জন্য এখানে এসেছেন বলুন।

কুবলয়াশ্ব নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর নই, আমি মানুষ। গালবের আশ্রমে এক শূকরকে বাণবিদ্ধ করে তাকেই অনুসরণ করে এখানে এসেছি। মদালসা হর্ষাবিষ্ট হলেন, কোন কথা বলতে না পেরে সখীর মুখের দিকে তাকালেন। কুণ্ডলাও সহর্ষে বললেন, গোজননী সুরভির কথা মিথ্যা হবার নয়। মদালসা যখন আপনাকে দেখেছে, তখন সে আর অন্য পুরুষে আসক্ত হবে না। অতএব আপনি আপনার কর্তব্য পালন করুন। রাজকুমার বললেন, কিন্তু আমি পরাধীন, পিতার আদেশ ছাড়া বিবাহ করতে পারি না। কুণ্ডলা বলল, এ কথা বলবেন না। ইনি দেবকন্যা, এঁকে বিবাহ করতে পারেন। রাজকুমার সম্মত হতেই কুণ্ডলা তাঁদের কুলগুরু তুম্বুরুকে স্মরণ করলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সমিধ কুশ নিয়ে উপনীত হলেন এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করে মদালসার উদ্দেশে মঙ্গলকৃত্য সমাধান করে তাদের যথাবিধি বিবাহ দিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

কুণ্ডলা মদালসাকে বলল, আমি কৃতার্থ হলাম। তুমি যেমন সুন্দরী, তেমনি সৎপাত্রের হাতে পড়লে। এবারে আমি নিশ্চিন্তে তীর্থ সলিলে তপশ্চরণ করতে পারব। তারপর রাজকুমারকে বলল, উপদেশ নয়, আমি শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে স্বামী সর্বদা সহধর্মিণীর

ভরণ ও রক্ষণ করবেন। স্ত্রী ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধনে স্বামীর সহায় হয়ে থাকে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর বশবর্তী থাকলেই এই ত্রিবর্গ সাধন হয়, একা তা কোন মতেই সম্ভব নয়। আপনারা ধনে পুত্রে সুখে ও পরমায়ুতে বর্ধিত হোন। বলে কুণ্ডলা মদালসাকে আলিঙ্গন ও রাজকুমারকে নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

ঋতধ্বজও মদালসাকে ঘোড়ায় তুলে পাতাল থেকে বেরোবার উপক্রম করতেই দৈত্যরা জানতে পেরে চিৎকার জুড়ে দিল, স্বর্গ থেকে পাতালকেতু যে কন্যা এনেছে, তাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই তারা পাতালকেতুর সঙ্গে সমবেত হয়ে রাজকুমারের প্রতি শর ও শূল বর্ষণ করতে লাগল। ঋতধ্বজ অবলীলাক্রমে সমস্ত অস্ত্র ছেদন করলেন এবং ত্বাষ্ট্র অস্ত্রে সমস্ত দানবদের সঙ্গে পাতালকেতুকে দগ্ধ করলেন। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে অশ্বারোহণে ফিরে এসে পিতাকে সব কথা খুলে বললেন। পিতা তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, ঋষিদের ভয় মোচন করে তুমি আমাদের বংশের খ্যাতি বৃদ্ধি করলে। এই গন্ধর্ব কন্যার সঙ্গে কোন কালেই যেন তোমার বিরহ যোগ না হয়।

পিতার কাছে বিদায় নিয়ে ঋতধ্বজ কখনও পিতার নগরে, কখনও উদ্যান, বন ও পর্বতে সস্ত্রীক বিহার করতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে রাজা পুত্রকে ডেকে বললেন, ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য তুমি পৃথিবী পর্যটন কর। অসুররা যাতে তাঁদের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য তুমি রোজ প্রাতে ঘোড়ায় চড়ে বার হও। পিতার আদেশ মতো রাজকুমার রোজ সকালে বেরিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতেন। তারপর পিতার পদবন্দনা করে মদালসার সঙ্গে বিহার করতেন। এইভাবে বিচরণ করবার সময় একদিন এক মুনিকে দেখলেন যমুনাতটে আশ্রম বন্ধন করেছেন। আসলে সে পাতালকেতুর অনুজ মায়াবী তালকেতু। পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে সে বলল, রাজকুমার, আমি ধর্মের জন্য যজ্ঞ করব,

কিন্তু আমার দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা নেই। সোনার জন্য তুমি তোমার কণ্ঠহার আমাকে দাও, আর এই আশ্রম রক্ষা কর। আমি জলে প্রবেশ করে প্রজার পুষ্টির জন্য বরুণের স্তব করে শীঘ্র ফিরে আসব। রাজকুমার তাকে গলার হার খুলে দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার কাজ সেরে আসুন। আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি আপনার আশ্রম রক্ষা করব।

এরপর তালকেতু জলে মগ্ন হল। তারপরেই জলাশয় থেকে উঠে মদালসা ও অন্যান্য সকলের কাছে গিয়ে বলল, বীর কুবলয়াশ্ব ব্রাহ্মণদের আশ্রম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিলেন, এমন সময় এক দুষ্ট দৈত্য মায়া বলে তার বক্ষে শূলের আঘাত করে তাকে সংহার করেছে। ম্রিয়মান অবস্থায় তিনি আমাকে এই কণ্ঠহার দিয়ে গিয়েছেন। শূদ্র তাপসরা বনের মধ্যে তাঁকে দহন করেছে। ঐ দৈত্য তাঁর ঘোড়াও নিয়ে গেছে। এই কণ্ঠহার তোমরা নাও। আমরা তপস্বী, সোনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এই বলে কণ্ঠহার মাটিতে রেখেই সে প্রস্থান করল।

এই সংবাদে রাজা রাণী ও পরিজনরা শোকার্ত ও মূর্ছিত হয়েছিলেন ; কিন্তু মদালসা তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে ও তাঁর কণ্ঠহার দেখে প্রাণ পরিহার করলেন। পুরবাসীদের গৃহ থেকেও রোদন ধ্বনি শোনা গেল। রাজা সুস্থ হয়ে সবাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন, যাঁরা স্ব কর্তব্য পালন করে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়। তারপর তিনি পুত্রবধূর সংস্কার বিধি পালনের পরে স্নান করে পুত্রের উদ্দেশে জল দান করলেন।

ওদিকে তালকেতু জল থেকে উঠে রাজপুত্রের কাছে এসে বলল, তুমি আমায় কৃতার্থ করলে। বহুদিন যাবৎ আমার বরুণের যজ্ঞ করবার ইচ্ছা ছিল, তোমার জন্যই আজ তা পারলাম। তুমি এবারে যেতে পার। রাজপুত্র তাকে প্রণাম করে ঘোড়ায় চড়ে গৃহে ফিরলেন। তিনি দেখলেন যে নগরী উদ্বেগে আচ্ছন্ন। পরক্ষণেই

দেখলেন যে বিস্ময়ে ও হর্ষে তাদের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলতে লাগল, আপনি চিরজীবী হোন। পিতা মাতা ও অন্যান্য বান্ধবরাও তাঁকে আলিঙ্গন করে চিরজীবী হও বলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। পিতাকে প্রণাম করে বিস্মিত রাজপুত্র বললেন, একি!

পিতা তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। মদালসার মৃত্যু সংবাদে তিনি শোক সাগরে নিমজ্জিত হলেন। মনে মনে নিজেকে নির্দয় ও অনার্য ভাবলেন এই জন্য যে তাঁর মৃত্যু সংবাদে মদালসা প্রাণ বিসর্জন করছেন, কিন্তু এই সংবাদ পেয়েও তিনি এখনও জীবিত আছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে এ জন্মে আর কোন নারীকে তিনি সহচারিণী করবেন না, কোন নারীকে পরিগ্রহ নয়, উপভোগও নয়।

এই পর্যন্ত বলে পুত্ররা তাদের পিতা নাগরাজকে বললেন, সেই থেকে তিনি আমাদের সঙ্গেই আমোদ প্রমোদে কালযাপন করছেন। মদালসাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই তাঁর উপকার হয়। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরও তা পারেন কিনা সন্দেহ।

এই কথা শুনে পিতা কিছুক্ষণ বিমর্ষ হয়ে রইলেন। তারপর বিশেষ বিবেচনা করে সহাস্যে বললেন, কোন কিছু অসাধ্য মনে করে উদ্যম ত্যাগ করলে অনিষ্ট হয়, তাই পুরুষকার পরিহার না করে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। একমাত্র দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ে কর্ম নির্ভর করে থাকে। তাই আমি এমন ভাবে তপস্যা করব যাতে অচিরে এই অসাধ্য সাধন হয়।

এই কথা বলে নাগরাজ হিমালয়ের প্লক্ষাবতরণ তীর্থে গিয়ে দুশ্চর তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও আহার সংযম করে তিনি তদ্‌গত হৃদয়ে দেবী সরস্বতীর স্তব করতে লাগলেন। সেই স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুর জিহ্বারূপিণী সরস্বতী নাগরাজ অশ্বতরকে বললেন, তোমাকে বর দেব, তোমার মনে যা আছে, তাই তোমাকে দেব। অশ্বতর বললেন, আমার ভাই কম্বল ও আমাকে সমস্ত স্বরগ্রাম দিন। সরস্বতী বললেন, তোমরা উভয়ে সপ্ত স্বর সপ্ত গ্রাম

সপ্ত বর্গ সপ্ত গীতি ও সপ্ত মূর্ছনা একোনপঞ্চাশৎ তাল ও তিন গ্রাম এই সমস্ত গান করতে পারবে। এ ছাড়াও চতুর্বিধ পদ ত্রিবিধ তাল ত্রিবিধ লয় ত্রিবিধ যতি ও চতুর্বিধ তোদ্যও তোমাদের দিলাম। এদের অন্তরিত বা আয়ত্ত স্বর ব্যঞ্জন সম্বন্ধও তোমরা অবগত হবে। আমি আর কাউকে এ সব দিই নি, পাতাল ও পৃথিবীতে তোমরাই এ সবের প্রণেতা হবে। বলে সরস্বতী অন্তর্হিত হলেন।

সরস্বতীর বরে নাগরাজ ও তাঁর ভাইয়ের পদ তাল ও স্বরাদি বিষয়ে অদ্বিতীয় জ্ঞান জন্মাল। তখন তাঁরা কৈলাস শিখরে আসীন শঙ্করের আরাধনার জন্য প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় ও রাত্রে তন্ত্রীলয় সহকারে সপ্ত স্বরে গান গাইতে লাগলেন। বহু কাল গান শোনার পর শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বর নাও। অশ্বতর তাঁকে প্রণাম করে বললেন, যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তো এই বর দিন যে কুবলয়াশ্বের পত্নী মদালসা যে বয়সে প্রাণত্যাগ করেছেন সেই বয়স নিয়ে আমার কন্যা হয়ে জন্ম নিন। তিনি যেন জাতিস্মরা হয়ে পূর্বের কান্তিতেই জন্মান। শিব বললেন, তাই হবে। শ্রাদ্ধের সময়ে তুমি নিজে মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করলে তোমার মধ্যম কর্ণ থেকে মদালসা সমুদ্ভূত হবে।

শিবকে প্রণাম করে দুই ভাই পাতালে ফিরে এলেন। তারপর শ্রাদ্ধ করে অশ্বতর মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করতেই তাঁর মধ্যম কর্ণ থেকে মদালসা সমুদ্ভূত হলেন। অশ্বতর এ কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে মদালসাকে তাঁর গৃহে গোপনে রাখলেন।

একদিন তিনি তাঁর দুই পুত্রকে বললেন, কেন তোমরা রাজপুত্রের কোন উপকার করবার জন্য তাঁকে আমার কাছে আনছ না? এই কথায় তাঁরা ঋতধ্বজের পুরে গিয়ে তাঁদের গৃহে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন, বললেন, আমাদের পিতা তোমাকে দেখতে চান। কুবলয়াশ্ব তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তিনি যখন দেখতে চেয়েছেন তখন আমি এখনই যাব। বলে তাঁদের সঙ্গে চললেন।

প্রথমে তাঁরা গোমতীর তীর ধরে চললেন। তারপর নাগপুত্রেরা আকর্ষণ করে কুবলয়াশ্বকে পাতালে নিয়ে এলেন এবং ছদ্মবেশ ত্যাগ করে নিজ বেশ ধারণ করলেন। তাঁদের ফণার মণিতে দেহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেখে রাজপুত্র বিস্ময়ে উৎফুল্ল হলেন। অতি মনোরম স্থান। সব বয়সের নাগ আছে, নাগকন্যারা ইতস্তত ক্রীড়া করছে। কোথাও গীতধ্বনি, সঙ্গে বেণু বীণা মৃদঙ্গাদি। শত শত মনোহর গৃহ দেখতে দেখতে নাগরাজের নিবাসে প্রবেশ করলেন। পরিচয় হতেই রাজকুমার নাগরাজকে প্রণাম করলেন এবং নাগরাজ তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি চিরজীবী হও। আমরা মিলিত হয়ে আহারাদি করে স্বল্পকাল অবস্থিতি করব। এই বলে অশ্বতর সবার সঙ্গে বসে সহর্ষে অন্ন ও মধু ভোগ করলেন। তারপর রাজপুত্রকে বললেন, তুমি আমার গৃহে অভ্যাগত হয়েছ, পুত্রের মতো শঙ্কা ত্যাগ করে কী চাও বল। কুবলয়াশ্ব বললেন, আমার তো অভাব নেই, আপনি আমাকে এই বর দিন যে আমার হৃদয় থেকে পুণ্যকর্ম সংস্কার যেন কখনও দূর না হয়। অশ্বতর বললেন, তাই হবে, তোমার মতি সর্বদাই ধর্ম আশ্রয় করে থাকবে। তবু বলছি, তুমি যখন আমার গৃহে এসেছ তখন মনুষ্যলোকে দুর্লভ এমন কিছু তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

এই কথায় রাজপুত্র নাগরাজের পুত্রদের দিকে তাকাতেই তাঁরা বললেন, ইনি মদালসাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। যদি তা করতে পারেন তবে এঁর প্রকৃত উপকার হয়। অশ্বতর বললেন, পঞ্চভূতের সঙ্গে একবার বিয়োগ হলে স্বপ্ন বা আসুরী মায়া ছাড়া তার সঙ্গে আর সংযোগ সম্ভব নয়। রাজপুত্র বললেন, আপনি যদি মায়া করেও একবার তাকে দেখাতে পারেন, তাহলে আপনি পরম অনুগ্রহ করেছেন ভাবব। অশ্বতর বললেন, যদি মায়া দর্শনে ইচ্ছা থাকে তবে দেখ। এই বলে মদালসাকে সেখানে আনালেন এবং সবাইকে ভোলাবার জন্য অস্ফুটে কিছু মন্ত্র বলে

প্রশ্ন করলেন, দেখ তো, ইনিই তোমার স্ত্রী মদালসা কিনা! রাজপুত্র লজ্জা ত্যাগ করে প্রিয়ে বলে এগোতেই অশ্বতর তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, বৎস, ইনি মায়া, এঁকে স্পর্শ করো না। স্পর্শ করবার চেষ্টা করলেই ইনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন। এই কথা শুনে কুবলয়াশ্ব হা প্রিয়ে বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তাই দেখে মদালসা ভাবলেন, আহা, আমার প্রতি রাজপুত্রের কী স্নেহ! তারপর রাজপুত্রকে আশ্বাস দিয়ে অশ্বতর কী ভাবে মদালসাকে পুনর্জীবিত করেছেন তা বললেন। কুবলয়াশ্ব স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে তাঁর অশ্বকে স্মরণ করতেই তা এসে উপস্থিত হল। তখন নাগরাজকে প্রণাম করে স্ত্রীকে নিয়ে অশ্বারোহণে নিজের পুরে ফিরে এলেন।

গৃহে ফিরে পিতাকে তিনি সব কথা বললেন। মদালসা সবাইকে যথা নিয়মে প্রণাম ও পূজা করলেন। পুরবাসী মহোৎসব করল। তাঁরা দুজনে নানা স্থানে বিহার করে বেড়াতে লাগলেন।

রাজা শত্রুজিতের মৃত্যুর পর পুরবাসী কুবলয়াশ্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। এই সময়ে মদালসার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। পিতা পুত্রের নাম রাখলেন বিক্রান্ত, মদালসা হাসলেন। ছেলে কাঁদলে মা সান্ত্বনার ছলে বলতে লাগলেন, তোমার কোন নাম নেই, তোমার দেহ পঞ্চভূতের। দেহ যেমন তোমার নয়, তুমিও তেমনি দেহের নও। তবে তুমি কাঁদছ কেন! এইভাবে মদালসা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পুত্রকে আত্মজ্ঞান দিলেন। বড় হয়ে এই পুত্র গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবৃত্তিহীন হলেন। এর পর দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে পিতা তার নাম রাখলেন সুবাহু এবং মদালসা এবারেও হাসলেন। মদালসা একেও আত্মজ্ঞান দিয়ে বড় করলেন। রাজা তাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম রাখলেন শত্রুমর্দন। এবারেও মদালসা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তাকেও আত্মজ্ঞান দিলে সেই পুত্রও কামনাহীন ও ক্রিয়াহীন হলেন। এর পর চতুর্থ

পুত্রের জন্মের পরে রাজা তার নামকরণ করবার আগে মদালসার দিকে তাকাতেই তিনি ঈষৎ হাসলেন। রাজা এতে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, আমি নামকরণ করলেই তুমি হাসো কেন বল তো! আমার দেওয়া নাম যদি তোমার ভাল মনে না হয় তো এবারে তুমি নিজে নাম রাখো। মদালসা বললেন, বেশ, এর নাম হোক অলর্ক বা ক্ষেপা কুকুর। এই নামের কোন অর্থ হয় না বলে রাজা হেসে বললেন, এ রকম অসম্বদ্ধ ও কুৎসিত নাম রাখলে কেন? মদালসা বললেন, লোকাচারে একটা নাম রাখতে হয় বলেই রাখলাম। আপনার দেওয়া নামেরই কি কোন অর্থ আছে! বলে সমস্ত নামের অসারত্ব বুঝিয়ে দিলেন। রাজা তাতে স্বীকার করলেন যে কোন নামেরই অর্থ নেই।

মদালসা এই পুত্রকেও আত্মজ্ঞান দিতে প্রবৃত্ত হলে রাজা বললেন, অন্য পুত্রদের আত্মবোধ শিখিয়ে অকল্যাণ করেছ, একে প্রবৃত্তি মার্গে নিয়োজিত কর। কর্ম মার্গের উচ্ছেদ হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, পিতৃপিণ্ডের লোপ হওয়াও উচিত নয়। স্বামীর কথায় মদালসা তাঁকে সেই উপদেশই দিলেন। তাঁর কুমারকাল উপস্থিত হলে তাঁরই প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজধর্মের কথা বললেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে স্বধর্মের অবিরোধে প্রজারঞ্জনই রাজার প্রথম কর্তব্য। স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ দণ্ড রাষ্ট্র ও পুর—এই কয়েকটি রাজার মূল বা প্রকৃতি এবং মৃগয়া দ্যূত দিবা স্বপ্ন পরনিন্দা বেশ্যাসঙ্গ নৃত্য-গীত ক্রীড়া বৃথা ভ্রমণ পান দৌরাত্ম্য ক্ষতি দ্বেষ ঈর্ষা প্রতারণা কটূক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণের নাম ব্যসন ও তা মূল বিনাশ করে বলে রাজা ব্যসন ত্যাগ করবেন। নিজেদের মন্ত্রণা যেন বাইরে না যায়, শত্রুর হাতে পৌঁছলে রাজার বিনাশ হতে পারে। বিপক্ষ উৎকোচ দিয়ে নিজের অমাত্যদের দূষিত করেছে কিনা রাজার তা জানা দরকার, তাই তিনি চর দিয়ে শত্রুর চরের গতিবিধিও অন্বেষণ করবেন। নিজের মিত্র আত্মীয় ও বন্ধু কাউকে বিশ্বাস করবেন না। দরকারে শত্রুকেও বিশ্বাস

করবেন। কামের বশীভূত না হয়ে স্থান বৃদ্ধি ও ক্ষয় অবগত ও সন্ধি বিগ্রহ যানাদি ছয় গুণে গুণী হবেন। প্রথমে আত্মাকে, মন্ত্রী ভৃত্য ও পৌরদের আয়ত্ত করে শত্রুর সঙ্গে বিরোধ করবেন। কাম ক্রোধ লোভ মদ মান ও হর্ষ—এরাও শত্রু এবং রাজাকে বিনাশ করতে পারে। কাকের মতো অনলস ও সাবধান হতে হয়, কোকিলের মতো নিজের গুণ প্রকাশ করতে হয় এবং মধুকরের মতো সংগ্রহশীল হতে হয়। মৃগের মতো সহজে শত্রুর আয়ত্ত হতে নেই এবং সাপ যেমন স্বল্প বিষেও বড় জীবকে বিনাশ করে তেমনি স্বল্প বল নিয়েই প্রবল রিপু দমন করতে হয়। রাজা ময়ূরের মতো নিজের সম্পত্তি বিস্তার করবেন, হংসের মতো গুণগ্রাহী হবেন, মোরগের মতো স্ত্রীদের সংকটে রক্ষা করবেন, লৌহের মতো কঠিন ও বহু কাজের সাধক হবেন। কীটের মতো শত্রুকে জর্জরিত করবেন, পিঁপড়ের মতো অনুসন্ধানী ও সঞ্চয়ী হবেন, স্ফুলিঙ্গ ও শাল্মলী বীজের মতো ব্যাপনশীল হবেন। চন্দ্র সূর্যের মতো রাজনীতি প্রয়োগে উদয়শীল হবেন। বন্ধকী স্ত্রী যেমন পরপুরুষের মনোরঞ্জন করে, রাজা তেমনি প্রজাদের মনোরঞ্জন করবেন। পদ্মের মতো মনোহারী হবেন, শরভের মতো বিক্রম প্রকাশ করবেন, শূলের মতো একবারেই বিনাশ করবেন, গর্ভবতীর মতো সঞ্চয়ী ও গোপাঙ্গনার মতো কল্পনাকুশল হবেন। পৃথিবী পালনের জন্য ইন্দ্র সূর্য চন্দ্র যম ও পবন এই পাঁচ দেবতার মতো ব্যবহার করতে হয়। ইন্দ্র যেমন চার মাস বারি বর্ষণ করেন, রাজাও তেমনি ধনাদি দান করবেন। সূর্য যেমন আট মাস জল আহরণ করেন, রাজাও তেমনি সূক্ষ্ম উপায়ে শুল্কাদি সংগ্রহ করবেন। যম যেমন শত্রু মিত্র সকলকেই সমান নিগ্রহ করেন, রাজাও তেমনি সর্বত্র সমদর্শী হবেন। চন্দ্রকে দেখে লোকে যেমন আনন্দ পায়, রাজাকে দেখেও প্রজারা তেমনি সুখী হবেন। পবন যেমন গোপনে সর্বত্র ব্যাপ্ত, রাজাও তেমনি চর দিয়ে সবার অনুসন্ধান করবেন।

রাজা সুবুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শে চলবেন এবং প্রজাদের স্বধর্মে স্থাপন করবেন।

রাজধর্ম শোনার পর অলর্ক জননীর নিকটে বর্ণ ধর্ম ও আশ্রম ধর্ম জানতে চাইলেন। মদালসা বললেন, দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিনটিই ব্রাহ্মণের ধর্ম। জীবিকার জন্য ব্যবসা ছাড়া আর কোন চতুর্থ ধর্ম নেই। যাজন অধ্যাপন ও পরিগ্রহ এই তিনটিই তার জীবিকার জন্য ব্যবসায়। এগুলি ক্ষত্রিয়রও ধর্ম এবং অস্ত্র পরিচালনা ও পৃথিবী রক্ষা তার জীবিকা। বৈশ্যেরও ধর্ম একই, কিন্তু তার জীবিকা কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন। শূদ্রের ধর্ম যজ্ঞ দান ও অন্য তিন বর্ণের শুশ্রূষা এবং জীবিকার জন্য দ্বিজাতির পরিচর্যা কারুকার্য পশুপালন ও ক্রয় বিক্রয় করবে।

এইবারে আশ্রম ধর্মের কথা। উপনয়ন না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছানুসারে ব্যবহার ও আহার করা যায়। উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুগৃহে ভিক্ষার্থে পর্যটন বেদাধ্যয়ন গুরুর সেবা ও তাঁর কাজ করতে হয়। তারপর তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। সে ইচ্ছা না থাকলে গুরুগৃহেই ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা যায় বা বাণপ্রস্থে যাওয়া যায়। গৃহস্থাশ্রমে বিবাহ করে ধন উপার্জন ও আশ্রিত পালন করতে হয়। তারপর দেহের অবনতি দেখে আত্মার শুদ্ধির জন্য বাণপ্রস্থাশ্রমে যেতে হয়। সেখানে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বনের ফল খেয়ে জটা বল্কল ধারণ করে তপস্যা করতে হয়। এর পরে ভিক্ষু নামের চরম আশ্রম। এঁতে সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভিক্ষালব্ধ অন্ন একবার আহার করে আত্ম দর্শনের চেষ্টা করতে হয়। এক আবাসে চিরকাল বাস করাও চলে না।

অলর্ক বললেন, গৃহস্থাশ্রমীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলুন। এই প্রশ্নের উত্তরে মদালসা বললেন, গৃহস্থ বেদময়ী ধেনুরূপে সকলের আধার স্বরূপ। ঐ ধেনুতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ ধেনুই বিশ্বের কারণ। স্নান করে শুচি হয়ে পিতৃগণ দেবগণ ও ঋষিগণের তর্পণ

করবে। পরে সকলকে যথা নিয়মে বলি প্রদান করবে। তারপর একজন অতিথি সৎকার করবে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে এবং পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষা দেবে। অসমর্থ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হয়ে এলে তাঁকে ভোজন করাবে এবং সঙ্গতি থাকলে সমর্থ ব্যক্তিকেও ভোজন করাবে। সন্ধ্যাবেলাতেও এই নিয়ম অনুসরণ করবে।

এই বিধির নাম নিত্য। পুত্রজন্মক্রিয়াদির নাম নৈমিত্তিক এবং পর্বশ্রাদ্ধাদিকে নিত্যনৈমিত্তিক বলে। জন্ম সময়ে যেমন জাতকর্ম, তেমনি বিবাহাদিতে নান্দীমুখ। মৃত দিবসে একোদ্দিষ্ট নামে ঔর্ধ্বদেহিক নৈমিত্তিক সম্পাদন করতে হয়। প্রতি মাসে এই কাজ করবার পর বৎসর পূর্ণ হলে সপিণ্ডীকরণ করতে হয়। এরপর মদালসা পার্বণ শ্রাদ্ধকল্প, তিথিকল্প ও কাম্য শ্রাদ্ধের ফলের কথা বললেন।

অলর্ক বললেন, এবারে আপনি সদাচারের কথা বলুন। মদালসা বললেন, আচার পালন গৃহস্থের নিত্য কর্তব্য। তাকে ত্রিবর্গ সাধনে যত্ন করতে হয়। তার উপার্জনের চতুর্থাংশ পরলোক সাধন ধর্মের জন্য সঞ্চয় করে অর্ধাংশেই আত্মপোষণ ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে চালাতে হয়। অবশিষ্ট এক অংশ মূল ধন রূপে বর্ধিত করতে হয়। ধর্ম সঞ্চয় করতে হয় পাপ পরিহারের জন্য। নিষ্কাম ও কাম্য—ধর্ম এই দ্বিবিধ। পরলোকে নিষ্কাম ধর্ম ও ইহলোকে কাম্য ধর্ম ফল দেয় এবং এই দুই ধর্মের অনুষ্ঠান অবিরোধে করতে হয়। কামও দ্বিবিধ—ধর্মানুবন্ধ ও অর্থানুবন্ধ। সৎ কুলের সর্বাঙ্গ সুন্দর কন্যা বিবাহ করতে হয়। পিতা মাতার পঞ্চমী বা সপ্তমী কন্যাই ভাল। চার রাত্রি রজস্বলা স্ত্রী সহবাস বর্জনীয়। যুগ্ম রাত্রে পুত্র ও অযুগ্ম রাত্রে স্ত্রী সহবাসে কন্যা সন্তান জন্মে। পূর্বাহ্নে স্ত্রীসঙ্গে বিধর্মী পুত্রের জন্ম হয় এবং সন্ধ্যায় হয় নপুংসক।

গৃহস্থের করণীয় ও অকরণীয় কার্যের কথা শেষ করে মদালসা বর্জনীয় ও অবর্জনীয় দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করলেন।

যৌবনে পদার্পণ করে অলর্ক দার পরিগ্রহ করলেন। তাঁর পুত্র হল। চরম বয়সে উপনীত হয়ে কুবলয়াশ্ব বনে যাবেন বলে অলর্ককে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। মদালসা শেষ কথা বললেন, বৎস, গৃহীরা স্বভাবত মমতাপরায়ণ বলে দুঃখ পেয়ে থাকে। প্রিয় বন্ধুর বিরহে বা শত্রুর ব্যাঘাতে কিংবা বিত্তনাশের জন্য অসহ্য দুঃখ হলে এই অঙ্গুরীয় থেকে সুক্ষ্মাক্ষরে লেখা পত্রে আমার শাসন বার করে পাঠ করবে। বলে তিনি একটি মণিময় অঙ্গুরীয় অলর্কের হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর কুবলয়াশ্ব ও মদালসা তপশ্চরণের জন্য বনে চলে গেলেন।

অলর্কের উপাখ্যান

অলর্ক ন্যায় মার্গের অনুসারী হয়ে প্রজা পালন করতে লাগলেন। তাঁর বহু বর্ষ এক দিনের মতো অতিবাহিত হল। বিবিধ বিষয় ভোগ করেও তাঁর বৈরাগ্য উপস্থিত হল না। সুবাহু নামে তাঁর যে ভাই বনবাসী হয়েছিলেন, তিনি শুনলেন যে অলর্ক সুখ সম্ভোগে মত্ত ও ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র হয়ে পড়েছেন। কী ভাবে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করা যায়, এই কথা ভেবে তিনি বিপক্ষের আশ্রয় নেওয়া শ্রেয় মনে করলেন। নিজেই রাজ্য লাভের জন্য কাশীরাজের শরণাপন্ন হলেন। কাশীরাজ সেনা উদ্যোগ করে সুবাহুকে রাজ্য দেবার প্রস্তাব করে দূত পাঠালেন। অলর্ক এতে সম্মত না হয়ে দূতকে বললেন, আমার অগ্রজ আমার কাছে এসে রাজ্য চাইতে পারেন, কিন্তু আক্রমণের ভয়ে আমি তাঁকে রাজ্য ছেড়ে দেব না। কিন্তু যাচ্ঞা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয় বলে সুবাহু এসে রাজ্য চাইলেন না। কাশীরাজ সসৈন্যে এসে অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করলেন। প্রথমে সামন্তদের নিপীড়িত ও দুর্গপালকে বশীভূত করে কাউকে ধন দান করে কাউকে ভেদ আবার কাউকে সাম দিয়ে আয়ত্ত করলেন। এইভাবে অলর্ক দুর্বল ও ক্ষীণকোষ হয়ে পড়লেন

এবং তাঁর পুর শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হল। তিনি যখন অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তখনই তাঁর জননী মদালসার অঙ্গুরীয়র কথা মনে পড়ে গেল। তিনি স্নান করে শুচি হয়ে অঙ্গুরীয় থেকে তাঁর শাসন বার করে পড়েই পুলকিত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাতে লেখা ছিল, সর্বান্তঃকরণে সঙ্গত্যাগ করবে, তা না পারলে সাধু সঙ্গ করবে। সাধু সঙ্গই মহৌষধ। পুনশ্চঃ সর্বান্তঃকরণে কামও ত্যাগ করবে, তা না পারলে মোক্ষ কামনার প্রতি তা করবে। সেইটেই তার ঔষধ। এর পরই তিনি সঙ্গহীন দত্তাত্রেয়র নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, দুঃখে একান্ত অভিভূত হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমার দুঃখ অপহরণ করুন।

দত্তাত্রেয় বললেন, কী জন্য তোমার দুঃখ তাই আগে বল।

রাজা ত্রিবিধ দুঃখের স্থান ও আত্মার বিষয়ে চিন্তা করলেন, পঞ্চভূতে তৈরি এই শরীরে আমি সুখ চাই, কিন্তু আমি তো শরীর নই। সুখ ও দুঃখ একমাত্র মনেরই ধর্ম। কিন্তু আমি যখন মন নই, তখন আমার সুখও নেই, দুঃখও নেই। এখন আমার দেহের অগ্রজ রাজ্য চাইছেন, তিনিও তো শরীর থেকে ভিন্ন। আকাশ এক হলেও ঘট কুম্ভ ও কমণ্ডলু যেমন পাত্রভেদে বহু বলে বোধ হয়, তেমনি আত্মা এক হলেও সুবাহু কাশীরাজ ও আমি শরীর ভেদে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে। এই সম্যক্ দৃষ্টির উদয় হতেই অলর্ক বললেন, আমার আর কোন দুঃখ নেই। অসমদর্শীরাই সর্বদা অসুখ সাগরে মগ্ন থাকে এবং মানুষ কোন বিষয়ে আসক্ত হলেই দুঃখ পায়। প্রকৃতির অতীত বলেই আমি সুখীও নই, দুঃখীও নই।

দত্তাত্রেয় বললেন, আমার প্রশ্নেই তোমার এই জ্ঞান জন্মেছে। সত্যই দুঃখের মূল হল মমতা, সুখের জন্য মমতা শূন্য হতে হবে। হৃদয়ের অজ্ঞানতা যেন একটি বিরাট বৃক্ষ। অহঙ্কারের অঙ্কুর থেকে তার জন্ম। এই বৃক্ষ বর্ধিত হয়ে মুক্তি মার্গ রোধ করে। যারা বিদ্যাং কুঠার সাধু সঙ্গের পাষাণে শাণিত করে মমতার এই বৃক্ষ

ছেদন করতে পারে, তারাই ব্রহ্মের অরণ্যে পৌঁছতে পারে। সেখানেই পরম প্রজ্ঞা ও নিবৃত্তি লাভ।

অলর্ক বললেন, প্রকৃতির বন্ধন থেকে আমি কী ভাবে মুক্ত হব, কী করলে পুনর্জন্ম হবে না, কী অনুষ্ঠান করে ব্রহ্মে মিলিত হওয়া যায়, এই যোগ আমাকে উপদেশ দিন।

দত্তাত্রেয় বললেন, যোগ মার্গে প্রবৃত্ত হয়ে জ্ঞানলাভ করে অজ্ঞানের সঙ্গে যে বিয়োগ ঘটে, তারই নাম মুক্তি এবং প্রাকৃতিক গুণের সঙ্গে কোন রকম ঐক্য স্থাপন না করাকেই ব্রহ্মের সঙ্গে একতা বলা হয়। যোগ থেকে মুক্তি লাভ হয়, সম্যক্ জ্ঞান থেকে যোগের সমুদ্ভাবনা, দুঃখ থেকে সম্যক্ জ্ঞানের আবির্ভাব এবং চিত্ত মমতায় আসক্ত হলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। মুক্তির কামনায় প্রথমে বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, তাতে অহং জ্ঞানও দূর হয়। মমতাহীন হলেই সুখ আসে এবং বৈরাগ্যের উদয় হলেই সংসারের অসারতা ও ক্ষণ ভঙ্গুরতা প্রভৃতি দোষ বোঝা যায়। জ্ঞান থেকেই বৈরাগ্যের জন্ম, আবার জ্ঞান বৈরাগ্যমূলকও বটে। যা দিয়ে মুক্তি লাভ হয়, তারই নাম জ্ঞান। পাপপুণ্যের উপভোগ হলে, নিত্য কর্তব্যের নিষ্কাম অনুষ্ঠান করলে এবং পূর্বার্জিত কর্মের ক্ষয় ও নূতন কর্মের সঞ্চয় করলে বারংবার শরীরের বন্ধন হয় না। এরই নাম যোগ। যোগী ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু আশ্রয় করেন না।

প্রথমেই আত্মা দিয়ে আত্মাকে জয় করতে হয়। প্রাণায়াম দিয়ে সকল দোষ, ধারণা দিয়ে পাপ, প্রত্যাহার দিয়ে বিষয় ও ধ্যান দিয়ে সকল অনীশ্বর গুণ দগ্ধ করতে হয়। যা দিয়ে পঞ্চ প্রাণ আয়ত্ত বা সংযত হয়, তার নাম প্রাণায়াম। যা দিয়ে মনকে ধারণ বা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মদর্শন করা যায়, তার নাম ধারণা। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়দের স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করা হয়, তার নাম প্রত্যাহার। দশবিধ ধারণা প্রাপ্ত হলে ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ হয়।

তারপর আর জরা মৃত্যু নেই, যোগী তুরীয় পদে অবস্থিতি করেন। এরই নাম যোগভূমি।

যোগীর নানাবিধ উপসর্গ আসে, বিষয় ভোগের জন্য মন বিক্ষিপ্ত হয়। যে যোগী মনকে নিবৃত্ত করে ব্রহ্ম সঙ্গী করতে পারেন, তাঁর উপসর্গগুলি পরাহত হয়। সমস্ত দোষ দগ্ধ হবার পর ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হলে যোগীকে আর কখনও পৃথকভাব ভোগ করতে হয় না। জলে জল পড়লে যেমন একাকার হয়ে যায়, তেমনি যোগীর আত্মা পরমাত্মায় সাম্য লাভ করে।

অলর্ক বললেন, যোগীরা কী রূপ আচার পদ্ধতির অনুসরণ করবেন?

দত্তাত্রেয় বললেন, মান ও অপমান এ দুটি মানুষের প্রাপ্তি ও উদ্বেগের কারণ। কিন্তু যোগীদের বেলায় এর বিপরীত অর্থ হলেই সিদ্ধি সাধন হয়। অর্থাৎ যোগীদের নিকট মান বিষ ও অপমানই অমৃত। এই ভাবে কাজ করলেই যোগী সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন।

পরমাত্মাকে দর্শন করে তাঁর প্রাপ্তির জন্য একাক্ষর মন্ত্র 'ওঁ' জপ করতে হয়। অ উ ও ম এই অক্ষরত্রয় ওঙ্কারের স্বরূপ এবং এরাই তিন মাত্রা। এ ছাড়াও অর্ধমাত্রা আছে। অ উ ও ম অক্ষরে সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ, ঋক্ সাম যজুঃ এই তিন বেদ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতা বোঝায়। পরমার্থতঃ ওঙ্কারের অর্ধমাত্রা। যে যোগী এতে সংসক্ত হন, তিনি এতেই লয় হন। প্রথম মাত্রা ব্যক্ত, দ্বিতীয় অব্যক্ত, তৃতীয় চিৎ শক্তি ও অর্ধ মাত্রায় পরমপদ বা ব্রহ্মপদ বোঝায়। এই ভাবে যিনি ওঙ্কার নামের অক্ষর স্বরূপ পরব্রহ্মকে অবগত হয়ে ধ্যানে মগ্ন হন, তিনি সংসার চক্র অতিক্রম ও ত্রিবিধ বন্ধন পরিহার করে পরব্রহ্মেই লয় পান। কর্ম-বন্ধন ক্ষয় না হলে তিনি অরিষ্ট দ্বারা মৃত্যু অবগত ও মৃত্যুর পরে জাতিস্মর হয়ে পুনরায় যোগী হন।

কতগুলি অরিষ্ট দেখে যোগী নিজের মৃত্যু অবগত হবেন। ধ্রুব

শুক্র চন্দ্র অরুন্ধতী ও নিজের ছায়া দেখতে না পেলে বুঝতে হবে যে এক বৎসর পরে মৃত্যু হবে। সূর্য বিম্বকে রশ্মিহীন ও অগ্নিকে সূর্য মনে হলে বুঝতে হবে যে এগারো মাসের বেশি বাঁচবে না। স্বপ্নে মল মূত্র ও বমিকে সোনা রূপো মনে হলে দশ মাস বাঁচবে। গন্ধর্ব নগর স্বুবর্ণ রঙের বৃক্ষ বা প্রেত পিশাচ দেখলে নয় মাস বাঁচে। যে অকস্মাৎ স্থূল থেকে কৃশ বা কৃশ থেকে স্থূল হয়, তার আয়ু আট মাস। কাদায় পদক্ষেপ করলে যার পায়ের সামনের চিহ্ন খণ্ড আকারে পড়ে, সে আর সাত মাস বাঁচবে। যার মাথায় কাক কপোত শকুন প্রভৃতি কোন মাংসাশী পক্ষী উড়ে এসে বসে, সে ছয় মাস বাঁচতে পারে। কাক পংক্তিতে বা ধূলি বৃষ্টিতে আহত হলে অথবা নিজের ছায়া বিপরীত দেখলে চার মাস বেঁচে থাকা যায়। যদি কেউ বিনা মেঘে দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ দেখে বা রাতে ইন্দ্রধনু দেখতে পায়, তবে সে দু তিন মাস বেঁচে থাকতে পারে। যদি কেউ ঘি তেল জল বা আয়নায় নিজের মুখ দেখতে না পায় বা যদি মস্তকহীন দেখে তাহলে সে আর এক মাসের বেশি বাঁচে না। কারও দেহে যদি শবের গন্ধ বার হয়, তাহলে সেই যোগী আর পনের দিন বাঁচবেন। স্নান করা মাত্র যার পা ও বুক শুকিয়ে যায় এবং জল পান করলেও গলা শুকিয়ে যায়, তাহলে সে আর দশ দিন বাঁচে। জল স্পর্শ করলেও যার রোমাঞ্চ না হয়, তার মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে জানবে। সূর্যোদয়ের সময়ে শৃগাল যদি সামনে বা পিছন দিয়ে অথবা চারি দিক দিয়ে যায়, তাহলে সদ্য মৃত্যু হয়। খেয়ে উঠেই যদি ক্ষুধা বোধ হয় তো আয়ু শেষ হয়েছে বুঝতে হবে। যে প্রদীপের গন্ধ পায় না, দিন রাতে ভীত হয়ে থাকে বা অপরের নেত্রে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায় না, সেও আর বাঁচে না। মাঝরাতে ইন্দ্রধনু ও দিনের বেলায় গ্রহ দেখলে আয়ুর ক্ষয় হয়েছে বুঝতে হবে। আয়ু শেষ হলে নাক বেঁকে যায়, কান নতোন্নত হয় ও বাঁ চোখে জল পড়ে। আসন্ন মৃত্যুতে মুখ রক্তবর্ণ ও জিহ্বা

শ্যামবর্ণ হয়। স্বপ্নেও নানাবিধ অরিষ্ট দর্শন হয়। যোগীরা এই সবের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

তারপর যে উপায়ে অলর্ক ব্রহ্মলাভ করবেন, দত্তাত্রেয় সংক্ষেপে সেই কথা বললেন। অলর্ক তাঁকে প্রণাম করে বিদায় চাইলেন এবং দত্তাত্রেয় তাঁকে ফিরে যেতে বললেন।

অলর্ক নিজের অগ্রজ সুবাহু ও কাশীরাজের নিকটে এসে সহাস্যে বললেন, কাশীরাজ, তোমার এই রাজ্যে লোভ হয়েছে। অতএব নিজে ভোগ কর বা সুবাহুকে দাও। কাশীরাজ বললেন, যুদ্ধ না করেই তুমি রাজ্য ত্যাগ করবে? অলর্ক বললেন, সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে পরব্রহ্মকে জয় করলেই সমস্ত জয় করা হয়। সুবাহু তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে উঠে ভাইকে অভিনন্দন করে কাশীরাজকে বললেন, আমি যে জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলাম, তা আমি পেয়েছি। এবারে আমি যেতে চাই। কাশীরাজ বললেন, আপনি তো আপনার রাজ্য জয় করে দেবার জন্যই আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, এবারে রাজ্য ভোগ করুন। সুবাহু বললেন, আমার এই ভাই তত্ত্ববিদ হয়েও ভোগে আসক্ত হয়েছিল। আমাদের জননী তিন ভাইকে যেমন তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছিলেন, একে তেমন দেন নি। তাই এ গার্হস্থ্য মোহে আচ্ছন্ন হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে দুঃখেই এর বৈরাগ্য ভাবনা উপস্থিত হবে। আমি আজ কৃতকার্য হয়েছি। আমি চললাম। আপনার মঙ্গল হোক। কাশীরাজ বললেন, আমার উপকারের জন্য কেন মনোযোগ করছেন না? সুবাহু বললেন, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই হল পুরুষার্থ চতুষ্টয়। আপনার ধর্ম অর্থ ও কাম সিদ্ধ হয়েছে, অভাব আছে মোক্ষের। মমতা ও অহংকারের বশীভূত না হয়ে এখন মুক্তির জন্য যত্ন করুন।

কাশীরাজকে এই কথা বলে সুবাহু প্রস্থান করলেন। কাশীরাজও নিজ পুরে ফিরে গেলেন। অলর্ক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজপদে

অভিষিক্ত করে সমস্ত সঙ্গী বিহীন হয়ে আত্মসিদ্ধির জন্য অরণ্যে গেলেন।

পুত্র পিতাকে বললেন, মুক্তির জন্য আপনিও যোগের অনুসারী হোন।

পক্ষীরা বলল, সেই জড় পুত্র পিতাকে এই বলে তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। তাঁর পিতাও বাণপ্রস্থে প্রবেশ করলেন।

ব্রহ্মার উৎপত্তি ও তাঁর আয়ুর পরিমাণ

জৈমিনি বললেন, এই জগৎ কী ভাবে সমুদ্ভূত হল, কী ভাবে প্রলয় কালে পুনরায় লয় হয়, কী ভাবে দেবতা ঋষি ও প্রাণীর জন্ম হয়, কী ভাবে মন্বন্তর হয়—এই সব আমাকে বলুন। এ ছাড়াও যাবতীয় সৃষ্টি ও প্রলয়, বংশ বৃত্তান্ত, কল্পবিভাগ ও মন্বন্তর, পৃথিবীর সংস্থিতি ও পরিমাণ, সমুদ্র পর্বত অরণ্য ও নদীর কথা, স্বর্গ ও পাতালের বিবরণ, সূর্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রের গতি এ সবও আমার শোনবার ইচ্ছা।

পক্ষীরা বলল, দ্বিজ পুত্র ক্রোষ্টুকিকে মার্কণ্ডেয় যা বলেছিলেন, আমরা আপনাকে তাই বলব। মার্কণ্ডেয় পিতামহকে প্রণিপাত করে বলতে লাগলেন, পুরাকালে অব্যক্ত যোনি ব্রহ্মা উৎপন্ন হতেই তাঁর চতুর্মুখ থেকে বেদ ও পুরাণ বিনিঃসৃত হয়। ঋষিরা সেই পুরাণ সংহিতাকে বহু অংশে বিভক্ত ও বেদেরও অনেক বিভাগ করেন। তাঁর উপদেশ ছাড়া ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঈশ্বর ভাব সিদ্ধ হয় না। সপ্তর্ষিরা তাঁর মন থেকে উদ্ভূত হয়ে বেদ গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য আদি ঋষিরাও তাঁর মন থেকে সম্ভূত হয়ে পুরাণ গ্রহণ করলেন। চ্যবন ভৃগুর নিকটে পুরাণ গ্রহণ করে ঋষিদের বললেন, ঋষিরা বললেন দক্ষকে এবং দক্ষ আমাকে বলেছেন। দক্ষের নিকটে আমি যা শুনেছি, তাই তোমাকে বলব।

যা অব্যক্ত এবং ঋষিরা যাকে প্রকৃতি বলে থাকেন, যা ক্ষয় বা

জীর্ণ হয় না, রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শহীন, যার আদি অন্ত নেই, যেখান থেকে জগতের উদ্ভব হয়েছে, যা চিরকাল আছে এবং যার বিনাশ নেই, যার স্বরূপ জানা যায় না, সেই ব্রহ্ম সবার আগে বিরাজমান থাকেন। প্রলয়ের আগে সমগ্র জগৎ ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত করেই তিনি বিরাজ করেন। সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ তাঁর মধ্যে পরস্পরের অনুকূলে ও অব্যাঘাতে অধিষ্ঠিত আছে। সৃষ্টির সময়ে তিনি এই গুণের সাহায্যে সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলে প্রধান তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়ে মহত্তত্ত্বকে আবৃত করে। এই মহত্তত্ত্ব তিন গুণের ভেদে তিন প্রকার। এর থেকে ত্রিবিধ অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়। এই অহঙ্কারও মহত্তত্ত্বে আবৃত ও তার প্রভাবে বিকৃত হয়ে শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি করে। তা থেকেই শব্দ লক্ষণ আকাশের জন্ম। অহঙ্কার শব্দ-মাত্র আকাশকে আবৃত করে এবং তাতেই স্পর্শতন্মাত্রের জন্ম। এতে বলবান বায়ু প্রাদুর্ভূত হয়। স্পর্শই বায়ুর গুণ। শব্দমাত্র আকাশ যখন স্পর্শমাত্রকে আবৃত করে, তখন বায়ু বিকৃত হয়ে রূপমাত্রের সৃষ্টি করে। বায়ু থেকে জ্যোতির উদ্ভব, রূপ ঐ জ্যোতির গুণ। স্পর্শমাত্র বায়ু যখন রূপমাত্রকে আবৃত করে, তখন জ্যোতি বিকৃত হয়ে রস-মাত্রের সৃষ্টি করে। তাতেই রসাত্মক জলের উদ্ভব। সেই রসাত্মক জল যখন রূপমাত্রকে আবৃত করে তখন জল বিকৃত হয়ে গন্ধমাত্রের সৃষ্টি করে। তাতেই পৃথিবীর জন্ম। গন্ধ তার গুণ। এদের কোন বিশেষ নির্বাচন করা যায় না বলে অবিশেষ বলে। এর জন্য তারা শান্তও নয়, ঘোরও নয়, মূঢ়ও নয়। তামস অহঙ্কার থেকে ভূত তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে বৈকারিক সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ বৈকারিক দেবতা বলে পরিগণিত। কর্ণ ত্বক চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাদ পায়ু উপস্থ হস্ত ও বাক কর্মেন্দ্রিয়।

শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রে আবিষ্ট হলে ত্রিগুণ বায়ুর উদ্ভব হয়। স্পর্শ এর গুণ। শব্দ ও স্পর্শ এ দুটি গুণরূপে আবিষ্ট হয়। তারপর

গুণত্রয় যুক্ত অগ্নির উদ্ভব হয়[1]। এতেই শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণের আবেশ হয়ে থাকে। পরে শব্দ স্পর্শ ও রূপ রসমাত্রে আবিষ্ট হলে জলের উদ্ভব হয়। তারপরে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস গন্ধমাত্রে আবিষ্ট হবে পৃথিবীকে আবৃত করে। তাতেই পঞ্চগুণ বিশিষ্ট স্থূলাকৃতি ভূমি ভূতগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এরা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পরস্পরকে ধারণ করে। এরা যখন পরস্পরকে আশ্রয় করে সংযুক্ত হয়ে এক হয় এবং যখন পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রকৃতির অনুগ্রহ পায়, তখন মহৎ থেকে বিশেষ পর্যন্ত ঐ পদার্থ অণ্ড উৎপাদন করে এবং ঐ অণ্ড জল আশ্রয় করে বুদ্বুদের মতো বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্ম নামের ক্ষেত্রজ্ঞও সেই প্রাকৃত অণ্ডে বর্ধিত হন। তিনিই প্রথম শরীরী এবং তিনিই পুরুষ বলে অভিহিত, তিনিই ভূতের আদি কর্তা ব্রহ্মা সবার আগে বিরাজমান হন। তাতেই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সমুদ্র সেই বিরাট অণ্ডের গর্ভসলিল। দেবাসুর ও মানুষের জগৎ সেই অণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্যোতিষ্ক সমেত সমুদয় লোক তাতে অবস্থিত। প্রকৃতি এই মহানের সঙ্গে তাকে আবৃত করে বিরাজ করছে। প্রকৃতি নিত্য স্বরূপা, ব্রহ্মা নামের পুরুষ এই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত হয়ে আছেন। ব্রহ্মা প্রকৃতির বিভু। প্রকৃতিকে ক্ষেত্র ও ব্রহ্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, এবারে বলুন প্রলয়ান্তে কী রূপে পুনরায় ভূতের উৎপত্তি হয়েছিল।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এই বিশ্ব জগৎ যখন প্রকৃতিতে লয় হয়, তাকে প্রাকৃত প্রলয় বলে। প্রকৃতি আত্মায় অবস্থিতি করলেই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ লয় হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ যখন সাধর্মে অবস্থিতি করেন, তখন উভয়ের মধ্যে কারও কোনরূপ বৃদ্ধি বা ন্যূনতা থাকে না। ব্রহ্মার আয়ুর পরিমাণ দুই পরার্ধ কাল। তাঁর আদি নেই, তিনিই সকলের উৎপত্তির স্থান, কিন্তু তাঁর স্বরূপ চিন্তা করে নির্ণয় করা যায় না। তিনি ক্রিয়ার অতীত। দিনমুখে জাগ্রত হয়ে তিনি প্রকৃতি ও পুরুষে

অনুপ্রবেশ করে পরম যোগের দ্বারা তাঁদের ক্ষোভিত করেন। প্রকৃতি ক্ষোভিত হলে ব্রহ্মা অণ্ডকোষ আশ্রয় করে উৎপন্ন হন। প্রথমে তিনি ক্ষুভিত করেন, পরে প্রকৃতির পতি হয়ে নিজেই ক্ষুভিত হয়ে থাকেন। এই ভাবে সঙ্কোচ ও বিকাশ এই দুই গুণের সাহায্যে তিনি প্রকৃতি রূপে বিরাজ করেন। ব্রহ্মারূপে প্রজা সৃষ্টি করে বিষ্ণু-রূপে পালন করেন এবং রুদ্র মূর্তি ধারণ করে জগৎ সংহার করে আবার শয়ন করে থাকেন।

ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিমাণ ব্রাহ্ম্যমাণের একশো বছর। পনের নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত হয়। এই রকম ত্রিশ মুহূর্তে মানুষের এক অহোরাত্র। ত্রিশ অহো-রাত্র বা দুই পক্ষে এক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর। কিন্তু মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র। উত্তরায়ণে তাঁদের দিন। দেবতাদের বার হাজার বছরে চার যুগ হয়। তার মধ্যে চার হাজার বছরে সত্য যুগ, তিন হাজার বছরে ত্রেতা, দুই হাজার বছরে দ্বাপর ও কলিযুগ এক হাজার বছরে। বাকি দু হাজার বছর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ। তার উভয়েরই পরিমাণ সত্য যুগে চারশো, ত্রেতায় তিনশো, দ্বাপরে দুশো ও কলিতে একশো বছর। একে সহস্র গুণ করলে ব্রহ্মার এক দিন। এই এক দিনে চতুর্দশ মনু বিভাগ ক্রমে প্রাদুর্ভূত হন। দেবতা ও ঋষিরাও মনুর সঙ্গে সৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গেই সংহার লাভ করেন। এক সপ্ততিরও অধিক চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। এই মন্বন্তর মানুষের হিসাবে ছত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ কুড়ি হাজার বছর। দেবতাদের হিসাবে এই মন্বন্তর আট লক্ষ বাহান্ন হাজার বছরে। এর চোদ্দ গুণে ব্রহ্মার এক দিন। এই কালের অবসানে যে প্রলয়, তার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক বিনাশশীল বলে বিনষ্ট হয়; কেবল মহর্লোক অবশিষ্ট থাকে। সেখানকার নিবাসীরাও প্রলয়ের তাপের জন্য জনলোকে যান। ত্রিভুবন একার্ণব হয়। রাত্রিতে ব্রহ্মা শয়ন করেন। দিনের সমান

তাঁর রাত্রি। রাত্রি ক্রিয়ার অবসানে আবার সৃষ্টি ক্রিয়ার আরম্ভ। এই ভাবে ব্রহ্মার এক বৎসরকে শত গুণ করে পুনরায় শত গুণ করলে এক পর হয়। এই রকম পঞ্চাশ বৎসর অর্থাৎ এক পরার্ধ অতীত হয়েছে। তার অবসানে পাদ্ম নামে মহাকল্প সংঘটিত হয়েছিল। এখন দ্বিতীয় পরার্ধ চলছে। এর নাম বারাহ কল্প এবং এটিই প্রথম কল্প।

সৃষ্টির কথা

ক্রৌষ্টুকি বললেন, ব্রহ্মা কী ভাবে প্রজা সৃষ্টি করেন, তা আমাকে বলুন।

মার্কেণ্ডেয় বললেন, প্রলয়ের পরে তিনি নিদ্রোত্থিত হয়ে দেখলেন, সৃষ্টি শূন্য আছে। জলকে নার বলে. তিনি সেই জলে শুয়ে আছেন বলে তাঁব নারায়ণ নাম। তিনি অনুমানে অবগত হলেন যে পৃথিবী জলে নিমগ্ন হয়ে আছে। তাকে উদ্ধারের জন্য তিনি বরাহ মূর্তি ধারণ করে জলে ডুবে পাতাল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে জলের উপরে স্থাপন করলেন। দেহ বিস্তৃত বলে পৃথিবী জলে ভেসে রইল, মগ্ন বা প্লাবিত হল না। তিনি পৃথিবীকে সমান করে পর্বত সৃষ্টি করলেন। তারপর সপ্তদ্বীপ শোভিত ভূবিভাগ করে চার লোকের কল্পনা করলেন। এতে পূর্ব কল্পের মতো তমোময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হল। এতে জ্ঞানের বা বুদ্ধির লেশ মাত্র নেই, প্রতিভার সম্পর্কও নেই। আত্মা এতে আচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে।

এই সৃষ্টিতে কোন ফল হল না দেখে তিনি অন্যবিধ সৃষ্টির কল্পনা করলেন। তাতে পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্যক বা নীচ জাতের জীব উৎপন্ন হল। এতেও কোন ফল হল না দেখে তিনি পুনরায় ধ্যানে প্রবৃত্ত হলে সত্ত্বগুণ প্রধান দেব সৃষ্টি হল। এরপর তিনি সাধক সৃষ্টির জন্য ধ্যান আরম্ভ করলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ মানুষের জন্ম হল।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, দেবাদির সৃষ্টি আমাকে বিস্তার করে বলুন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, ব্রহ্মা দেবতা অসুর পিতৃগণ ও মানুষ সৃষ্টির জন্য নিজের আত্মাকে তিনি জলের সঙ্গে যোগ করলেন। তাতে তম গুণের প্রভাবে তাঁর জঘন থেকে প্রথমে অসুর প্রাদুর্ভূত হল। তখনই সেই তমোময় তনু পরিত্যাগ করতেই রাত্রি উৎপন্ন হল। তিনি অন্য দেহ ধারণ করে প্রীতি অনুভব করতেই সত্ত্বগুণের প্রভাবে তাঁর মুখ থেকে দেবতার উদ্ভব হল। তিনি সেই দেহও ত্যাগ করলেন, তাতে দিন হল। তারপর তিনি সত্ত্বমাত্ররূপিণী অপর দেহ পরিগ্রহ করে পিতৃবৎ মননে প্রবৃত্ত হলে পিতৃগণ প্রাদুর্ভূত হলেন। তারপর সেই দেহ ত্যাগ করতেই দিন রাত্রির মাঝে সন্ধ্যা সমুৎপন্ন হল। এর পরে রজোমাত্রময় অন্য শরীর পরিগ্রহ করলে মানুষের জন্ম হল এবং সে দেহ পরিত্যাগ করতেই জ্যোৎস্নার আবির্ভাব হল। রাত্রি দিন সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্না ব্রহ্মারই দেহ। রাত্রি তমোমাত্র স্বরূপিণী বলে অসুররা রাত্রে বলশালী হয় এবং দিন সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্না সত্ত্বমাত্রময় বলে দেবতা পিতৃগণ ও মানুষ যথাক্রমে দিনে সন্ধ্যায় ও জ্যোৎস্নায় বলশালী হয়ে থাকেন।

ব্রহ্মা এই কাজে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আক্রান্ত হয়ে রাত্রে রজ ও তমোগুণময়ী অন্যবিধ পরিগ্রহ করলেন। তাতে বিরূপ ও শ্মশ্রু সম্পন্ন ক্ষুধাতুর গণের সৃষ্টি হল এবং তাঁর সেই দেহ ভক্ষণ করতে উদ্যত হল। যারা 'রক্ষা করব' বলল তারা রাক্ষস এবং যারা 'ভক্ষণ করব' বলল তারা হল যক্ষ। তাদের দেখে ক্রোধে ব্রহ্মার কেশ বিশীর্ণ হলে সর্পণ অর্থাৎ গমন বশে সর্প ও হীন বলে অহি হল। এই সর্পদের দেখে ক্রুদ্ধ হলে উগ্র প্রকৃতি কপিলবর্ণ মাংসাদ জীবের আবির্ভাব হল। তারপর গো অর্থাৎ বাক্যের ধ্যান করতেই গন্ধর্বের জন্ম হল। এইভাবে আট রকম দেবযোনি সৃষ্টির পর ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকেই পশুপক্ষী সৃষ্টি করলেন। তাঁর রোম থেকে ওষধি ৎপন্ন হল। তারপর কল্পের আদিতে ত্রেতাযুগের মুখে এক ত্রিভুবন করলেন।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, মানুষ সৃষ্টির কথা আপনি বিস্তারিত ভাবে বলুন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, ব্রহ্মা প্রথমে তাঁর মুখ থেকে এক হাজার মিথুন সৃষ্টি করেন, তারা সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ও মনস্বী। বক্ষ থেকেও এক হাজার মিথুন সৃষ্টি করেন, তারা রজোগুণ বিশিষ্ট ও অমর্ষ সম্পন্ন। তিনি উরু থেকেও এক হাজার মিথুন সৃষ্টি করেন, তারা রজোস্তমো-গুণ বিশিষ্ট ও চেষ্টা সম্পন্ন। এর পরে তিনি পদযুগল থেকে আর এক হাজার মিথুন সৃষ্টি করেন, তারা তমোগুণ বিশিষ্ট, শ্রীহীন ও ক্ষুদ্রমনা। তারা কামাতুর হয়ে মিলিত হলেও প্রসব করত না। তারা স্থির যৌবন ছিল। বিনা সঙ্কল্পেই তাদের মিথুন প্রজা জন্মাত। তাদের রূপ এক রকম হত, এক সঙ্গে জন্মে এক সঙ্গেই মরত। তাদের ইচ্ছা ছিল না, দ্বেষ ছিল না। তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাব ছিল না। সবার আয়ু সমান হত। তারা কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করে জীবন ধারণ করত। ক্রমে তারা বাসের জন্য পুর নির্মাণ করল। ত্রেতা যুগেই প্রথম ঔষধের প্রাদুর্ভাব হয়। এরপরে ব্রহ্মা মানুষের গুণানুসারে মর্যাদা স্থাপন করলেন এবং সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম নির্দেশ করে দিলেন।

প্রজা বৃদ্ধি পাচ্ছে না দেখে ব্রহ্মা নয়জন মানস পুত্রের সৃষ্টি করলেন। তাঁদের নাম ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গিরা মরীচি দক্ষ অত্রি বশিষ্ঠ। তারপর ক্রোধাত্মসম্ভব রুদ্রের সঙ্কল্পের ও ধর্মের সৃষ্টি করলেন। পূর্বে তিনি সনন্দাদি যে প্রজা সৃষ্টি করেন, তাঁরা সংসারে আসক্ত না হয়ে সমাধি পরায়ণ হওয়াতে ব্রহ্মা জাতক্রোধ হলেন। তাতে সূর্যসন্নিভ সুবিশাল দেহের অর্ধনারী-নরদেহ পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন। তাই দেখে ব্রহ্মা বললেন, তুমি আত্মাকে বিভক্ত কর। বলে অন্তর্হিত হলেই সেই পুরুষ তার পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব পৃথক করে এক পুরুষ ও স্ত্রীর জন্ম দিলেন। ব্রহ্মা সেই পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু ও সেই নারীকে শতরূপা রূপে নির্মাণ করলেন। স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপাকে

পত্নী রূপে গ্রহণ করলেন। শতরূপা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যার জন্ম দিলেন। পিতা রুচির হাতে ঋদ্ধিকে সম্প্রদান করলেন। দক্ষিণার সঙ্গে যজ্ঞ তাদের পুত্র রূপে উৎপন্ন হলেন। এঁরাই দম্পতী মিথুন। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যে দ্বাদশ পুত্র জন্মে, তারা যাম নামে দেবতা রূপে বিখ্যাত। পিতা প্রসূতিকে দক্ষের হাতে সম্প্রদান করেন। তাতে প্রসূতির গর্ভে চব্বিশটি কন্যার জন্ম হয়। তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতি তুষ্টি পুষ্টি ক্রিয়া মেধা বুদ্ধি লজ্জা বপু শান্তি সিদ্ধি কীর্তি—এই তেরটি কন্যাকে ধর্ম পত্নীরূপে পরিগ্রহ করলেন। অবশিষ্ট একাদশ কন্যা খ্যাতি সতী সম্ভূতি স্মৃতি প্রীতি ক্ষমা সন্নতি অনসূয়া ঊর্জা স্বাহা ও স্বধাকে ভৃগু ভব মরীচি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ অত্রি বহ্নি ও পিতৃগণ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা কামকে, শ্রী দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে ও পুষ্টি লোভকে জন্ম দেন। মেধার গর্ভে শ্রুত, ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড লয় ও বিলয়, বুদ্ধির গর্ভে বোধ এবং লজ্জার গর্ভে বিনয় ও বপু উৎপন্ন হয়। শান্তি থেকে ক্ষেম, সিদ্ধি থেকে সুখ ও কীর্তি থেকে যশ জন্মগ্রহণ করল। এরা সকলেই ধর্মের পুত্র। কাম থেকে অতিমুদ ও হর্ষ উৎপন্ন হল। এরা ধর্মের পৌত্র।

অধর্মের স্ত্রী হিংসা, তার গর্ভে অনৃতের জন্ম হয়। নির্ঋতি তার কন্যার নাম। নরক ও ভয় এই দুজন নির্ঋতির পুত্র। তাদের স্ত্রীর নাম মায়া ও বেদনা। মায়া মৃত্যুকে প্রসব করে। রৌরব থেকে বেদনার গর্ভে দুঃখের উদ্ভব হয়। মৃত্যুর ঔরসে জন্ম হয় ব্যাধি জরা শোক তৃষ্ণা ও ক্রোধের। এরা সবাই দুঃখ থেকে উৎপন্ন। এরা অধর্ম লক্ষণ ও ঊর্ধ্বরেতা, এদের স্ত্রী-পুত্র নেই। মৃত্যুর এক পত্নীর নাম নির্ঋতি। অপর পত্নীর নাম অলক্ষ্মী, তাঁর গর্ভে মৃত্যুর চোদ্দটি পুত্রের জন্ম হয়। অলক্ষ্মীর এই পুত্ররা মৃত্যুর আদেশ পালন করেছিল। বিনাশ কাল উপস্থিত হলেই তারা লোকদের ভজনা করে। এরা মানুষের দশ ইন্দ্রিয় ও মনে অবস্থান করে এবং পুরুষ বা স্ত্রীকে স্ব

বিষয়ে নিয়োগ করে। রাগ ও ক্রোধের সাহায্যে তারা তাদের ইন্দ্রিয়কে এমন ভাবে পরিচালনা করে যে অধর্মের জন্য তাদের হানি হয়। এদের মধ্যে কেউ বুদ্ধিতে কেউ বা অহংকারে বাস করে। তারই জন্য তারা মোহবশে স্ত্রীদের বিনাশে যত্নবান হয়। এদের মধ্যে অনেকে মানুষের গৃহেও বাস করে।

দুঃসহ নামে মৃত্যুর এক পুত্র নগ্ন ও চীরধারী, ক্ষুধায় কৃশ ও অধোমুখ, তার কণ্ঠস্বর কাকের মতো। সকলকে ভক্ষণ করার জন্য ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি করেন। দংষ্ট্রাকরাল দুঃসহ মুখব্যাদান করে ভক্ষণে উদ্যত হলে ব্রহ্মা বলেন, এই জগৎটা খেয়ো না। । দুঃসহ বলে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিরূপে আমি বলবান হব, কিসে আমার তৃপ্তি হবে এবং কী আশ্রয় করে আমি শান্তিতে জাবন যাত্রা নিবাহ করতে পারি, তাই বলুন। ব্রহ্মা বললেন, বৎস, মানুষের গৃহ তোমার আশ্রয়, অধার্মিকেরা তোমার বল এবং মানুষের নিত্য ক্রিয়া হানিতে তোমার পুষ্টি হবে। তোমার আহার হবে দূষিত দ্রব্য ও জল। যে গৃহে সূর্য কখনও শয্যা দেখতে পান না, অগ্নি ও জল নিত্য বর্তমান, সূর্যকে প্রতিদিন দীপ দেখানো হয়, সেখানে লক্ষ্মীর বাস বলে তুমি আশ্রয় নিও না। দুঃসহের স্ত্রীর নাম নির্মাষ্টি। কলির স্ত্রী ঋতুকালে চণ্ডাল দর্শন করেছিল বলে তার জন্ম হয়। তাদের আট পুত্র ও আট কন্যা। এরা সকলেই অতি ভয়ঙ্কর। দুঃসহের বংশোদ্ভব সকলেই পাপাচার নামে বিখ্যাত এবং তারা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এরই নাম ব্রহ্মার তামস সৃষ্টি।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এইবারে রুদ্র সৃষ্টির কথা বলছি। কল্পের আদিতে ব্রহ্মা আত্ম সদৃশ পুত্রলাভের চিন্তায় প্রবৃত্ত হলে তাঁর অঙ্ক থেকে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হয়েই সুস্বরে রোদন করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কেন কাঁদছ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার নামকরণ করুন। ব্রহ্মা বললেন, তোমার রুদ্র নাম হল, তুমি আর রোদন কোরো না। এর পর রুদ্র সাতবার রোদন

করলেন বলে ব্রহ্মা তাঁর আরও সাতটি নাম দিলেন ভব সর্ব ঈশান পশুপতি ভীম উগ্র ও মহাদেব। তাঁদের থাকবার স্থানও সৃষ্টি করলেন সূর্য জল মহী বহ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্র ও দীক্ষিত ব্রাহ্মণ। এই আট রুদ্রের পত্নী হলেন সুবর্চলা উমা বিকেশী স্বর্বা স্বাহা দশ দিক দীক্ষা ও রোহিণী। এঁরা সকলেই রুদ্রাখ্য নামের সঙ্গে সূর্যাদির পত্নী। এঁদের পুত্রের নাম শনৈশ্চর শুক্র লোহিতাঙ্গ মনোজব স্কন্ধ স্বর্গ সন্তাল ও বুধ।

রুদ্র সতীকে পত্নীরূপে লাভ করেন। দক্ষের প্রতি রোষ বশে সতী নিজের দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি হিমালয়ের কন্যা হয়ে মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হন। তাঁর ভ্রাতার নাম মৈনাক, ইনি সাগরের অনুত্তম সখা। ভব পুনরায় অনন্যচিত্তা সতীকে বিবাহ করেন।

ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা ও বিধাতা নামে দুই দেবতাকে প্রসব করেন। নারায়ণের পত্নী শ্রীও তাঁর কন্যা। মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও নিয়তি ধাতা ও বিধাতার পত্নী। এঁদের দুই পুত্রের নাম প্রাণ ও মৃকণ্ডু।

মার্কণ্ডেয় বলতে লাগলেন, মৃকণ্ডু আমার পিতা, মা মনস্বিনী। আমার পুত্র বেদশিরাঃ জন্মেছেন আমার স্ত্রী ধূম্রবতীর গর্ভে। প্রাণের পুত্র দ্যুতিমান, তাঁর পুত্র উৎপন্ন ও অজরা। এঁদের অনেক পুত্র ও পৌত্র।

মরীচির পত্নী সম্ভূতি পৌর্ণমাসের জননী। পর্বতের স্ত্রী বিরজা দুই পুত্র প্রসব করেন। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতির গর্ভে সিনীবালী কুহু রাকা ও অনুমতী নামে কন্যার জন্ম হয়। অত্রির পত্নী অনসূয়ার পুত্রদের নাম চন্দ্র দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয়। পুলস্ত্যের স্ত্রী প্রীতির গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইনিই অগস্ত্য নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পুলহের স্ত্রী ক্ষমা কর্দম চার্ববীর ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। ক্রতুর স্ত্রী সন্নতি বালখিল্য নামে ষাট হাজার উর্ধ্বরেতা ঋষির জননী। বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জা রজোগাত্র উর্ধ্ববাহু সবল অনঘ সুতপা ও যুক্ত নামের সাত পুত্র প্রসব করেন। এঁরাই সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত।

ব্রহ্মার অগ্রজ পুত্র অভিমানী অগ্নি স্বাহার গর্ভে পাবক পবমান ও শুচি নামের তিন পুত্রের জন্ম দেন। শুচি জল খেয়ে থাকেন। তাঁদের সন্ততির সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। পিতা ও তিন পুত্র নিয়ে এঁদের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ। এঁরা দুর্জয় বলে পরিচিত। পিতৃগণ ব্রহ্মার সৃষ্টি, তাঁদের স্ত্রী স্বধা মেনা ও বৈধারিণী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। এঁরা ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী। দক্ষ কন্যাদের সন্ততির কথা এখানেই শেষ হল।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা

ক্রৌষ্টুকি বললেন, আমার এবারে মন্বন্তরের কথা, দেব দেবর্ষি ও রাজাদের পরিচয় জানার ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, মন্বন্তরের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক সত্তর। মানুষের ত্রিশ কোটি সাত হাজার সাতষট্টি নিযুত বছরে এক মন্বন্তর। দেবতাদের আটশো বাহান্ন হাজার বছর এর পরিমাণ। স্বায়ম্ভুব মনু থেকে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুস এই ছয় মনু অতীত হয়েছেন। এখন বৈবস্বত মনুর অধিকার। এর পর সাবর্ণি, রৌচ্য, ভৌত্য ও আগমী এই চার মনুর আবির্ভাব হবে।

স্বায়ম্ভুব মনুর দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এঁরা সকলেই পিতার সমান। প্রিয়ব্রতের পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র। ত্রেতা যুগে তাঁরা পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেছিলেন। কর্দমের কন্যা প্রজাপতির গর্ভে প্রিয়ব্রতর দুটি কন্যা ও দশটি পুত্রের জন্ম হয়। এঁদের নাম অগ্নীধ্র মেধাতিথি বপুষ্মান জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান ভব্য ও সবল। প্রিয়ব্রত এঁদের সাতটি দ্বীপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অগ্নীধ্রকে জম্বু দ্বীপের, মেধাতিথিকে প্লক্ষ দ্বীপের, বপুষ্মানকে শাল্মল দ্বীপের, জ্যোতিষ্মানকে কুশ দ্বীপের, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চ দ্বীপের, ভব্যকে শাক দ্বীপের ও সবলকে পুষ্কর দ্বীপের রাজত্ব দেন। সবল তাঁর দুই পুত্রকে পুষ্কর রাজ্য ভাগ করে দেন, ভব্য তাঁর রাজ্য শাক দ্বীপকে সাতটি বর্ষে

ভাগ করে সাত পুত্রকে দেন। এইভাবে দ্যুতিমানও ক্রৌঞ্চ দ্বীপ সাত পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। জ্যোতিষ্মানেরও সাত পুত্র, তিনি তাঁর রাজ্য সাতটি বর্ষে ভাগ করে দেন। শাল্মল দ্বীপের রাজা বপুষ্মানেরও সাত পুত্র। ইনিও পুত্রদের সাতটি বর্ষে প্রতিষ্ঠা করেন। প্লক্ষ দ্বীপে মেধাতিথিরও সাত পুত্র বলে এই দ্বীপও সপ্তধা বিভক্ত হয়েছে। জম্বু দ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রর নয়টি পুত্র। এদের নাম নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্য, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এদের প্রত্যেকের নামে বর্ষ। নাভির ঋষভ নামে এক পুত্র জন্মে, ভরত তাঁরই পুত্র এবং শত পুত্রের মধ্যে প্রধান। ঋষভ তাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করে পুলহের আশ্রমে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ভরতকে তিনি হিম নামে দক্ষিণ বর্ষ প্রদান করে যান। তাঁরই নামে ভারতবর্ষ। ভরত তাঁর পুত্র সুমতির হাতে রাজ্যভার দিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। তাঁদেরই পুত্র ও পৌত্ররা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ভোগ করেছেন।

জম্বু দ্বীপ তথা বর্ষ-বর্ণনা

ক্রৌষ্টুকি জম্বু দ্বীপের বর্ণনা শুনতে চাইলে মার্কণ্ডেয় বললেন, পৃথিবী শতার্ধ কোটি বিস্তৃত। জম্বু প্রভৃতি সাত দ্বীপ পরস্পর যথাক্রমে দ্বিগুণায়ত। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল সাগর এই সাত সাগরও যথাক্রমে দ্বিগুণ মানে পরস্পর বর্ধিত। সপ্ত দ্বীপকে এরাই সবতোভাবে বেষ্টন করে আছে।

জম্বু দ্বীপ বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে এক লক্ষ যোজন। হেমবান, হেমকুট, ঋষভ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সাতটি বর্ষ পর্বত। মধ্য ভাগে মহাপর্বত দুটি দু লক্ষ যোজন বিস্তৃত। এদের দক্ষিণে ও উত্তরে যে দুটি পর্বত আছে, তারা বিস্তারে দশ হাজার যোজন। ছটি বর্ষ পর্বত সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। ভূমি দক্ষিণ ও উত্তরে নিম্ন এবং মধ্যে তুঙ্গায়ত। তিনটি বর্ষ দক্ষিণে ও তিনটি উত্তরে। ইলাবৃত বর্ষ অর্ধ-

চন্দ্রাকারে অবস্থিত। পূর্বে ভদ্রাশ্ব ও পশ্চিমে কেতুমাল। ইলাবৃত বর্ষের মধ্যভাগে কনক পর্বত মেরু। এর প্রাচ্যাদি বিভাগসমূহে যথাক্রমে শুক্ল পীত কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ ভেদে ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র ও ক্ষত্রিয়রা বাস করে। এর উপরে পূর্বাদি আট দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদের সভা ও তার মধ্যে ব্রহ্মার সভা। এই সভা চোদ্দ হাজার যোজন সমুচ্ছ্রিত, তার অধোভাগে বিষ্কম্ভ পর্বত। প্রাচ্যাদি দিক বিভাগে মন্দর গন্ধমাদন বিপুল ও সুপার্শ্ব পর্বত। মন্দরের কেতু পাদপ কদম্ব, গন্ধমাদনের জম্বু বৃক্ষ, বিপুলের অশ্বত্থ এবং সুপার্শ্বের কেতু পাদপ বট। পূর্ব দিকের পর্বতের নাম জঠর। দেবকূট এবং পরস্পর সন্নিবদ্ধ আনীল ও নিষধ। নিষধ ও পারিপার্শ্ব পর্বত দুটি মেরুর পশ্চিমে। কৈলাস ও হিমবান মেরুর দক্ষিণে পূর্ব পশ্চিমে আয়ত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। শৃঙ্গবান ও জারুধি মেরুর উত্তরে। এই আটটি পবতকে মর্যাদা পর্বত বলে। হিমালয় ও হেমকূটাদি পর্বত নয় হাজার যোজন বিস্তৃত। এরা মেরুর চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে। গন্ধমাদন পর্বতের শিখরে গজদেহ প্রমাণ জম্বু ফলের রস থেকে জম্বু নদীর উৎপত্তি। এই নদীতে জাম্বুনদ নামে সুবর্ণ সমুদ্ভূত হয়। এই নদী মেরু পরিভ্রমণ করে জম্বুমূলে প্রবেশ করেছে। ভদ্রাশ্বে বিষ্ণু হয়শিরা রূপে, ভারতে কূর্ম রূপে, কেতুমালে বরাহ রূপে ও উত্তরে মৎস্য রূপে বিরাজ করেন।

পূর্বদিকে চৈত্রবন, দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরাচলে সাবিত্র নামে বন আছে। এই রকম চারটি সরোবরও আছে—পূর্বে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ ও উত্তরে মহাভদ্র।

মেরুর উত্তরস্থ পর্বতের দ্রোণী প্রদেশ অতি মনোহর। বনগুলি নির্মল জলের সরোবরে শোভিত। সেখানে পুণ্যশীল মানুষের জন্ম হয়ে থাকে। এই স্থান স্বর্গের মতো অথবা আরও গুণশালী। সেখানে পাপ-পুণ্যের উপার্জন হয় না। শোনা যায় যে দেবতাদেরও পুণ্যভোগ হয়ে থাকে। এই সব শৈলে বিদ্যাধর যক্ষ কিন্নর উরগ

রাক্ষস দেব ও গন্ধর্বদের শোভাময় আবাস আছে। উপবনে দেবতারা বিরাজ করে থাকেন। দক্ষিণে ভারত নামে যে বর্ষ আছে তা কর্ম-ভূমি। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও পাপপুণ্যের ফল ভোগ হয় না। এইটিই প্রধান বর্ষ। এই জন্যই এখানকার অধিবাসী মানুষেরা স্বর্গ নরক ভোগ করে ও নানা যোনিতে জন্ম নেয়।

নারায়ণের পদ থেকে ত্রিপথগামিনী দেবী গঙ্গা প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। প্রথমে চন্দ্রে প্রবেশ করেন, তাতে সূর্য কিরণের সংযোগে শক্তিশালী হয়ে মেরুপৃষ্ঠে পড়ে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হন। অলকনন্দা নামের তৃতীয় ধারা দক্ষিণে গন্ধমাদনে এসে নন্দনকানন অতিক্রম করে মানস সরোবর প্লাবিত করেন। তারপর যাবতীয় পর্বত প্লাবিত করে হিমগিরিতে এলে শিব তাকে ধারণ করেন। ভগীরথ আরাধনা করলে শিব তাঁকে ছেড়ে দেন। তখন তিনি সপ্ত ধারায় বিভক্ত হন। ভগীরথ রথারোহণে পথ দেখিয়ে চললে তিনি এক ধারায় দক্ষিণ দিক প্লাবিত করে তাঁর অনুগমন করেন।

অন্যান্য বর্ষে প্রজারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ ও নিরাতঙ্কে বাস করে। সেখানে উত্তম অধম ভাব নেই। সকলেই উদ্ভিদ অর্থাৎ উৎস সলিল। কেবল ভারতেই মেঘ থেকে জল পড়ে। অন্যত্র আধিব্যাধিও নেই, পাপপুণ্যেরও সমারম্ভ নেই।

এই ভারতবর্ষে নয়টি বিভাগ। সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন বলে এগুলি পরস্পর অগম্য। এই বিভাগগুলির নাম ইন্দ্র দ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভেস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব ও বারুণ। এগুলি চতুর্দিকে সাগর বেষ্টিত এবং উত্তর দক্ষিণে এক হাজার যোজন। এর পূর্বে কিরাত, অন্তে ও পশ্চিমে যবন এবং মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের বাস। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটি কুল পর্বত। কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দুর, বাতন্ধন, বৈদ্যুত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, পাণ্ডর, পুষ্প, দুর্জয়ন্ত, রৈবত, অর্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, কূট শৈল,

কৃতস্মর, শ্রীপর্বত, ক্রোর ও অন্যান্য পর্বতে জনপদগুলি ম্লেচ্ছ ও আর্য এই দু ভাগে বিমিশ্রিত হয়েছে। ম্লেচ্ছ ও আর্যরা যে সব নদীর জল পান করে তাদের নাম গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধু চন্দ্রভাগা যমুনা শতদ্রু বিতস্তা ঐরাবতী কুহূ গোমতী ধূতপাপা বাহুদা দৃশদ্বতী বিপাশা দেবিকা রংক্ষু নিশ্চীরা গণ্ডকী ও কৌশিকী। এই নদীগুলি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যে সব নদী পারিপাত্র পর্বতকে আশ্রয় করে আছে তাদের নাম বেদস্মৃতি বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধু বেণ্বা আনন্দিনী সদানীরা মহী পারা চর্মণ্বতি তাপী বিদিশা বেত্রবতী শিপ্রা ও অবনী। শোণ নর্মদা সুরথা অদ্রিজা মন্দাকিনী দশার্ণা চিত্রকুটা চিত্রোৎপলা তমসা করমোদা পিশাচিকা পিপ্পলিশ্রোণি বিপাশা বঞ্জুলা সুমেরুজা শুক্তিমতী শকুলী ত্রিদিবাক্রমু ও বেগবাহিনী নদী ঋক্ষ পর্বতের পাদদেশ থেকে প্রসূত হয়েছে। বিন্ধ্যপাদ প্রসূত নদীর নাম শিপ্রা পয়োষ্ণী নির্বিন্ধ্যা তাপী নিষধাবতী বেণ্বা বৈতরণী সিনিবালী কুমুদ্বতী করতোয়া মহাগৌরী দুর্গা ও অন্তঃশিরা। এ ছাড়াও আছে গোদাবরী ভীমরথা কৃষ্ণবেণ্বা তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহ্যা ও কাবেরী। কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজা ও উৎপলাবতী নদীর উৎপত্তি মলয় পর্বতে। মহেন্দ্র পর্বতে উৎপত্তি পিতৃকুল্যা সোমকুল্যা ঋষিকুল্যা ইক্ষুকা ত্রিদিবা লাঙ্গলিনী ও বংশকরা নদীর। ঋষিকুল্যা কুমারী মন্দগা মন্দবাহিনী কৃপা ও পলাশিনী শুক্তিমান পর্বতে প্রসূত হয়েছে।

মধ্যদেশের জনপদগুলির নাম মৎস্য অশ্বকুট কুল্য কুন্তল কাশী কোশল অথর্ব কলিঙ্গ মলক ও বৃক। সহ্য পর্বতের উত্তরে যেখানে গোদাবরী প্রবাহিত, সেই দেশ পৃথিবীর মধ্যে মনোরম। ভার্গবের গোবর্ধনপুর বাহ্লীক বাটধান আভীর কালতোয় অপরান্ত শূদ্র পল্লব চর্মখণ্ডিক গান্ধার যবন সিন্ধু সৌবীর মদ্রক শতদ্রুজ কলিঙ্গ পারদ হারভূষিত মাধর বহুভদ্র কৈকেয় দেশমালিক ক্ষত্রিয়োপনিবেশ বৈশ্য ও শূদ্রকুল কাম্বোজ দরদ বর্বর হর্ষবর্ধন চীন খার বাহ্‌তী আত্রেয় ভরদ্বাজ পুষ্কল কশেরুক লম্পাকা শূলকার চুলিকা জাগুড় ঔপক

আনিভদ্র কিরাত তামস হংসমার্গ কাশ্মীর তুঙ্গন শূলিকা কুহক জর্ণ দর্ব —এই সব জনপদ উত্তর দিকে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত জনপদের নাম পুণ্ড কেরল গোলাঙ্গুল শৈলুষ মূষিক কুসুম বাসক মহারাষ্ট্র মহিষক কলিঙ্গ আভীর বৈশ্যিক আঢাক শবর পুলিন্দ বিন্ধ্য-মৌলেয় বৈদর্ভ দণ্ডক পৌরিক মৌলিক অশ্মক ভোগবর্ধন নৈষিক কুন্তল অন্ধ্র উদ্ভিদ ও বলদারক। অপরান্ত দেশের নাম সূর্যারক কালিবল দুর্গ আনীকট পুলিন্দ সুমীন রূপপ স্বাপদ কুরুমী কটাক্ষর নাসিক্যাব উত্তর নর্মদ ভীরুকচ্ছ সমাহেয় সারস্বত কাশ্মীর সুরাষ্ট্র আবন্ত্য ও আর্বুদ। বিন্ধ্য পৃষ্ঠ নিবাসী জনপদের নাম সরজ করুষ কেরল উৎকল উত্তমার্ণ দশার্ণ ভোজ্য কিষ্কিন্ধ তোশল কোশল ত্রৈপুর বৈদিশ তুম্বুর তুম্বুল পটু নৈষধ অন্নজ তুষ্টিকার বীরহোত্র ও অবন্তি। নীহার হংস মার্গ কুরু গুর্গণ খস কুন্ত প্রাবরণ ঊর্ণ দার্ব কৃত্রক ত্রিগর্ত মালব কিরাট ও তামস পার্বত্য দেশ।

এই ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্বে মহাসাগর। উত্তরে হিমালয় ধনুর্গুণাকারে অবস্থিত। এই একমাত্র কর্মভূমি। দেবতারাও দেবত্ব ভ্রষ্ট হয়ে এখানে মনুষ্যত্ব পাবার জন্য সবদা অভিলাষ করেন; এখানে মানুষ যা করে, দেবাসুরও তা করতে পারে না।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, নারায়ণ এখানে কী ভাবে কূর্ম রূপে অবস্থান করছেন, তা জানবার ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, তিনি এই নয় বিভাগ সম্পন্ন ভারত আশ্রয় করে পূর্ব মুখে বিরাজ করছেন। এতে যে সব দেশ আছে তার বৃত্তান্তও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। যে সব নক্ষত্রে কূর্মের সংস্থিতি, তিনি তারও বর্ণনা দিয়ে বললেন, দেবতারা প্রত্যেক নক্ষত্রে আশ্রয় করে এই কূর্মে অবস্থান করছেন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—ভারতেই এই চার যুগের প্রচার ও প্রকট ভাব হয়ে থাকে। ভারতেই চাতুর্বর্ণ্য বিধির ব্যবস্থা আছে। এই চার যুগে মানুষ এখানে যথাক্রমে চার তিন দুই ও একশো বছর বাঁচে।

দেবকূটের পূর্ববর্তী শৈলরাজের পূর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ। এখানে পাঁচটি কুল পর্বত বহু জনপদ ও নদী আছে। অধিবাসীরা সহস্র বর্ষজীবী। তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নেই এবং সবাই সমদর্শী। নারায়ণ এখানে হয়শিরা রূপে বিরাজমান।

কেতুমাল বর্ষে সাতটি কুল পর্বত। এ ছাড়া আরও অনেক পর্বত ও নদী আছে। জনপদও অনেক। নারায়ণ এখানে বরাহ রূপে বিরাজ করেন।

উত্তর কুরুর সমস্ত বৃক্ষ মধু ফল বিশিষ্ট। ফলেই বস্ত্র ও আভরণ প্রসূত হয়। ভূমি মণিময় ও বায়ু সুগন্ধ সুখপ্রদ। দেবলোক ভ্রষ্ট মানুষেরাই সেখানে মিথুন হয়ে জন্মায়। চক্রবাক মিথুনের মতো তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগের সীমা নেই। তারা সাড়ে চোদ্দ হাজার বছর বাঁচে। সেখানে চন্দ্রকান্ত ও সূর্যকান্ত এই দুটি কুল পর্বত, নদী ভদ্রসোমা। উত্তর বর্ষে আরও অনেক ঘৃতবাহিনী ও ক্ষীরবাহিনী নদী আছে। নারায়ণ এখানে মৎস্য রূপেঃবিরাজ করেন।

কিম্পুরুষ বর্ষের পুরুষেরা হৃষ্টপুষ্ট দেহ বিশিষ্ট। তাদের আয়ু দশ হাজার বছর। তাদের রোগ শোক নেই। এখানে যে প্লক্ষ বা পাকুড় গাছ আছে, অধিবাসীরা তার ফলের রস পান করে। এখানকার স্ত্রী-লোকেরাও স্থির যৌবনা, তাদের দেহে উৎপলের গন্ধ।

কিম্পুরুষের পর হরিবর্ষ। সেখানে যারা জন্মায়, তারা দেবলোক ভ্রষ্ট ও দেবরূপী। তারা ইক্ষুরস পান করে। সেখানে জরা ব্যাধি নেই, সবাই দশ হাজার বছর বাঁচে।

মেরুবর্ষ ইলাবৃতে সূর্য তাপ দেন না, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রেরও জ্যোতি স্ফুরিত হয় না। সেখানে মেরুর দ্যুতিই আলোকের কাজ করে। সেখানে কেউ জরাযুক্ত হয় না। সকলে জম্বু ফলের রস পান করে। তাদের আয়ুর পরিমাণ তের হাজার বছর। ইলাবৃত বর্ষে মেরুই মহা শৈল।

রম্যক বর্ষে ন্যগ্রোধ বা বট গাছ আছে। অধিবাসীরা তারই

ফলের রস পান করে বর্ধিত হয়। তাদের আয়ুর পরিমাণ অযুত বৎসর। তাদেরও জরা নেই।

এর উত্তরে হিরণ্ময় বর্ষ। সেখানে হিরণ্বতী নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তেজস্বী মানুষেরই জন্ম হয়। যক্ষের মতো সকলে রূপবান ও ধনী।

স্বরোচির উপাখ্যান

ক্রৌষ্টুকি বললেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের পরে আমার অন্যান্য মন্বন্তরের কথাও শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এর পরে স্বারোচিস মন্বন্তরের কথা। অরুণাস্পদ নগরে বরুণা নদীর তটে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন অশ্বিনীকুমারের চেয়েও রূপবান, সচ্চরিত্র, বেদ বেদাঙ্গ পারগ ও অতিথি পরায়ণ। তাঁর ইচ্ছা হল পৃথিবী দর্শন করবার। এক দিন তাঁর গৃহে এক অতিথি এলেন। তিনি বিবিধ ওষধির প্রভাব জানতেন এবং মন্ত্র বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। ব্রাহ্মণকে নানা দেশের কথা শোনাতেই ব্রাহ্মণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন, আপনি তো বৃদ্ধ নন, যৌবন বেশি দূর গড়ায় নি। অথচ এরই মধ্যে আপনি কী ভাবে পৃথিবী পর্যটন করলেন? অতিথি বললেন, মন্ত্রৌষধি বলে আমার অপ্রতিহত গতি। অর্ধেক দিনেই আমি সহস্র যোজন চলতে পারি। ব্রাহ্মণ তাঁর কথায় বিশ্বাস করে সাদরে বললেন, সমগ্র পৃথিবী দর্শন করতে আমারও খুব ইচ্ছা। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। তাতে সেই উদার বুদ্ধি ব্রাহ্মণ তাঁকে পাদলেপ দিয়ে তাঁর আখ্যাত দিক অভিমন্ত্রিত করলেন। ব্রাহ্মণ অনুলিপ্ত পায়ে হিমালয় দর্শনে চললেন। ভাবলেন যে দিনার্ধে সহস্র যোজন গিয়ে অপর দিনার্ধে ফিরে আসবেন। কিন্তু হিমালয়ে পৌঁছে দেখলেন যে তাঁর শ্রান্তি বোধ হচ্ছে না। সেখানে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে তুহিন তাঁর পায়ে সংলগ্ন হল এবং তা বিলীন হবার সময়ে পায়ের সেই ওষধি প্রক্ষালিত হল।

তিনি জড়গতি হয়ে হিমালয়ের সানু দেখতে লাগলেন। এই সানুগুলি অতি মনোরম। সিদ্ধ গন্ধর্ব অপ্সরা কিন্নর ও দেবতার জন্য আরও রমণীয়। তিনি এই সব দেখে পুলকিত হলেন, কিন্তু তৃপ্তির শেষ লাভ হল না। কোথাও প্রস্রবণ থেকে জল ঝরে পড়ছে, কোথাও শিখীরা কেকাধ্বনি করে নৃত্য করছে, কোথাও মনোহারী পক্ষী, কোথাও বা পুংস্কোকিলের কলালাপ। ব্রাহ্মণ কাল আবার আসবেন ভেবে গৃহে ফিরতে গিয়ে দেখলেন যে পাদলেপ উঠে যাবার জন্য চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তখন ভাবলেন, এই দুর্গম পর্বতে এ কী সঙ্কট হল! এখন সন্ধ্যাদি ক্রিয়ার হানি হবে। কোন তপস্বীকে দেখতে পেলে গৃহে ফেরার পথ জেনে নিতে হবে।

ব্রাহ্মণ যখন এই চিন্তা করছিলেন, তখন বরূথিনী নামে এক রূপসী অপ্সরা তাঁকে দেখতে পেল। দেখেই তার অনুরাগের উদ্রেক হল। নানা কথা ভেবে সে ব্রাহ্মণের সামনে এল। ব্রাহ্মণ তার নিকটে গিয়ে বললেন, তুমি কে? আমি অরুণাস্পদ নগর থেকে পাদলেপের প্রভাবে এখানে এসেছি, এখন তা নষ্ট হয়ে গেছে।

বরূথিনী বলল, আমি অপ্সরা, নাম বরূথিনা। হিমাচলেই আমি বিচরণ করি। আপনাকে দেখে আমি কামের বশীভূত হয়েছি। অতএব আপনার জন্য কী করব বলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, কী ভাবে আমি নিজের গৃহে ফিরতে পারি, তাই আমাকে বল। ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম নষ্ট হচ্ছে।

বরূথিনী বলল, আমাকে পরিত্যাগ করে ফিরে যাবার কথা বলবেন না। এই হিমালয় স্বর্গ থেকেও রম্য। সেই জন্যই আমরা এখানে বাস করি। আপনি এখানেই আমার সঙ্গে বিহার করুন। তাহলে আপনার বান্ধবদের কথা মনে পড়বে না। জরা কোন দিন আপনাকে আক্রমণ করবে না। এখানে যৌবনেরই নিত্য উপচয় হবে। বলে সে অনুরাগের আবেশে উন্মনা হয়ে মধুর স্বরে 'প্রসন্ন হোন' বলে সহসা ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করল।

ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, আমাকে স্পর্শ কোরো না। তোমার মতো ব্যক্তির কাছেই তুমি যাও। এই সামান্য হিমালয়ের কথা কী বলছ। সকাল সন্ধ্যায় অগ্নিতে হোম করলেই শাশ্বত লোক অনায়াসে পাওয়া যায়। যাতে আমি শীঘ্র স্বগৃহে যেতে পারি, তার উপায় বল।

বরূথিনী বলল, আপনি এখান থেকে নিঃসন্দেহে গৃহে যাবেন। কিন্তু আমার সঙ্গ আপনি স্বল্পকাল ভোগ করে যান।

ব্রাহ্মণ বললেন, গার্হপত্যাদি অগ্নি ত্রয়ই আমার প্রার্থনার সামগ্রী।

বরূথিনী বলল, আটটি আত্ম গুণের মধ্যে দয়া প্রধান। কিন্তু আমাকে আপনি দয়া করছেন না কেন? আপনি আমাকে ত্যাগ করলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমার প্রতি যদি তোমার এতই প্রীতি তো আমার গৃহে ফেরার উপায় নির্দেশ কর। তুমি তো জানো, ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোগের চেষ্টা প্রশস্ত নয়।

বরূথিনী বলল, আমি ম্রিয়মান হয়েছি। আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেই আমার মৃত্যু হবে, আর আপনি হবেন পাপের ভাগী।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমার গুরুরা বলেছেন, পরস্ত্রীকে কামনা করবে না। তাই তোমাতে আমার অভিলাষ নেই। তুমি বিলাপই কর বা শুকিয়েই যাও, সে তোমার ইচ্ছা।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এই কথা বলে ব্রাহ্মণ শুচি হয়ে জলস্পর্শ করে শুদ্ধ চিত্তে গার্হপত্য অগ্নিকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, যে সত্য বলে নিখিল জগৎ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি সেই সত্য বলেই যেন আজ সূর্যাস্তের পূর্বে স্বগৃহ দর্শন করি। পরদ্রব্যে বা পরদারে আমার যে কখনও মতি হয় নি, সেই পুণ্য বলে আমার এই অভিলাষ সিদ্ধ হোক।

ব্রাহ্মণের এই কথায় তাঁর দেহে গার্হপত্য অগ্নি সন্নিহিত হলেন। সেই প্রভার বলয়ের মধ্যে তাঁকে দ্বিতীয় অগ্নির মতোই দেখাতে

লাগল। তাই দেখে বরূথিনী তাঁর প্রতি আরও অনুরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ত্বরায় প্রস্থান করলেন এবং ক্ষণমধ্যে নিজের গৃহে পৌঁছে গেলেন। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায়, বরূথিনী ততক্ষণ তাঁকে দেখল। তার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে রোদন করতে লাগল। এই রমণীয় বনে আহারে বিহারে তার আনন্দ রইল না। ব্রাহ্মণের বিরহে সে তার যৌবনেরই নিন্দা করতে লাগল।

এদিকে কলি নামের এক গন্ধর্ব ইতিপূর্বে তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। কিন্তু বরূথিনী তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তার এই অবস্থা দেখে সেই গন্ধর্ব ভাবল, কেন বরূথিনী এমন ম্লান হয়ে আছে? কেউ তাকে অবমাননা করেছে, না কোন ঋষির শাপে তার এই অবস্থা? কৌতূহল বশে সমাধি প্রভাবে সে সমস্ত অবগত হল। তারপর ভাবল যে তার ভাগ্য বলেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমি একে অনেক প্রার্থনা করেছি, কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ আমি একে হস্তগত করব। মানুষের প্রতি এর অনুরাগ হয়েছে, তাই আমি মানুষেরই রূপ ধারণ করব। বলে কলি ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে বরূথিনীর নিকটে বিচরণ করতে লাগল।

বরূথিনী তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে তার কাছে এসে বলল, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনি আমাকে ত্যাগ করলে আমিও নিঃসন্দেহে প্রাণত্যাগ করব। তাতে আপনারও অধর্ম ও ক্রিয়ালোপ হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে পরিত্রাণ করলে আপনার পুণ্য সঞ্চয় হবে।

কলি বলল, এখানে থাকলে আমার ক্রিয়াহানি হবে। কিন্তু তুমি এইভাবে আমাকে বলছ! আমি এখন কী করি! বড় সঙ্কটেই পড়েছি। তবে একটা কাজ করলে আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

বরূথিনী বলল, আপনি প্রসন্ন হোন। যা বলবেন, আমি তাই করব।

কলি বলল, আজ এই অরণ্যে তোমার সঙ্গে সম্ভোগে প্রবৃত্ত হলে তুমি চোখ বন্ধ করে থাকবে, আমাকে দেখবে না।

বরূথিনী বলল, তাই হবে।

এরপর কলি বরূথিনীর সঙ্গে নানা মনোহর স্থানে আহ্লাদে বিহার করতে লাগল। সম্ভোগের সময় বরূথিনী নিমীলিত চোখে ব্রাহ্মণের সেই অগ্নির আবেশে তেজোময় রূপ চিন্তা করল। তার গর্ভ সঞ্চার হলে কলি বিদায় নিল। যথাসময়ে এক বালক প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম প্রভায় সূর্যের মতো চারি দিক উদ্ভাসিত করে ভূমিষ্ঠ হলেন। সূর্যের ন্যায় স্বরোচিঃ বা স্বয়ংপ্রভা বলে তাঁর নাম হল স্বরোচি। তিনি চন্দ্রের ন্যায় বর্ধিত হতে লাগলেন। যৌবনে পদার্পণ করে তিনি বেদ ধনুর্বেদ ও সমস্ত বিদ্যা অর্জন করলেন।

একদিন স্বরোচি মন্দর পর্বতে বিচরণ করতে করতে এক ভয়াতুরা কন্যাকে দেখতে পেলেন। কন্যা তাঁকে দেখেই বলল, আমাকে রক্ষা করুন। 'তোমার ভয় নেই' বলে স্বরোচি তাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কন্যা বলল, আমি ইন্দীবরাক্ষ বিদ্যাধরের কন্যা, মরুধন্বার কন্যা আমার মা। আমার নাম মনোরমা। মন্দার বিদ্যাধরের কন্যা বিভাবরী ও মহর্ষি পারের কন্যা কলাবতী আমার দুই সখী। তাদের সঙ্গে আমি কৈলাস পর্বতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক মহর্ষিকে দেখলাম যে তপস্যায় তাঁর শরীর অতি কৃশ, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ, তেজ বিগলিত ও চোখ কোটরগত। আমি হেসে ফেলতেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন। তুমি আমাকে উপহাস করলে। অচিরে রাক্ষস তোমাকে অভিভূত করবে। শাপের কথা শুনেই আমার সখীরা অনুযোগ করল, ধিক্ আপনাকে। ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমাশীলতা এবং ক্রোধ জয়েই তার তপস্যা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে তপস্যায় আপনার কোন ফল হয় নি। এই কথা শুনে মহর্ষি তাঁদেরও শাপ দিলেন, এক জনের কুষ্ঠ হবে, অন্য জনের হবে ক্ষয় রোগ। তৎক্ষণাৎ তাদের তাই হয়েছে এবং এক রাক্ষস আমাকে অনুসরণ

করে আসছে। ঐ শুনুন তার গর্জন। আপনি যদি রাক্ষসের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন, তাহলে আমি আপনাকে যাবতীয় অস্ত্রগ্রাম হৃদয়বিদ্যা দিব। শিব এই বিদ্যা স্বায়ম্ভুব মনুকে দিয়েছিলেন, মনু বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ সিদ্ধবর্ধকে দেন। তিনি আমার মাতামহ চিত্রায়ুধকে এবং চিত্রায়ুধ আমার পিতাকে যৌতুক স্বরূপ এই বিদ্যা দান করেছিলেন। বাল্যকালে আমি পিতার নিকটে এই বিদ্যা শিখেছি। এই অস্ত্র হৃদয় দিয়ে সমস্ত শত্রু বিনাশ করা যায়। তাই আপনি শীঘ্র এই বিদ্যা শিখে দুরাত্মা রাক্ষসকে বধ করুন।

স্বরোচি বললেন, বেশ, তাই হবে।

তখনই ঐ কন্যা জল স্পর্শ করে তাঁকে আগম ও নিগমের সঙ্গে অস্ত্র হৃদয় বিদ্যা প্রদান করল। এই অবসরে রাক্ষস সেখানে এসে বলল, আমি যখন তোমার পিছু নিয়েছি, তখন আর কি তুমি বাঁচবে! দেরি করছ কেন? এসো, তোমাকে ভক্ষণ করি। রাক্ষসকে দেখে স্বরোচি ভাবলেন যে মহর্ষির শাপ সত্য হোক, রাক্ষস মনোরমাকে গ্রহণ করুক। দেখতে না দেখতেই রাক্ষস কন্যাকে গ্রহণ করল। কন্যা করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, আমাকে রক্ষা করুন। এই কথায় স্বরোচি ক্রুদ্ধ হয়ে অতি ভয়ঙ্কর চণ্ডাস্ত্র দর্শন ও সন্নিবেশ করে অনিমেষ লোচনে রাক্ষসকে দেখতে লাগলেন। রাক্ষস তার প্রভাবে কন্যাকে ত্যাগ করে বলতে লাগলেন, আপনি প্রসন্ন হয়ে অস্ত্র সংবরণ করে শুনুন। তীক্ষ্ণ স্বভাব ব্রহ্মমিত্র আমাকে যে শাপ দিয়েছিলেন, আপনি তা নিরাকরণ করলেন। স্বরোচি বললেন, ব্রহ্মমিত্র আপনাকে কী শাপ দিয়েছিলেন বলুন। রাক্ষস বলল, ব্রহ্মমিত্র অথর্ব বেদ থেকে ত্রয়োদশ অধিকার সমেত অষ্টাঙ্গ হৃদয় আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। আমি এই কন্যার পিতা ইন্দীবরাক্ষ বিদ্যাধর পতি নলনাভ আমার পিতা। মহর্ষি ব্রহ্মমিত্রকে আমি সমুদায় আয়ুর্বেদ প্রদান করতে অনুরোধ করেছিলাম। সবিনয়ে বারবার প্রার্থনা করতেও যখন তিনি আমাকে তা দিলেন না, তখন

তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের তা দিচ্ছিলেন সেই সময়ে অন্তর্হিত হয়ে আমি তা গ্রহণ করি। আট মাস পরে হর্ষের উদ্রেকে আমি হেসে ফেলতেই তিনি আমাকে চিনতে পেরে সক্রোধে বললেন, তুমি রাক্ষসের মতো অদৃশ্য হয়ে বিদ্যা গ্রহণ ও অবজ্ঞা করে হাসবার জন্য সাত রাতের মধ্যে দারুণ প্রকৃতির রাক্ষস হবে। আমি প্রণিপাত করে তাঁকে প্রসন্ন করলে তিনি বললেন, রাক্ষস হয়েও তুমি পুনরায় পূর্ব স্বরূপ ফিরে পাবে। স্মৃতি নষ্টের জন্য তুমি ক্রোধ ভরে যখন নিজের অপত্যকে ভক্ষণ করতে যাবে, তখনই তার অস্ত্রানলে সন্তাপিত হয়ে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করবে ও নিজের দেহ ফিরে পেয়ে গন্ধর্বলোকে স্থান পাবে। আজ তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। তাই তোমাকে আমার প্রার্থনা পূরণ করতে হবে। আমার এই কন্যাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করছি। মুনির কাছে যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ করেছি, তাও তোমাকে দিচ্ছি। এই বলে তিনি নিজের পূর্ব রূপ পরিগ্রহ করে স্বরোচিকে বিদ্যা দান করলেন। তারপর কন্যা দানে উদ্যত হলে কন্যা পিতাকে বলল, তাত, ইনি যেমন মহাত্মা, তেমনি উপকারী। এঁকে দেখেই আমি অনুরক্ত হয়েছি সত্য, কিন্তু আমার জন্যই আমার দুই সখী দুঃখপীড়িত হয়েছে বলে আমিও দুঃখ ভোগ করতে চাই।

স্বরোচি বললেন, তুমি দুঃখ ত্যাগ কর। আয়ুর্বেদের প্রভাবে আমি তোমার সখীদের পুনরায় নব কলেবর করব।

তারপর পিতা স্বয়ং উপস্থিত থেকে সেই কন্যাকে সম্প্রদান করলে স্বরোচি তাকে পরিগ্রহ করলেন। গন্ধর্ব তাঁর নিজের পুরে ফিরে গেলেন এবং স্বরোচি সেই কন্যার সঙ্গে সখীদের কাছে গিয়ে ঔষধ ও রস প্রয়োগ করে উভয়কেই নীরোগ করলেন।

ব্যাধি মুক্ত হয়ে প্রথম কন্যা হর্ষাবিষ্ট হয়ে স্বরোচিকে বলল, আপান আমার উপকার করেছেন, এজন্য আমি আপনাকে আত্মদান করছি। আমি মন্দার বিদ্যাধরের কন্যা বিভাবরী। আপনাকে

এমন বিদ্যা প্রদান করব যার প্রভাবে আপনি সমস্ত প্রাণীর ভাষা অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

স্বরোচি এতে সম্মত হলে দ্বিতীয় কন্যা বলল, আমার পিতা ব্রহ্মর্ষি পার কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং সমুদায় বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এক বসন্তে পুঞ্জিকাস্তনা নামে অপ্সরা তাঁর কাছে এসে বিষম শরের পথবর্তী করে। তাঁরই সংযোগে অপ্সরার গর্ভে আমার জন্ম। কিন্তু জননী আমাকে প্রসব করেই নির্জন অরণ্যে আমাকে বিসর্জন দিয়ে যান। আমি হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে পড়ে থেকে চন্দ্রের বর্ধমান কলা পান করে বড় হতে লাগলাম। তাই পিতা আমাকে গ্রহণ করে কলাবতী নাম রাখলেন। অলি নামে এক অসুর আমাকে প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু পিতা সম্মত না হওয়াতে সে শাপ দিয়ে তাঁকে বিনিপাতিত করে। এর জন্য আমি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে শিবের পত্নী সতী আমাকে প্রতিষেধ করে বলেন, তুমি শোক কোরো না, স্বরোচি তোমার স্বামী হবেন এবং মনু তাঁর পুত্র রূপে জন্মাবেন। যে বিদ্যার বলে এই প্রকার ঘটবে সেই পদ্মিনী বিদ্যা আমি তোমাকে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই স্বরোচি। আপনি আমাকে প্রাণ দান করেছেন বলে আমি আজ আপনাকে সেই বিদ্যা ও নিজের দেহ প্রদান করব। আপনি প্রতিগ্রহ করে প্রসাদ বিতরণ করুন।

স্বরোচি কলাবতীকেও বললেন, তাই হবে। তারপর বিভাবরী ও কলাবতী উভয়েরই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অনুমোদিত হয়ে উভয়েরই পাণি গ্রহণ করলেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এর পর স্বরোচি তাঁর পত্নীদের সঙ্গে রমণীয় কানন ও নির্ঝর শোভিত শৈলে বিহার করতে লাগলেন। পদ্মিনীর বশবর্তী নিধিরা যাবতীয় উপভোগের দ্রব্য সংগ্রহ করে আনতে লাগল। একদিন এক কলহংসী তাদের দাম্পত্য প্রণয় দেখে এক চক্রবাকীকে বলল, স্বরোচিই ধন্য। যৌবনে পদার্পণ করেই ইনি

এমন প্রণয়িনী সহধর্মিণীদের সঙ্গে সম্ভোগ করছেন। সংসারে অল্পই পতি পত্নী এমন শোভা সম্পন্ন হয়ে থাকেন। কোন পতি পত্নীকে ভালবাসেন, বা পত্নী পতিকে ভালবাসেন। কিন্তু দম্পতির এমন পরস্পর অনুরাগ দুর্লভ। তাই বলি স্বরোচিই ধন্য।

কলহংসীর কথা শুনে চক্রবাকী বলল, এ ব্যক্তি ধন্য নন। অন্য স্ত্রীর নিকটে এঁর লজ্জা হয় না, অন্য স্ত্রীকেও ইনি ভোগ করে থাকেন। সকলের প্রতি এঁর মন নেই। কেমন করে ইনি সব স্ত্রীতে অনুরাগী হবেন! এঁর স্ত্রীরা পরিজনের মতো। ইনি নিশ্চয়ই বিদ্যার মূল্য স্বরূপ নিজেকে দাসের মতো বিক্রয় করেছেন। বহু স্ত্রীর নায়ক কখনও সমান প্রেমের প্রেমিক হতে পারে না। আমি ও আমার পতিই ধন্য। আমাদের পরস্পরের মন চিরকাল একজনেই আসক্ত।

প্রাণীর ভাষা স্বরোচি বুঝতেন। সেজন্য এ কথায় লজ্জিত হয়ে ভাবলেন যে চক্রবাকী সত্য বলেছে, মিথ্যা নয়। শতবর্ষ পরে পত্নীদের সঙ্গে বিহার করতে করতে এক মৃগকে দেখলেন। নিজেকে মৃগী পরিবেষ্টিত দেখে সে বলল, আমাকে স্বরোচি পাও নি এবং আমার চরিত্র তার মতো নয়। তোমাদের মতো নির্লজ্জ অনেক আছে, তোমরা তাদের কাছে যাও। এক স্ত্রী অনেক পুরুষের অনুগত হলে যেমন অবজ্ঞার পাত্রী হয়, তেমনি এক পুরুষ অনেক স্ত্রীর ভোগের সামগ্রী হলে হাস্যাস্পদ হয়। তাতে ধর্মেরও হানি হয়। কারণ সে এক স্ত্রীতে আসক্ত ও অন্য স্ত্রীতে কামাসক্ত হয়। তোমরা সেই রকম লোকের কাছেই যাও। আমি স্বরোচির মতো নই।

এই কথা বলে হরিণ মৃগীদের প্রত্যাখ্যান করতে আরম্ভ করলে স্বরোচি নিজের আত্মাকে পতিতের মতো বোধ করলেন। তিনি সব পত্নীকেই ত্যাগ করতে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু পুনরায় পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হতেই কাম প্রবল হয়ে উঠল এবং সমুদায় নির্বেদ বাক্য বিসর্জন দিয়ে ছয় শো বছর তাদের সঙ্গে বিহার করে যাপন করলেন।

তাঁর তিনটি পুত্র হল। মনোরমার পুত্র বিজয়, বিভাবরীর পুত্র মেরুনন্দ এবং কলাবতীর পুত্রের নাম হল প্রভাব। পদ্মিনী বিদ্যার সাহায্যে স্বরোচি প্রাচী দিকে কামরূপে পর্বতের উপরে বিজয় নামে পুর দিলেন, উদীচী দিকে মেরুনন্দকে দিলেন নন্দবতী নামে পুরী এবং প্রভাবকে দক্ষিণাপদে তাল নামে এক পুর দিলেন। তারপর পত্নীদের সঙ্গে আবার বিহার করতে লাগলেন।

একদিন অরণ্যে এক বরাহ দেখে তিনি ধনু আকর্ষণ করলেন। তৎক্ষণাৎ এক হরিণাঙ্গনা এসে বলল, ওকে বিনাশ করে কী হবে! আপনি আমার দিকে শর নিক্ষেপ করে আমার দুঃখ দূর করুন। স্বরোচি বললেন, তোমার শরীরে তো কোন রোগ নেই। তবে তুমি কেন প্রাণ দিতে চাও? মৃগী বলল, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত একজনের প্রতি আমার মন বদ্ধ হয়েছে। তার বিরহে মৃত্যু ছাড়া আর কী ঔষধ আছে! স্বরোচি বললেন, কে তোমাকে কামনা করে না? এমন কার প্রতি তুমি অনুরক্ত হয়েছ যে তাকে না পেয়ে নিজের প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছ? মৃগী বলল, আমি আপনাকেই কামনা করি, আপনিই আমার মন হরণ করেছেন। স্বরোচি বললেন, তুমি মৃগী আর আমি মানুষ। তোমার সঙ্গে কী ভাবে আমার সমাগম হতে পারে! মৃগী বলল, আমাকে আলিঙ্গন করুন, তাতেই আমি সম্মানিত বোধ করব। স্বরোচি হরিণাঙ্গনাকে আলিঙ্গন করতেই সে দিব্য দেহ ধারণ করল। তাই দেখে স্বরোচি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? হরিণী লজ্জিত ভাবে বললেন, আমি এই অরণ্যের দেবতা। দেবতারা আমাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমাকে মনুর জন্ম দিতে হবে। তাই দেবতাদের কথায় আমি আপনাকে মনুর জনক হতে বলছি।

মার্কণ্ডেয় বললেন, স্বরোচি তাঁর গর্ভে তৎক্ষণাৎ এক পুত্র উৎপন্ন করলেন। পুত্রের জন্ম হতেই দেব বাদ্য বেজে উঠল, গন্ধর্বরা গান ও অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগল। পুষ্পবর্ষণ করলেন দেবতারা। পিতা

তাঁর নাম রাখলেন দ্যুতিমান। স্বরোচির পুত্র বলে ইনি স্বরোবিষ নামে বিখ্যাত হলেন।

তারপর স্বরোচি রমণীয় গিরি নির্ঝরে বিহার করতে করতে এক হংস দম্পতীকে দেখতে পেলেন। হংসী বারংবার হংসের প্রতি অভিলাষ পরবশ হওয়ায় হংস তাকে বলল, আর কেন, আত্মাকে এবার সংযত কর। আমি তো বহু কাল তোমার সঙ্গে বিহার করেছি। তোমারও চরম বয়স আসন্ন। চিরকাল ভোগ করে আর কী হবে!

হংসী বলল, ভোগের জন্যই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভোগের আবার অকাল কী!

হংস বলল, ভোগ সুখে যারা আসক্ত হয়ে থাকে, তারা কখন পরমার্থ পথের অনুসরণ করবে! তুমি স্বরোচিকে দেখছ না! বাল্যকাল থেকে অনুরাগবদ্ধ ও কামাসক্ত, যৌবনে পত্নীদের প্রণয়ে এবং এখন পুত্রাদির স্নেহে মগ্ন হয়ে আছে। কী ভাবে সে উদ্ধার পাবে! আমি স্বরোচির মতো স্ত্রীর বাধ্য নই। আমার বিবেক জন্মেছে, তাই ভোগ সুখে নিবৃত্ত হয়েছি।

পক্ষীদের এই কথা শুনে স্বরোচির উদ্বেগ হল, তিনি পত্নীদের নিয়ে তপশ্চরণের জন্য তপোবনে গেলেন। সেখানে কঠোর তপস্যা করে সর্বতোভাবে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে তিনি অমর লোকে গেলেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, স্বরোচির পুত্র দ্যুতিমানকে ব্রহ্মা মনুর পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পারাবত ও তুষিতগণ এই মন্বন্তরের দেবতা এবং বিপশ্চিৎ ইন্দ্রের নাম। সপ্তর্ষিদের নাম উর্জ স্তম্ব প্রাণ দত্তোলি ঋষভ নিশ্চর ও অর্ববীরান। এঁরা বীর্যবান ও পৃথিবীর পরিচালক ছিলেন। যত দিন এই মন্বন্তর ছিল, ততদিন তাঁরা সমগ্র পৃথিবী ভোগ করেছিলেন।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, এবারে আপনি পদ্মিনী বিদ্যার আশ্রিত নিধির বৃত্তান্ত বলুন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন লক্ষ্মী।

পদ্ম মহাপদ্ম মকর কচ্ছপ মুকুন্দ নন্দ নীল ও শঙ্খ এই আট নিধি তাঁরই আশ্রিত। ঋদ্ধি বা সমৃদ্ধির আবির্ভাব যেখানে, সেখানেই নিধির আবির্ভাব এবং সিদ্ধির আবির্ভাবও সেখানে। দেবতার প্রসন্নতা ও সাধুসেবায় এই নিধির দৃষ্টিপাত হলেই লোকের বিত্তাগম হয়। পদ্ম-নিধি ময়ের অধিকৃত এবং তারই বংশধররা এই নিধি ভোগ করে। ইহা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতুর ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় হয়, যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও দেবালয় প্রতিষ্ঠাও হয়। মহাপদ্ম নিধিও সত্ত্বগুণের আধার। এর অধিষ্ঠান হলে লোকে মুক্তা প্রবাল পদ্মরাগাদি রত্ন ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় করে এবং পরজন্মে যোগশীল হয়ে জন্মে যোগীদের তা দান করে। তার সাত পুরুষকে এই নিধি ত্যাগ করে না। মকর তম প্রধান নিধি। এর প্রভাবে অস্ত্র ভোগ ও রাজার সঙ্গে মিত্রতা হয়। শস্ত্র ক্রয় বিক্রয়েই তার প্রীতি জন্মে এবং একমাত্র তারই ভোগ হয় ও সংগ্রাম বা দস্যুর হাতে সব বিনষ্ট হয়। কচ্ছপ নামের নিধিও তম প্রধান। এর প্রভাবে কাউকে সে বিশ্বাস করে না, নষ্ট হবার ভয়ে কাউকে কিছু দেয় না ও নিজেও ভোগ করে না। সবই পুঁতে রাখে, ভোগ করে এক পুরুষ। মুকুন্দ নিধি রজগুণময়। তাই স্বভাবে রজগুণের প্রভাবে বেণু বীণা মৃদঙ্গ প্রভৃতি উপভোগ করে এবং গায়ক ও নর্তকদের বিত্ত দান করে। নন্দ নিধি রজ ও তম উভয় গুণময় বলে এর প্রভাবে ধাতু রত্ন পুণ্য ও ধান্যাদির সংগ্রহ ও ভোগ হয়ে থাকে এবং এই সবই সর্বদা ক্রয় বিক্রয় করে। স্বজন ও অভ্যাগত সবাইকে সে আশ্রয় দেয়। অপমান তার সহ্য হয় না, স্তবে তুষ্ট হয়ে যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করে। তার অনেক সুন্দরী পত্নী হয় এবং সাত পুরুষ ধরে এই নিধি ভোগ করে। কিন্তু পরলোকে এর আদর নেই। নীল নিধির সত্ত্ব ও রজ এই দুই গুণ। এর দৃষ্টিতে বস্ত্র ধান ফল ফুল মুক্তা ও জলজাত দ্রব্যের ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় হয়। সে পুষ্করিণী ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা এবং সেতু নির্মাণ করে। তিন পুরুষ এই নিধি ভোগ করে। শঙ্খ নিধি রজস্তমময়।

এক পুরুষ এই নিধি ভোগ করে। সে আত্মপোষণ পরায়ণ হয়ে নিজে ভাল খায় ও পরে, কিন্তু স্ত্রীপুত্র পরিজনকে কিছু দেয় না।

উত্তমের উপাখ্যান

ক্রৌষ্টুকি বললেন, এইবারে আপনি তৃতীয় মন্বন্তর উত্তমের কথা বলুন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, উত্তানপাদের পুত্রের নাম উত্তম, সুরুচি তাঁর মা। তিনি মহাবলশালী ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি বভ্রুর কন্যা বহুলার পাণিগ্রহণ করেন। বহুলা যেমন অতি প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তেমনি রাজাও সেই সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর শ্রুতিকটু বাক্য রাজার নিকট মধুর মনে হত এবং যৎপরোনাস্তি অপমানও সম্মান বলে মনে করতেন। রাজা উৎকৃষ্ট আভরণ দিলেও রাণী তা অবজ্ঞা করতেন। একদিন রাজা মদ্যপানের সময়ে এক পাত্র রাণীর হাতেও দিলেন। সেখানে প্রধান বারাঙ্গনারা গান গাইছিল, ভূমিপালেরাও সমবেত ছিলেন। সবার সামনে তিনি এই পানপাত্র দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁরা দেখলেন যে রাজার প্রতি বীতরাগ বশে রাণী তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এর জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা দ্বারপালকে ডেকে বললেন, তুমি একে বনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এসো। দ্বারপাল কোন বিচার না করে রাণীকে রথে চড়িয়ে বনে ছেড়ে দিয়ে এল। রাজার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে রাণী এটা পরম অনুগ্রহ বলে মনে করলেন। কিন্তু রাজা দুঃখে আর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করলেন না, তাঁরই চিন্তায় মগ্ন থেকে ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বললেন, রাত্রে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘরের দ্বার ছিল খোলা। এই সুযোগে কেউ আমার স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে আপনি তাকে এনে দিন।

রাজা বললেন, আপনি তো জানেন না কে আপনার স্ত্রীকে হরণ

করে কোথায় নিয়ে গেছে। কার বিরুদ্ধে যাত্রা করে কোথা থেকে আপনার স্ত্রীকে আনব ?

ব্রাহ্মণ বললেন, রাত্রে কপাট বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকলে কেউ যদি কারও স্ত্রীকে হরণ করে, আপনি কি তা জানতে পারেন! আমাদের কাছে আপনি যে ষড়ভাগ নেন, সেই বেতন নিয়ে সবাইকে রক্ষা করেন। তাইতেই তো আমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই!

রাজা বললেন, আপনার স্ত্রীকে আমি কখনও দেখি নি। তাই তাঁর বয়স দেহ রূপ ও স্বভাব চরিত কেমন তাই বলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁর দেহ উন্নত, বাহু হ্রস্ব, মুখ কৃশ ও চোখ কঠোর এবং রূপ বিরূপ। আমি তাঁর নিন্দা করছি না, তিনি বাস্তবিকই কুরূপ, অতিশয় অপ্রিয় দর্শন। তাঁর কথাও কর্কশ এবং তিনি সুশীলা নন। তাঁর প্রথম বয়স কিছু অতীত হয়েছে।

রাজা বললেন, এরকম স্ত্রীর আর আপনার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে অন্য স্ত্রী এনে দেব। স্ত্রী সর্বলক্ষণ যুক্ত হলেই সুখ এবং আপনার স্ত্রীর মতো হলেই দুঃখ। সুন্দর রূপ ও সুশীলতা এই দুটিই কল্যাণের কারণ। তাই রূপ ও শীলবিহীন হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করাই বিধেয়।

ব্রাহ্মণ বললেন, রাজা, স্ত্রীকে রক্ষা করা যে সর্বথা কর্তব্য—এই লোকপ্রবাদ কি প্রচলিত নেই! আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, তাই স্ত্রীকে রক্ষা করাই কর্তব্য। যার স্ত্রী নেই, তার সারাক্ষণ কর্মহানি হয়। এইজন্যই আমার স্ত্রীর রূপগুণ আপনাকে বললাম। আপনি তাকেই এনে দিন।

এ কথা শুনবার পর রাজা রথে আরোহণ করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এক সময় অরণ্যে এক রমণীয় তপোবন দেখে সেখানে নেমে দেখলেন যে একজন ঋষি কুশাসনে বসে নিজের তেজে যেন জ্বলছেন। রাজাকে দেখে তিনি উঠে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে শিষ্যকে অর্ঘ্য আনতে বললেন। শিষ্য তাঁকে ধীরে ধীরে বলল,

এঁকে কী রকম অর্ঘ্য দেওয়া হবে আজ্ঞা করুন। ঋষি রাজার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সম্ভাষণ ও আসন দিয়ে সম্মান রক্ষা করে বললেন, আমি জানি আপনি উত্তানপাদের পুত্র উত্তম। কী অভিপ্রায়ে এখানে এসেছেন বলুন।

রাজা বললেন, কোন ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। তার কোন বৃত্তান্ত আমার জানা নেই। তবু আমি তারই অন্বেষণে এখানে এসেছি। আপনার গৃহে আমি অভ্যাগত। তাই প্রণাম করে যা জিজ্ঞাসা করছি, অনুগ্রহ করে আপনাকে তা বলতে হবে।

ঋষি বললেন, শঙ্কা ত্যাগ করে প্রশ্ন করুন।

রাজা বললেন, প্রথম দর্শনেই আপনি আমাকে অর্ঘ্য দানে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন তা দেওয়া হল না?

ঋষি বললেন, আপনাকে দেখেই আমি পূর্বাপর না ভেবে মনের আবেগে শিষ্যকে আজ্ঞা করেছিলাম। এই শিষ্য আমারই প্রসাদে জগতের যাবতীয় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনা আমার মতোই বিদিত আছে। তাই সে 'আজ্ঞা করুন' বলাতেই আমার চৈতন্য হয়। সেই জন্যই আমি আপনাকে বিধান অনুসারে অর্ঘ্য দিই নাই। আপনি স্বায়ম্ভুব বংশে জন্মে অর্ঘ্যের যোগ্যপাত্র হলেও আমরা আপনাকে অর্ঘ্যযোগ্য মনে করি না।

রাজা বললেন, আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এমন কী করেছি যে বহুকাল পরে এসেও অর্ঘ্যের যোগ্য হলাম না?

ঋষি বললেন, আপনি কি ভুলে গেছেন যে আপনি আপনার পত্নীকে অরণ্যে ত্যাগ করেছেন! আপনি শুধু পত্নীকে নয়, সেই সঙ্গে ধর্মও ত্যাগ করেছেন। এক পক্ষ নিত্য কর্ম না করলেই লোকে অস্পৃশ্য হয়। কিন্তু আপনি এক বৎসর নিত্যকর্ম করেন নি। স্বামী দুঃশীল হলেও পত্নীকে যেমন অনুকূলচারী হতে হয়, তেমনি স্ত্রী দুঃশীল হলেও তাকে পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। সেই ব্রাহ্মণকে দেখুন,

ধর্মের জন্যই তিনি প্রতিকূলচারী স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। আপনি রাজা, উৎপথে প্রবৃত্ত লোককে আপনি স্বধর্মে আনেন, কিন্তু নিজে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে লোকে আপনাকে মানবে কেন?

ঋষির এই কথায় রাজা অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে বললেন, আপনি যখন জগতের সব অতীত ও অনাগত দেখতে পান তখন বলুন, ব্রাহ্মণের পত্নীকে কে হরণ করে নিয়ে গেছে।

ঋষি বললেন, অদ্রির পুত্র বলাক রাক্ষস ব্রাহ্মণীকে হরণ করেছে, আপনি উৎপলাবতক অরণ্যে তাকে আজ দেখতে পাবেন। সেখানে গিয়ে শীঘ্র আপনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সংযোগ সাধন করুন। ব্রাহ্মণকে যেন আপনার মতো পাপের ভাগী না হতে হয়।

মার্কণ্ডেয় বললেন, ঋষিকে প্রণাম করে রাজা রথারোহণে উৎপলাবতক বনে সমাগত হলেন। দেখলেন যে ব্রাহ্মণ যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী অবিকল সেইরূপ। তিনি শ্রীফল খাচ্ছিলেন দেখে রাজা বললেন, স্পষ্ট বল তো, তুমিই কি বিশালের পুত্র সুশর্মার পত্নী?

ব্রাহ্মণী বললেন, আমি অতিরাতের কন্যা এবং যে নাম করলেন সেই বিশালের পুত্রই আমার স্বামী। নিদ্রিত অবস্থায় দুরাত্মা বলাক রাক্ষস আমাকে হরণ করে এনেছে। সে আমাকে এই বনে এনে ছেড়ে দিয়েছে। সে আমাকে ভক্ষণ করে নি, উপভোগও করে নি। কী জন্য এনেছে, তা জানি না।

রাজা বললেন, তোমার স্বামী আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। তুমি কি জানো রাক্ষস তোমাকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেছে?

ব্রাহ্মণী বললেন, রাক্ষস এই বনেরই প্রান্তে আছে। বলে পথ দেখিয়ে দিলে রাজা বনে প্রবেশ করে দেখলেন যে বলাক তার পরিবারবর্গে বেষ্টিত হয়ে আছে। রাজাকে দেখবামাত্র তাড়াতাড়ি উঠে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে এগিয়ে এসে বলল, মহারাজ, আমার গৃহে

পদার্পণ করে আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। আমি আপনার রাজ্যে বাস করি, আপনার ভৃত্য। আপনি আমার প্রভু। এই আসনে বসে অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। তারপর আমি কি করব আজ্ঞা করুন।

রাজা বললেন, অতিথি সৎকারে তোমার ত্রুটি হয় নি। এবারে তুমি বল, কেন তুমি এক ব্রাহ্মণের পত্নীকে হরণ করে এনেছ! যদি স্ত্রী চাও তো ইনি সুরূপা নন, সুরূপা রমণী অনেক আছে। আর যদি খাবার জন্য এনে থাকো তো কেন খাও নি?

রাক্ষস বলল, অন্যান্য রাক্ষসরা মানুষ খায় বটে, কিন্তু আমরা মানুষ খাই না। আমরা পুণ্যের ফল খাই, সম্মানিত বা অপমানিত হলে নরনারীর স্বভাব ভক্ষণ করি। তাদের ক্ষমা গুণ ভক্ষণ করলে তারা ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু তাদের দূষিত স্বভাব ভক্ষণ করলে তারা পুণ্যবান হয়। রাজা, আমাদের গৃহে আপনার মতো সুন্দরী আছে, তাই নারীতে আমাদের আসক্তি নেই।

রাজা বললেন, তবে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে কেন একে হরণ করে এনেছ?

রাক্ষস বলল, এঁর স্বামী মন্ত্র জানেন। আমি যে যজ্ঞেই যাই, তিনি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করে সেখান থেকেই আমাকে উচ্চাটন করেন। তাতে আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তিনি যদি সব যজ্ঞেই ঋত্বিক হন, তবে আমরা কোথায় যাব! পত্নী ছাড়া পুরুষ যজ্ঞের যোগ্য হয় না বলেই আমি এই কাজ করেছি।

ব্রাহ্মণকে বিকল করা হয়েছে শুনে রাজা বিষণ্ণ হলেন। তিনি ভাবলেন যে রাক্ষস তাঁকেও নিন্দা করছে। রাক্ষস পুনরায় প্রণতি করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলল, আমাকে আজ্ঞা করে অনুগৃহীত করুন।

রাজা বললেন, তুমি স্বভাব ভক্ষণ কর বললে, আজ এই ব্রাহ্মণীর দুঃশীলতা ভক্ষণ করে তাঁকে তাঁর গৃহে রেখে এসো।

রাক্ষস তখনই মায়ার বলে ব্রাহ্মণীর অন্তরে প্রবেশ করে তার দুঃশীলতা ভক্ষণ করতেই ব্রাহ্মণী বললেন, এই রাক্ষসের দোষ নেই,

অপরাধ কারও নয়। অন্য জন্মে আমিই বোধহয় কারও বিরহযোগ সাধন করেছিলাম, তাই এ জন্মে আমার নিজেরই তা ঘটল।

রাক্ষস বলল, আপনার আদেশে আমি এঁকে এঁর স্বামীর গৃহে নিয়ে যাচ্ছি। আর কী করতে হবে বলুন।

রাজা বললেন, তাতেই আমার সকল কাজ করা হবে। পরে তোমাকে স্মরণ করলে এসো।

'যে আজ্ঞা' বলে রাক্ষস ব্রাহ্মণীকে তাঁর স্বামীর গৃহে পৌঁছে দিল।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এরপর রাজা তাঁর কী করা উচিত তা জানবার জন্য রথে চড়ে সেই ত্রিকালদর্শী ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। রথ থেকে নেমে ঋষিকে প্রণাম করে তাঁকে রাক্ষসের বৃত্তান্ত বললেন।

ঋষি বললেন, আমি সবই জানি এবং আমার কাছে কেন এসেছেন তাও জানি। আপনাকে যা করতে হবে তাই বলছি। স্ত্রী ধর্মার্থকাম পুরুষের শক্তি। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি ধর্মত্যাগী হয়েছেন। অপত্নীক মানুষ নিজ কর্মের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রে কোন প্রভেদ নেই। পত্নীকে ত্যাগ করে আপনি ভাল কাজ করেন নি। স্বামী যেমন স্ত্রীর অত্যাজ্য, তেমনি স্ত্রী ত্যাগ করাও স্বামীর কর্তব্য নয়।

রাজা বললেন, আমার কর্মবিপাকেই এই অশোভন সংঘটন হয়েছে। আমি অনুকূল হলেও সে প্রতিকূল ছিল এবং বিরহ যন্ত্রণার ভয়েই আমি সব জ্বালা সহ্য করেছিলাম। সম্প্রতি তাকে বনে পাঠিয়েছি। সে কোথায় গেছে, না বাঘ সিংহ বা রাক্ষসের পেটে গেছে, তাও জানি না।

ঋষি বললেন, রাজা, কেউ তাঁকে ভক্ষণ করে নি। পাতিব্রত্য রক্ষা করে তিনি এখন রসাতলে আছেন।

রাজা বললেন, কে তাকে পাতালে নিয়ে গেল? কেমন করেই বা সে শুদ্ধাচারী হয়ে সেখানে বাস করছে?

ঋষি বললেন, আপনি তাঁকে অরণ্যে ত্যাগ করলে পাতালের

নাগরাজ কপোতক তাঁকে দেখতে পান। সমস্ত ঘটনা জানবার পর তিনিই অনুরাগ ভরে আপনার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে পাতালে নিয়ে গেছেন। নাগরাজের স্ত্রীর নাম মনোরমা এবং নন্দা তাঁদের কন্যা। পাছে তার মায়ের সপত্নী হন, এই ভয়ে সেই কন্যা আপনার স্ত্রীকে অন্তঃপুরে গোপন করে রেখেছেন। পিতার প্রার্থনায় উত্তর না দেওয়ার জন্য পিতা তাকে 'মূক হও' বলে শাপ দিয়েছেন।

রাজা হর্ষাবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সকলেই তো আমাকে অকৃত্রিম ভালবাসেন; কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসা সত্ত্বেও কেন আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন?

ঋষি বললেন, পাণিগ্রহণের সময় আপনার প্রতি সূর্য মঙ্গল ও শনির দৃষ্টি এবং আপনার স্ত্রীর প্রতি শুক্র ও বৃহস্পতির দৃষ্টি ছিল। সেই মুহূর্তেই আপনার দিকে চন্দ্র ও আপনার পত্নীর দিকে বুধ ছিলেন। এঁরা পরস্পর বিপক্ষভাবে আপনাদের বিরুদ্ধে অবস্থিতি করেছিলেন। এইজন্যই আপনাদের এই অনিষ্ট হয়েছে। তাই এখন আবার পত্নী সহায় হয়ে ধর্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে পৃথিবী পালন করুন।

ঋষির এই কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করে রাজা রথারোহণে নিজের পুরে ফিরে এলেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, স্বনগরে ফিরে রাজা দেখলেন যে ব্রাহ্মণ তাঁর সুশীলা পত্নীর সহবাসে পরম হর্ষে আছেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনি ধর্মজ্ঞ, তাই আমার পত্নীকে এনে দিয়ে ধর্ম রক্ষা করেছেন।

রাজা বললেন, আপনি নিজের ধর্ম পালন করে কৃতার্থ হয়েছেন। কিন্তু আমার গৃহ গৃহিণীশূন্য বলে আমি বড় সঙ্কটে পড়েছি।

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনি ক্রোধের বশে ধর্মের হানি করেছেন। কিন্তু অরণ্যে যদি রাণীকে কোন পশু ভক্ষণ করে থাকে তো আপনি আবার কেন দার পরিগ্রহ করছেন না?

রাজা বললেন, তিনি বেঁচে আছেন এবং তাঁর চরিত্রও দূষিত হয় নি। তাই আমি এখন কী করব?

ব্রাহ্মণ বললেন, তবে কেন তাঁকে পরিত্যাগ করে পাপের অনুষ্ঠান করছেন!

রাজা বললেন, তাঁকে ফিরিয়ে আনলেও আমার প্রতি তিনি সর্বদা প্রতিকূল ব্যবহার করবেন। তাতে দুঃখ ছাড়া সুখ হবে না। তিনি যাতে আমার বশ হন, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, মিত্রকাম পুরুষেরা যে অনুষ্ঠান করেন, আমি সেই যজ্ঞ করব। এর নাম মিত্র বিন্দা। এতেই রাণী আপনার প্রতি প্রীতিমতী হবেন। আপনি তাঁকে এইখানে এনে দেখুন যে আপনার প্রতি তাঁর প্রীতির সঞ্চার হয়েছে।

রাজা বহুবিধ দ্রব্য এনে দিলে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করলেন। সাতবার যজ্ঞ করার পর রাজাকে বললেন, এইবারে আপনি রাণীকে এনে ভোগ সম্ভোগ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করুন।

রাজা তখন সেই রাক্ষসকে স্মরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ রাক্ষস রাজার নিকটে এসে প্রণিপাত করে বলল, আজ্ঞা করুন। রাজা তাকে সব কথা বলতেই সে পাতালে গিয়ে রাণীকে নিয়ে এল। রাণী অতি প্রণয় ও প্রীতি সহকারে রাজাকে দেখে আহ্লাদিত হয়ে বার বার বলতে লাগলেন, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। রাজা সাগ্রহে ও সানুরাগে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েই আছি। রাণী বললেন, তাহলে আপনার নিকটে যা চাইছি, তা দিন। রাজা বললেন, নিঃশঙ্কে বল। তোমার কোন অভিলাষের বস্তুই অলভ্য থাকবে না। রাণী বললেন, নাগরাজ তাঁর কন্যা আমার সখীকে আমার জন্যই শাপ দিয়েছেন। তাতে সে মূক হয়ে আছে। তার মূকত্বের শান্তির জন্য প্রতিক্রিয়া করুন।

রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মূকত্বের শান্তির জন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে?

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনার আদেশে আমি সারস্বতী নামের যজ্ঞ করব। তাতেই আপনার পত্নী ঋণমুক্ত হবেন।

তারপর ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে সমাহিত চিত্তে সারস্বত সূক্ত জপ করতে লাগলেন। তাতেই নাগরাজ কন্যার বাক্‌শক্তি ফিরে এলে গর্গ তাঁকে বললেন যে তোমার সখীর স্বামীই তোমার এই দুষ্কর উপকার করলেন। এই কথা জেনেই নন্দা দ্রুতবেগে এসে রাণীকে আলিঙ্গন করে রাজাকে বললেন, আপনি আমার যে উপকার করলেন তাতে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে। আমি বলছি, আপনার এক বীর পুত্র জন্মাবে, তার চক্র সমগ্র ভুবনে অপ্রতিহত হবে। সে সর্ব-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর হবে এবং মন্বন্তরের ঈশ্বর ও মনু হবেন। নন্দা তাঁদের এই বর দিয়ে সখীকে আলিঙ্গন করে পাতালে ফিরে গেলেন।

এদিকে পত্নীর সঙ্গে বিহার ও প্রজা পালন করে রাজার বহুকাল অতীত হল। তারপর এক পূর্ণিমায় রাজার এক পুত্র জন্মাল। আকাশ থেকে দেব দুন্দুভির সঙ্গে পুষ্প বৃষ্টি হল। মুনিরা এসে তাঁর নামও উত্তম রাখলেন। তাঁরা বললেন যে এই পুত্র উত্তম বংশে উত্তম সময়ে উত্তম কলেবরে জন্মেছেন বলে উত্তম নামেই বিখ্যাত হবেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, উত্তমের এই পুত্রই উত্তম নামে মনু হয়েছিলেন। এই তৃতীয় মন্বন্তরে স্বধামা নামে দেবতারা ও সত্য নামে অন্য দেবতারা আবির্ভূত হন। শিব নামে অন্য দেবতাদেরও আবির্ভাব হয়েছিল। প্রতর্দন নামে দেবতারাও এই মন্বন্তরে চতুর্থ গণ বলে কথিত। আর এক গণের দেবতারা হলেন বশবর্তী। এই পাঁচ দেবগণই যজ্ঞভুক। এই মন্বন্তরে সবসুদ্ধ দ্বাদশ দেবগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের ইন্দ্রের নাম সুশান্তি। এই মনুর পুত্রদের নাম অজ পরশুচি ও দিব্য। এঁদের বংশই এই মন্বন্তরে পৃথিবী পালন করেছিলেন। এঁর সাত পুত্রই তপস্যার তেজে সপ্তর্ষি হয়েছিলেন।

তামসের উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় বললেন, পৃথিবীতে স্বরাষ্ট্র নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। যুদ্ধে তিনি কখনও পরাজিত হন নি। তিনি পরম জ্ঞানী ছিলেন এবং অনেক যজ্ঞ করেছিলেন। মন্ত্রীর আরাধনায় সূর্য তাঁকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তাঁর পত্নী ছিল একশো, কিন্তু তাঁরা তেমন দীর্ঘায়ু হতে পারেন নি বলে তাঁর আগেই মারা যান। মন্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনরাও আগে মারা যান। এই সব কারণে রাজা বীর্যহীন হবার জন্য বিমর্দ নামে একজন তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে। বিষণ্ণ মনে তিনি বিতস্তার তীরে গিয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ও শীতে জলশায়ী হয়ে আহার ত্যাগ করে তপস্যা আরম্ভ করলে বর্ষায় অনবরত বর্ষণে পৃথিবী জলে প্লাবিত হল। ঘোর অন্ধকারে সমুদয় অনুলিপ্ত হলে কেউ কোন দিক জানতে পারল না। রাজা জলপ্রবাহে ভেসে যেতে লাগলেন, নদীর তট খুঁজে পেলেন না। দূরে গিয়ে নদীর জলেই এক মৃগীকে পেয়ে তার পুচ্ছ ধরলেন। সেই পুচ্ছ ধরে ভেলার মতো ভেসে যাবার পরে তট পেলেন, কিন্তু তা দুস্তর পঙ্ক। তপস্যায় কৃশ হয়েছিলেন বলেই মৃগী তাঁকে টেনে এক রমণীয় বনে নিয়ে গেল। মৃগীর পুচ্ছ স্পর্শ করে রাজার হর্ষ হল, মনে কামের সঞ্চার হতেই তিনি তার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করতে লাগলেন। মৃগী তা জানতে পেরে রাজাকে বললেন, আপনি কম্পিত হাতে আমার পৃষ্ঠদেশ কেন স্পর্শ করছেন? আপনার মন অস্থানে সঙ্গত হয় নি, আমি আপনার অগম্যা নই। কিন্তু লোল আপনার সঙ্গমে আমার ব্যাঘাত করছে।

এই কথা শুনেই রাজা কৌতূহলান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে, কেমন করে তুমি মানুষের মতো কথা বলছ? লোলই বা কে?

মৃগী বলল, রাজা, আমি আপনার স্ত্রী ছিলাম। আমি দৃঢ়ধন্বার কন্যা উৎপলাবতী। আপনার রাণীদের মধ্যে আমিই প্রধান ছিলাম।

রাজা বললেন, তুমি এমন কী করেছিলে যার জন্যে তোমার এই রূপ হল ?

মৃগী বলল, পিতার গৃহে আমি সখীদের সঙ্গে অরণ্য বিহারে গিয়ে এক মৃগকে মৃগীর সঙ্গে সমাগত হতে দেখেছিলাম। নিকটে গিয়ে মৃগীকে তাড়না করতেই সে অন্যত্র চলে যায়। এর জন্য মৃগ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, ধিক তোমার দুঃশীলতায়। তাকে মানুষের মতো কথা বলতে দেখে আমি ভয় পেয়ে বললাম, তুমি কে ? সে বলল, আমি নির্বৃতি চক্ষু ঋষির পুত্র সুতপা। মৃগীতে অভিলাষ হওয়াতে মৃগ হয়ে এর অনুগত হয়েছিলাম। এই বিয়োগ ঘটাবার জন্য আমি তোমাকে শাপ দেব। আমি বললাম, না জেনে আমি এই অপরাধ করেছি, আমাকে শাপ দেবেন না। সে বলল, তোমাকে আত্মদান করতে পারলে শাপ দেব না। আমি বললাম, কিন্তু আমি তো মৃগী নই, বনে আপনি অন্য মৃগী পাবেন। এই কথা শুনে সে সক্রোধে বলল, তুমি মৃগী নও বললে! বেশ, তুমি মৃগীই হবে। এই কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে সে স্বরূপ ধারণ করল। আমি তাকে বার বার বলতে লাগলাম, আমি বালিকা বলেই এই কথা বলেছি, আপনি প্রসন্ন হোন। পিতা বেঁচে থাকতে আমি কী ভাবে পতি বরণ করতে পারি! আমার কাতরোক্তি শুনে মুনি বলল, আমার কথার অন্যথা হবে না, পরজন্মে তোমাকে মৃগী হতেই হবে। মহর্ষি সিদ্ধবীর্যের পুত্র লোল তোমার গর্ভে জন্মাবেন। তুমি জাতিস্মরা হবে এবং গর্ভ-ধারণ করেই স্মৃতি লাভ করে মানুষের মতো কথা বলবে। লোলের জন্মের পরে তোমার মুক্তি। আর এই লোল তাঁর পিতার শত্রু বিনাশ করে পৃথিবী জয় করবেন এবং পরে মনু হবেন। এই শাপেই আমি মৃত্যুর পরে মৃগী হয়ে জন্মেছি এবং আপনার সংস্পর্শে গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আর এই জন্যই আমি বলছিলাম যে আপনার মন অস্থানে সঙ্গত হয় নি, আমি আপনার অগম্যা নই। কিন্তু লোল আমার গর্ভে বিঘ্ন করছে।

তাঁর পুত্র শত্রু জয় করে পৃথিবীতে মনু হবেন শুনে রাজা আহ্লাদিত হলেন। তারপর মৃগী সমস্ত সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করলে সকলে আনন্দিত হল। মৃগীও শাপ যুক্ত হয়ে পরলোকে গেল। ঋষিরা সমবেত হয়ে তামসী মাতার গর্ভে জন্ম বলে সেই পুত্রের নাম রাখলেন তামস। বনের মধ্যে পিতা তাকে মানুষ করে তুললে পুত্র একদিন জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমি কে এবং আমার মাতাই বা কে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে পিতা তাঁকে রাজ্যচ্যুতি থেকে আরম্ভ করে সব কথা বললেন। তা শুনে তামস সূর্যের উপাসনা করে যাবতীয় দিব্য অস্ত্র পেলেন। তারপর শত্রুজয় করে তাদের পিতার নিকটে আনলেন এবং পিতার আদেশে সবাইকে ছেড়ে দিলেন। রাজাও দেহত্যাগ করে পরলোকে গেলেন।

তার পর রাজা তামস পৃথিবী জয় করে তামস নামের মনু হলেন। এই মন্বন্তরে সত্য সুধী ও হরি প্রভৃতি সাতাশ জন দেবতা প্রাদুর্ভূত হন। শতযজ্ঞকারী শিখী দেবতাদের ইন্দ্র হলেন। জ্যোতির্ধর্মা পৃথু কাব্য চৈত্র অগ্নি বলক ও পীবর এই সাতজন সপ্তর্ষি পদ অধিকার করেন। নর ক্ষান্তি শান্ত দান্ত জানু জঙ্ঘা প্রভৃতি তামসের পুত্র। তাঁরা সকলেই রাজা হয়েছিলেন।

রৈবতের উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় বললেন, পঞ্চম মনু রৈবত নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর উৎপত্তির কথা এইবারে বলছি।

ঋতবাক নামে এক ঋষি ছিলেন। রেবতী নক্ষত্রের অন্তে তাঁর এক পুত্র জন্মে। তিনি তার জাত কর্মাদি ক্রিয়া করলেন এবং উপনয়নও দিলেন। কিন্তু পুত্র অসচ্চরিত্র হয়ে উঠল। তার জন্মের পর থেকেই ঋষির দীর্ঘ রোগ হল, তাঁর পত্নীও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট ভোগ করতে লাগলেন। এই সময়ই তাঁর পুত্র অন্য এক

মুনি পুত্রের স্ত্রীকে পরিগ্রহ করল। ঋতবাক বিষণ্ণ মনে বলতে লাগলেন,

অপুত্রতা মনুষ্যাণাং শ্রেয়সে ন কুপুত্রতা।

পুত্র না হওয়া মানুষের ভাল, কুপুত্র অমঙ্গলের কারণ। তারা পিতা মাতার আয়াস উৎপাদন করে এবং স্বর্গস্থিত পিতৃপুরুষদেরও অধঃ-পাতিত করে। কুপুত্র সুহৃদের দৈন্য, বিপক্ষের হর্ষ ও পিতা মাতার অকাল জরা উপস্থিত করে। তারপর তিনি গর্গকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যথা বিধানে ব্রত পালন করে বেদ গ্রহণের পর দার পরিগ্রহ করেছি। পুন্নাম নরকের ভয়ে পুত্রের জন্মদান করেছি, কাম চরিতার্থের জন্য নয়। তবু এই পুত্র নিজের দোষে না আমার দোষে এ রকম দুঃশীল হল ? গর্গ বললেন, তোমার এই পুত্র রেবতীর অন্তে জন্মেছেন। সেই দূষিত সময়ে জন্মের জন্যই এই রকম হয়েছে। ঋতবাক বললেন, তবে এখনি রেবতীর পতন হোক। এই শাপ দিতেই সকলে বিস্ময়া-বিষ্ট হয়ে দেখল, রেবতী নক্ষত্র কুমুদ পর্বতের সকল দিকে সহসা পতিত হয়ে সমস্ত বন কন্দর ও নির্ঝর উদ্ভাসিত করে তুলল। এর পরেই কুমুদ পর্বতের নাম হল রৈবতক এবং পৃথিবীতে এই স্থান অতি রমণীয় হল। সেই নক্ষত্রের যে কান্তি পঙ্কজিনী রূপে প্রাদুর্ভূত হল, তা থেকে এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্ম গ্রহণ করল। তাকে দেখে মহর্ষি প্রমোচ তার নাম রাখলেন রেবতী। মহর্ষির আশ্রম ছিল নিকটে। তিনি তাকে পোষণ করতে লাগলেন।

সেই কন্যা যৌবনে পদার্পণ করে আরও রূপবতী হলে ঋষি তার বিবাহের কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বহু কাল চিন্তা করেও যখন কোন বর পেলেন না, তখন অগ্নিশালায় প্রবেশ করে অগ্নিকে প্রশ্ন করলেন। অগ্নি বললেন, দুর্গম নামে মহাবল প্রিয়ভাষী ও ধার্মিক রাজা তার পতি হবেন। রাজা দুর্গম মৃগয়ায় আশ্রমের নিকটে এসেছিলেন। তিনি প্রিয়ব্রতের বংশে বিক্রমশীলের পুত্র, কালিন্দী তাঁর মা। আশ্রমে ঋষিকে দেখতে না পেয়ে রেবতীকেই তিনি

প্রিয়া সম্ভাষণ করে প্রশ্ন করলেন, মুনি কোথায়? তাঁকে আমি প্রণাম করতে চাই। ঋষি অগ্নিশালায় রাজার প্রিয়া সম্ভাষণ ও কথা শুনে সত্বর বেরিয়ে এসে রাজা দুর্গমকে দেখতে পেলেন। দেখেই শিষ্য গৌতমকে বললেন, তুমি শীঘ্র রাজার জন্য অর্ঘ্য আনো। রাজা অনেক কাল পরে এসেছেন, তার ওপর জামাতা, তাই আমার অর্ঘ্য দানের যোগ্য পাত্র। কী জন্য তাঁকে জামাতা বলা হল, রাজা তাই ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে মৌনী হয়েই অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। তারপর আসন গ্রহণ করলে ঋষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকলের মঙ্গল তো। তোমার এই পত্নী কুশলে আছেন, আমি অন্য পত্নীদের কথা জানতে চাইছি। রাজা বললেন, আপনার প্রসাদে সবই কুশল। কিন্তু এই বনে আমার পত্নী কে, তাই জানবার কৌতূহল হচ্ছে। ঋষি বললেন, ত্রিভুবনের সেরা সুন্দরী রেবতী যে তোমার স্ত্রী, তা কি তুমি জান না? রাজা তাঁর সমস্ত স্ত্রীর নাম জানিয়ে বললেন, রেবতী কে? ঋষি বললেন, তুমি যাকে এইমাত্র প্রিয়া বলে সম্বোধন করলে, তাকে কি ভুলে গেলে! রাজা বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার মনে কোন দুষ্ট ভাব নেই। আপনি রুষ্ট হবেন না। ঋষি বললেন, সত্যিই তোমার কোন দুষ্ট ভাব নেই। অগ্নির প্রেরণায় তুমি এই কথা বলেছ। আমি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কে এই কন্যার পতি হবেন? অগ্নি বলেছেন, আজই তুমি এর পতি হবে। তাই আমি তোমাকে কন্যাদান করছি, তুমি গ্রহণ কর।

রাজা মৌন হয়ে রইলেন এবং ঋষি কন্যার বৈবাহিক বিধি সাধনে উদ্যত হলেন। কিন্তু কন্যা অবনত হয়ে বলল, আপনি যদি আমার প্রতি প্রীতিমান হয়ে থাকেন, তবে রেবতী নক্ষত্রে আমার বিবাহ দিন। ঋষি বললেন, চন্দ্রের সঙ্গে অবস্থিত রেবতী নক্ষত্রের পতন হয়েছে। তোমার বিবাহের অন্যান্য অনেক নক্ষত্র আছে। কন্যা বলল, সেই নক্ষত্র ছাড়া কাল বিফল বলে আমার মনে হচ্ছে। ঋষি বললেন,

ঋতবাক নামে বিখ্যাত তপস্বী রেবতীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নিপাতিত করেছেন। এদিকে আমিও এর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাকে সম্প্রদান করব। তাই তুমি এই বিবাহে অমত করলে আমার সঙ্কট উপস্থিত হবে। কন্যা বলল, আমার পিতা কি ঋতবাক ঋষির মতো তপস্যা করেন নি! আমি কি কোন অধম ব্রাহ্মণের কন্যা? ঋষি বললেন, তুমি সামান্য তপস্বীর কন্যা নও, তুমি আমার কন্যা। আমি দেবতাদের সৃষ্টি করতে পারি। কন্যা বলল, তবে আপনি রেবতীকে পুনরায় অন্তরীক্ষে সমারোহিত করে সেই নক্ষত্রে আমার বিবাহ দিচ্ছেন না কেন? ঋষি বললেন, তাই হবে। তোমার জন্য আমি রেবতীকে পুনরায় চন্দ্রমার্গে আরোপিত করব। বলে মহর্ষি প্রমোচ তপস্যার প্রভাবে রেবতী নক্ষত্রকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় চন্দ্রের সঙ্গে সংযোজিত করে বিধান অনুসারে মন্ত্রপাঠ করে কন্যার বিবাহ দিলেন। তারপর প্রীত হয়ে জামাতাকে বললেন, তোমাকে কিরূপ যৌতুক দেব বল। দুর্লভ হলেও তা তোমাকে দেব। রাজা বললেন, আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মেছি। আপনার প্রসাদে আমি এমন পুত্র চাই যে মনু হবে। ঋষি বললেন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। মনু হয়ে তোমার পুত্র সমগ্র পৃথিবী ভোগ করবে।

রাজা তখন রেবতীকে নিয়ে নিজের পুরে ফিরে গেলেন। রেবতীর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হল, তিনিই রৈবত মনু। তিনি মানব ধর্ম বেদ বিদ্যা অর্থশাস্ত্র ও যাবতীয় শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করলেন। এই মন্বন্তরে সুমেধা নামে দেবতারা এবং বৈকুণ্ঠ ও অমিতাভ নামে রাজারা আবির্ভূত হন। বিভু দেবতাদের ইন্দ্র হয়েছিলেন। তিনি একশো যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হিরণ্যরোমা বেদশ্রী ঊর্ধ্ববাহু বেদবাহু সুধামা পর্জন্য ও বশিষ্ঠ এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। বলবন্ধু মহাবীর্য সুষষ্টব্য ও সত্যকাম্য রৈবত মনুর পুত্র।

চাক্ষুষের উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় বললেন, পাঁচটি মন্বন্তরের কথা তোমাকে বললাম। এবারে চাক্ষুষ নামে ষষ্ঠ মন্বন্তরের কথা শোন। অন্য জন্মে পরমেষ্ঠীর চক্ষু থেকে তাঁর জন্ম হয়। সেই জন্য বর্তমান জন্মেও তাঁর চাক্ষুষ নাম হয়েছিল। রাজর্ষি অনমিত্রের স্ত্রী ভদ্রা এক জাতিস্মর পুত্র প্রসব করেন। তাকে কোলে নিয়ে মা যখন অনেক আদর করছিলেন, তখন শিশু হাসছিল। মা বললেন, অকালে তোমার বোধোদয় হয়েছে দেখে আমি ভয় পাচ্ছি। পুত্র বলল, তুমি দেখছ না, সামনের ঐ বিড়ালী আমাকে খেতে চাইছে, আর জাতহারিণীও অন্তর্হিত হয়ে আছে। অথচ তুমি আমাকে দেখে এমন আনন্দ করছ দেখেই আমার হাসি পাচ্ছে। তোমরা সবাই স্বার্থ নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছ। ওরা এখনই আমাকে উপভোগ করতে চায়, আর তুমি ক্রমে ক্রমে আমাকে উপভোগ করবে। অথচ আমি কে তা তুমি জানো না। মা বললেন, আমি কোন ফলের আশায় তোমাকে আদর করি নি, নৈসর্গিক প্রীতিতেই এ রকম করেছি। তোমার যদি এতে আনন্দ না হয়, তবে ভবিষ্যতে আমার যে স্বার্থলাভের সম্ভাবনা আছে তা ত্যাগ করলাম। এই বলে তিনি পুত্রকে ত্যাগ করে সূতিকা গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মা ত্যাগ করা মাত্র জাতহারিণী তাকে হরণ করে রাজা বিক্রান্তের রাণীর শয্যার পাশে রেখে তাঁর পুত্রকে গ্রহণ করল এবং তাকেও অন্য গৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে রেখে অন্য এক পুত্রকে গ্রহণ করে ভক্ষণ করল। জাতহারিণীরা এইভাবে একটির পর একটি শিশুকে হরণ করে পরস্পর পরিবর্তনের পরে তৃতীয়টি ভক্ষণ করে।

রাজা বিক্রান্ত পরম আহ্লাদে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের পর তার নামকরণ করলেন আনন্দ। উপনয়ন সংস্কারের পর গুরু তাকে বললেন, প্রথমে মাকে বন্দনা ও অভিবাদন কর। আনন্দ গুরুর কথায় হেসে বলল, জননী অথবা পালনী, কোন্ মায়ের বন্দনা করব?

গুরু বললেন, রাজা বিক্রান্তের প্রধান রাণী জারূথের কন্যা হৈমিনী তোমার জননী, তুমি তাঁর বন্দনা কর। আনন্দ বলল, বিশাল গ্রামবাসী বোধের পুত্র চৈত্র এঁর গর্ভে জন্মেছে। গুরু বললেন, চৈত্র কে, আর তুমি কোথায় জন্মেছ এবং কোথা থেকে কেন এখানে এসেছ? আনন্দ বলল, আমার জন্ম অবনীপতি ক্ষত্রিয়ের গৃহে তাঁর পত্নী গিরিভদ্রার গর্ভে। জাতহারিণী আমাকে এখানে এনে হৈমিনীর পুত্রকে বোধের গৃহে রেখে তাঁর পুত্রকে ভক্ষণ করেছে। এবারে আপনি বলুন, আমি কোন্ মায়ের বন্দনা করব। গুরু বললেন, বৎস, আমি ভেবে কিছু স্থির করতে পারছি না। আনন্দ বলল, সংসারই এই রকম। কেউ কারও পুত্র বা বান্ধব নয়, জন্মের পরে যে সম্বন্ধ হয় মৃত্যু তা বিনাশ করে। আমি এখন তপস্যা করব, অতএব রাজার পুত্রকে আপান বিশালগ্রাম থেকে আনুন। এই কথা শুনে রাজা রাণী ও বন্ধুরা বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং আনন্দকে বনে যাবার অনুমতি দিলেন। তারপর চৈত্রকে এনে রাজযোগ্য করে পালন করলেন।

এদিকে আনন্দ বালক বয়সেই মহাবনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে মুক্তির অন্তরায় ক্ষয় করতে লাগল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাকে বললেন, বৎস, কেন তুমি তপস্যা করছ? আনন্দ বলল, মুক্তির অন্তরায় স্বরূপ কর্মের ক্ষয় ও আত্মশুদ্ধির জন্য তপস্যা করছি। ব্রহ্মা বললেন, কর্মবান ব্যক্তির সে অধিকার নেই, সে মুক্তি লাভের যোগ্য হতে পারে না। তোমাকে ষষ্ঠ মনু হতে হবে। তাই তপস্যায় তোমার প্রয়োজন নেই, মনুর কাজ করলেই তোমার মুক্তি লাভ হবে। ব্রহ্মার এই কথায় আনন্দ তপস্যায় বিরত হয়ে মনুর কাজ করতে রাজি হয়ে প্রস্থান করল।

ব্রহ্মা তাঁকে চাক্ষুষ নামে সম্বোধন করেছিলেন। তাতেই তিনি তাঁর পূর্ব নামে প্রখ্যাত হলেন। রাজা উগ্রের কন্যা বিদর্ভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। তাঁর মন্বন্তরে নয় গণে বিভক্ত আর্ধ, প্রত্যেকটি আট

গণের প্রসূত, ভব ও যূথ এবং লেখ নামের দেবতাদের আবির্ভাব হয়। যিনি শত যজ্ঞ করে তাঁদের ইন্দ্র হন, তাঁর নাম মনোজব। সুমেধা বিরজা হবিষ্মান উন্নত মধু অতিনামা ও সহিষ্ণু এঁরা এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। উরু পুরু ও শতদ্যুম্ন প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্র। সকলেই পৃথিবী পালন করেছিলেন।

বৈবস্বত ও সাবর্ণির উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় বললেন, সম্প্রতি যে মনুর আবিভাব হয়েছে তার নাম বৈবস্বত মনু। এইবারে এই মন্বন্তরের কথা বলছি।

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যের পত্নী। তাঁরই গর্ভে মনুর জন্ম। তিনি বিবস্বান বা সূর্যের পুত্র বলেই তাঁর নাম বৈবস্বত। সূর্যের দৃষ্টিপাতেই সংজ্ঞা দু চোখ নিমীলিত করতেন বলে ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্য বলেন, আমাকে দেখলেই তুমি সর্বদা নেত্র সংযম কর, তাই তুমি প্রজা সংযমন যমকে প্রসব করবে। এ কথায় ভয় পেয়ে সংজ্ঞা চপল দৃষ্টিতে তাকালেন। তাই দেখে সূর্য বললেন, এখন তুমি বিলোল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ, তোমার কন্যা হবে একটি চঞ্চল স্বভাবের নদী। এই পাপের ফলেই সংজ্ঞার যম ও যমুনা নামে পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। সংজ্ঞাও অতি কষ্টে সূর্যের তেজ সহ্য করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই তেজ সহ্য করতে না পেরে পিতার আশ্রয় গ্রহণই প্রশস্ত মনে করলেন। তখন তিনি নিজের দেহকে ছায়া রূপে নির্মাণ করে তাকে বললেন, তুমি এই গৃহে থাকবে এবং পুত্রদের প্রতি আমার মতোই ব্যবহার করবে। সূর্যকে আমার কথা বলবে না, বলবে তুমিই সংজ্ঞা। ছায়া বলল, সূর্য আমার কেশাকর্ষণ বা আমাকে শাপ না দেওয়া পর্যন্ত তোমার আদেশ পালন করব।

এর পর সংজ্ঞা পিতার গৃহে চলে এলেন। পিতা বহুমানে তাঁর পূজা করলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে বললেন, তোমাকে দেখলে আমার অনেক দিন মুহূর্তের অর্ধেক বলে মনে হয়। কিন্তু বেশি দিন

পিতার গৃহে থাকা ভাল দেখায় না, তুমি স্বামীর গৃহে যাও। আমাকে দেখবার জন্য আবার এসো। পিতার আজ্ঞায় সংজ্ঞা 'যে আজ্ঞা' বলে উত্তর কুরুতে গিয়ে বড়বা রূপ ধারণ করে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হলেন।

এদিকে দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে সূর্যের দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হল। কিন্তু ছায়া নিজের সন্তানদের মতো সংজ্ঞার সন্তানদের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করতেন না। মনু তা ক্ষমা করলেও যম তা পারলেন না, ক্রুদ্ধ হয়ে মাকে মারবেন বলে পা তুলেও সামলে নিলেন। কিন্তু তা দেখে ছায়া বললেন, আমাকে পদাঘাতে উদ্যত হয়েছিলে বলে তোমার এই পা পতিত হবে।

মায়ের এই শাপে ভীত হয়ে যম পিতাকে গিয়ে বললেন, বাৎসল্য ত্যাগ করে মা শাপ দেন, এ রকম কেউ দেখে নি। মনু বলে, উনি আমাদের মা নন। এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে।

পুত্রের এই কথা শুনে সূর্য ছায়াকে ডেকে বললেন, সংজ্ঞা কোথায় গেছেন? ছায়া বললেন, আমিই বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা, আপনার পত্নী ও এই সন্তানদের জননী। সূর্য বার বার প্রশ্ন করার পরেও ছায়া যখন সত্য কথা বললেন না, তখন তিনি শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তাই দেখে ছায়া সব কথা স্বীকার করলেন। সূর্য বিশ্বকর্মার গৃহে এসে সংজ্ঞার কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং সেখানে এসেছিলেন জেনে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন যে স্বামীর শুভাকার ও সৌম্য মূর্তি হোক এরই জন্য সংজ্ঞা বড়বার রূপ ধারণ করে উত্তর কুরুতে তপস্যা করছেন। সূর্য তাঁর তপস্যার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বিশ্বকর্মাকে বললেন, আজ আপনি আমার তেজের ক্ষয় করে দিন।

বিশ্বকর্মা তাঁর তেজ ক্ষয় করে দিলে দেবতা ও দেবর্ষিরা এসে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন, তুমি ঋক্ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সাম স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সবার আশ্রয় বা তেজে সকলকে প্রণোদিত কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানের একমাত্র

আধার, তুমি বিশুদ্ধ জ্যোতি স্বরূপ। তুমি সর্বদোষরহিত অমলাত্মা, তমোগুণের লেশমাত্র তোমার নেই। তুমি সবার বরিষ্ঠ বরেণ্য ও পরস্বরূপ পরমাত্মা। সমস্ত জগদ্ব্যাপী তোমার স্বরূপ, তুমি আত্মমূর্তি, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের কারণ ও জ্ঞানচেতাদের চরম আশ্রয়। তুমি সূর্যস্বরূপ ও প্রকাশাত্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভাস্কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি দিনকর, তোমাকে নমস্কার। তুমি না থাকলে রাত্রি সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্না হয় না, তোমাকে নমস্কার। ভগবান, তুমিই এই দৃশ্যমান বিশ্ব। তুমি ভ্রমণ ও উদ্‌ভ্রমণ প্রসঙ্গে স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আবিদ্ধ করে থাক। তোমার কিরণ স্পর্শে সবই পবিত্র হয়, জলও পবিত্র হয়। তোমার কিরণ না পেলে এই জগতে হোম দানাদি ধর্মানুষ্ঠানেও কোন উপকার নেই। তোমার অঙ্গ থেকেই ঋক সাম ও যজু নিপতিত হয়েছে। জগন্নাথ, তুমি ঋগ্বেদময়, সামবেদময় ও যজুর্বেদময় বলে তুমিই ত্রয়ীময়। তুমিই ব্রহ্মের স্থূল এবং অব্যক্ত রূপ। তুমি মূর্ত ও অমূর্ত। তুমি সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে বিরাজ করছ। তুমি নিমেষ ও কাষ্ঠাদিময়, সকলের ক্ষয়কারক কালস্বরূপ, তুমি কামরূপ। অতএব প্রসন্ন হও এবং নিজের তেজের উপসংহার কর।—

নমস্তে ঋক্ স্বরূপায় সাম স্বরূপায় তে নমঃ।
যজুঃ স্বরূপরূপায় সাম্নাং ধামবতে নমঃ॥
জ্ঞানৈক ধামভূতায় নির্ধূত তমসে নমঃ।
শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপায় বিশুদ্ধায়ামলাত্মনে॥
বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় পরস্মৈ পরমাত্মনে।
নমোঽখিলজগদ্ব্যাপি স্বরূপায়াত্মমূর্তয়ে॥
সর্বকারণভূতায় নিষ্ঠায়ৈ জ্ঞানচেতসাম্।
নমঃ সূর্যস্বরূপায় প্রকাশাত্মস্বরূপিণে॥
ভাস্করায় নমস্তুভ্যং তথা দিন কৃতে নমঃ।
শর্বরী হেতবে চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্নাকৃতে নমঃ॥

ত্বং সর্বমেতদ্ভগবান জগদুদ্‌ভ্রমতা ত্বয়া।
ভ্রমত্যাবিদ্ধমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম॥
ত্বদংশুভিরিদং স্পৃষ্টং সর্বং সঞ্জায়তে শুচি।
ক্রিয়তে ত্বৎ করৈঃ স্পর্শাজ্জলাদীনাং পবিত্রতা॥
হোমদানাদিকা ধর্মো লোপকারায় জায়তে।
তাবদ্‌যাবন্ন সংযোগি জগদেতৎ ত্বদংশুভিঃ॥
ঋচস্তে সকলা হ্যেতা যজুংষ্যেতানি চান্যতঃ।
সকলানি চ সামানি নিপাতন্তি ত্বদঙ্গতঃ॥
ঋঙ্‌ময়স্ত্বং জগন্নাথ ত্বমেব চ যজুর্ময়ঃ।
যতঃ সামময় শ্চৈব ততো নাথ ত্রয়ীময়ঃ॥
ত্বমেব ব্রহ্মণো রূপং পরঞ্চাপরমেব চ।
মূর্তামূর্তস্তথা সূক্ষ্মঃ স্থূলরূপস্তথা স্থিতঃ॥
নিমেষ কাষ্ঠাদিময়ঃ কালরূপঃ ক্ষয়াত্মকঃ।
প্রসীদ স্বেচ্ছয়া রূপং স্বতেজঃ শমনং কুরু॥

মার্কণ্ডেয় বললেন, দেবতা ও দেবর্ষিদের এই স্তবের পর সূর্য তখনই নিজের তেজ মোচন করলেন। তাঁর যে তেজ ঋগ্বেদময় তার থেকে মেদিনী সম্ভূত হয়েছেন, যে তেজ যজুর্ময় তাতে অন্তরীক্ষ নির্মিত হয়েছে এবং যে তেজ সামময় তা থেকে স্বর্গের উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বকর্মা তাঁর তেজের যে পনের অংশ ক্ষয় করেন তার দ্বারা শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, বসু শঙ্কর ও অগ্নির শক্তি, কুবেরের শিবিকা ও যক্ষ বিদ্যাধর প্রভৃতির প্রচণ্ড অস্ত্র নির্মাণ করে দিলেন। তখন থেকে সূর্য ষোল ভাগ তেজ ধারণ করেন।

তারপর সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তর কুরুতে গিয়ে সংজ্ঞাকে দেখলেন। সংজ্ঞা তাঁকে পরপুরুষ ভেবে পৃষ্ঠরক্ষণ করে সামনে এলেন। তাঁদের নাসায় নাসায় যোগে সূর্যের বীর্যে সংজ্ঞার মুখ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও রেবন্তের জন্ম হল। তখন সূর্য তাঁর স্বরূপ দেখালেন। সে রূপের তুলনা নেই। আহ্লাদিত হয়ে সংজ্ঞাও তাঁর

নিজের রূপ ধারণ করলেন এবং সূর্য তাঁকে নিজের গৃহে ফিরিয়ে আনলেন।

তাঁর প্রথম পুত্র বৈবস্বত মনু হলেন। দ্বিতীয় পুত্র যম মায়ের শাপে ধর্ম দৃষ্টি হয়েছিলেন। পিতা এই বলে তাঁর শাপান্ত করলেন যে কৃমিরা এঁর পায়ের মাংস খেয়ে পৃথিবীতে পতিত হবে। তিনি ধর্ম দৃষ্টি ও শত্রু মিত্রে সমদর্শী হয়েছিলেন বলে পিতা তাঁকে যমের পদে নিযুক্ত করলেন। যমুনা নদী হলেন। অশ্বিনীকুমাররা দেব-বৈদ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ও রেবন্ত গুহ্যকদের আধিপত্যে নিযুক্ত হলেন। ছায়ার প্রথম পুত্র মনুর তুল্য ভাবাপন্ন বলে তিনি সাবর্ণি সংজ্ঞা পেলেন। বলি ইন্দ্রপদ পেলে সাবর্ণি মনু হবেন। শনি গ্রহদের মধ্যে নিয়োজিত হলেন এবং তপতী নামের কন্যা সংবরণের পুত্র কুরুকে জন্ম দিলেন।

আদিত্য বসু রুদ্র সাধ্য বিশ্বদেব মরুৎ ভৃগু ও অঙ্গিরা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। আদিত্য রুদ্র ও মরুৎ কশ্যপের পুত্র, সাধ্য বসু ও বিশ্বদেবরা ধর্মের পুত্র। উর্জস্বী এঁদের ইন্দ্র। অত্রি বশিষ্ঠ গৌতম ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র কৌশিক ও জমদগ্নি এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু নাভগ ধৃষ্ট সার্যাতি নরিষ্যন্ত দিষ্ট করূষ পৃষধ্র ও বসুমান এই নয়জন বৈবস্বত মনুর পুত্র।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, এবারে বর্তমান কল্পের সপ্ত মনুর কথা বলুন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি সাবর্ণির কথা বলেছি, তিনিই হবেন অষ্টম মনু। রাম ব্যাস গালব দীপ্তিমান কৃপ ঋষ্যশৃঙ্গ ও দ্রোণি হবেন সপ্তর্ষি। দেবতা হবেন সুতপা অমিতাভ ও মুখ্য, তাঁদের বাট গণ। এঁরা প্রজাপতি মারীচের পুত্র। বলি তাঁদের ইন্দ্র হবেন। ইনি এখনও নিয়ম বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পাতালে বাস করছেন। বিরজা চার্ববীর নির্মোহ সত্যবাক কৃতি বিষ্ণু প্রভৃতি সাবর্ণি মনুর পুত্র।

শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য

ওঁ নমো চণ্ডিকায়ৈ

মধু কৈটভ বধ

মার্কণ্ডেয় বললেন, সূর্যের পুত্র সাবর্ণি হলেন অষ্টম মনু, তাঁর উৎপত্তির কথা বলছি শোন। মহামায়ার প্রভাবে যে ভাবে তিনি মন্বন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন, তাও বলব। স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র বংশের সুরথ সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। কোলা বিধ্বংসী নৃপতিরা তাঁর বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হল। তাদের সঙ্গে রাজা সুরথের যুদ্ধ উপস্থিত হল এবং সেই নৃপতিরা হীনবল হয়েও রাজা সুরথকে পরাজিত করেন। তিনি নিজের রাজধানীতে ফিরে এসে নিজের দেশের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু সেই বলবান বৈরীরা সেখানে এসে পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর দুষ্ট ও দুরাত্মা অমাত্যরা তাঁর কোষ ও বল অপহরণ করল। এইভাবে তাঁর প্রভুত্ব অপহৃত হলে তিনি মৃগয়ার জন্য অশ্বারোহণ করে একাকী গহন বনে গমন করলেন।

সেখানে মহর্ষি মেধসের আশ্রম তাঁর চোখে পড়ল। সেই আশ্রম শান্ত স্বভাবের শ্বাপদে পরিবেষ্টিত ও শিষ্য পরম্পরায় পরিশোভিত। মুনি তাঁর সৎকার করলে তিনি কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করলেন। সে সময়ে তিনি আশ্রমে ইতস্তত বিচরণ করতেন। মমতায় মন আকৃষ্ট হওয়াতে তিনি সারাক্ষণ ভাবতেন, আমার পূর্ব পুরুষের পুর আর আমার অধিকারে নেই, আমার দুর্বৃত্ত ভৃত্যরা তা ধর্মানুসারে পালন করছে কিনা জানি না। আমার প্রধান শূরহস্তী এখন বৈরীদের হস্তগত হয়েছে, সে কী ভোগ করছে জানি না। যারা নিত্য আমার প্রসাদ ধন ও খাদ্য গ্রহণ করে

আমার আনুগত্য করত, তারা নিশ্চয়ই এখন অন্য রাজাদেরও তাই করছে। তারা ব্যয় করতেও জানে না, নিশ্চয়ই তারা সতত ব্যয় করে আমার কষ্টে সঞ্চিত কোষ ক্ষয় করে ফেলছে।

একদিন তিনি সেই আশ্রমের নিকটে এক বৈশ্যকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে ? কেন এখানে এসেছ, আর কেনই বা তোমাকে শোকান্বিত ও দুর্মনার ন্যায় দেখছি ?

বৈশ্য প্রশ্রয়াবনত হয়ে উত্তর দিল, আমার নাম সমাধি, ধনী বৈশ্য বংশে আমার জন্ম। কিন্তু আমার অসাধু স্ত্রীপুত্রেরা ধনের লোভে আমাকে পরিত্যাগ করেছে, ধনও নিয়ে নিয়েছে। আপত বন্ধুরাও আমাকে ত্যাগ করেছে বলে আমি মনের দুঃখে বনে এসে এখানেই আছি। আমার স্ত্রীপুত্র স্বজনবর্গ ভাল আছে না মন্দ, তা জানি না। তাদের গৃহে লাভ হচ্ছে না ক্ষতি, আয় হচ্ছে না অপচয়, তারা সদাশয় না দুরাচারী হয়েছে, তারও কোন সংবাদ অবগত নই।

রাজা বললেন, যে স্ত্রীপুত্রেরা ধনের লোভে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের জন্য তোমার মন কেন স্নেহপ্রবণ হচ্ছে ?

বৈশ্য বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই দয়াহীন হচ্ছে না। যারা আমার ধনে লুব্ধ হয়ে পিতৃস্নেহ স্বজনস্নেহ ও স্বামীস্নেহ ত্যাগ করে আমাকে নিরাকৃত করেছে, আমার মন তাদেরই প্রতি স্নেহপ্রবণ হচ্ছে। বন্ধুরা আমার প্রতিকূল হয়েছে জেনেও আমার মন তাদের জন্য প্রেমপ্রবণ হচ্ছে। এটা কি তা বুঝতে পারি না। তাদের কুব্যবহারেই আমি মনের দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, আমার প্রতি তাদের প্রীতির লেশ নেই। অথচ আমার মন তাদের প্রতি নিষ্ঠুর হচ্ছে না। আমি কী করব !

মার্কণ্ডেয় বললেন, এর পর সমাধি বৈশ্য ও রাজা সুরথ একত্রে মহর্ষি মেধসের নিকটে সমাগত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে বসে কথোপকথন আরম্ভ করলেন। রাজা বললেন, আমার মন আয়ত্ত নয়, তাই যে বিষয়ে দুঃখের কারণ হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা

করতে চাই। আমার রাজ্য প্রভৃতি যে কিছুই নয়, তা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু এই জানা সত্ত্বেও অজ্ঞানের মতো তাতে আমার মমতার সঞ্চার হচ্ছে। আর এই বৈশ্যকে তার স্ত্রীপুত্র ও ভৃত্যরা পরিত্যাগ করেছে এবং স্বজনেরা একে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবু তাদের প্রতি এর সৌহার্দ্য আছে। বিবেকান্ধ হলে যেমন মোহের আবেশ হয়, আমাদেরও সেইরূপ ঘটেছে। এর কারণ কী?

ঋষি বললেন, সমস্ত প্রাণীরই আহার ও বিহার বিষয়ে এক রকম জ্ঞান আছে। এই জ্ঞান থাকলেই যদি জ্ঞানী হওয়া যায় তো তোমরাও জ্ঞানী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, সমস্ত বিষয় পৃথক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট। পেচক দিনে দেখতে পায় না, বক প্রভৃতি রাত্রে দেখতে পায় না, আবার বিড়াল প্রভৃতি দিনে রাত্রে সমান দেখে। মানুষ জ্ঞানী সত্য, কিন্তু শুধু তারাই জ্ঞানী নয়। তার কারণ পশু-পক্ষীরও সাধারণ জ্ঞান আছে। পাখীরা নিজে ক্ষুধার্ত হয়েও মোহ-বশে খাবারের কণা তাদের শাবকের চঞ্চুতে দেয়। আবার মানুষও লোভবশতঃ প্রত্যুপকার পাবার আশায় নিজেরা না খেয়ে পুত্রদের খাওয়ায়। এ সব কথা জেনে শুনে লোকে যে মমতার আবর্তে ও মোহের গর্তে পড়ে নানাভাবে সংসার বিস্তার করে, মহামায়ার প্রভাবই তার কারণ। এতে বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নয়। এই মহামায়া জগৎপতি হরির সাক্ষাৎ যোগনিদ্রা। তাঁরই প্রভাবে নিখিল জগৎ এই রকম মোহপাশে বদ্ধ ও মমতাবর্তে পতিত হয়ে থাকে। এই মহামায়াই দেবী ভগবতী। তিনি জ্ঞানীদের চিত্তও আকর্ষণ করে মোহের আয়ত্ত করেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব-জগৎ তাঁরই সৃষ্টি। তিনি প্রসন্ন হলে বরদান করে লোকের মুক্তি বিধান করে থাকেন। তিনিই পরমাবিদ্যা, নিত্যস্বরূপা, সব ঈশ্বরের ঈশ্বরী। তিনি মুক্তির হেতু, আবার তিনিই সংসারবন্ধের কারণ।

রাজা বললেন, আপনি যাঁর কথা বলছেন তিনি কে, কীরূপে

উৎপন্ন হন ও কী করেন, তাঁর স্বভাব ও স্বরূপ কেমন এবং কোথা থেকে তাঁর উদ্ভব হল, এ সব কথা আপনার প্রসাদে শুনতে চাই।

ঋষি বললেন, তাঁর জন্ম-মৃত্যু নেই, তিনি চিরকালই আছেন। এই জগৎ তাঁর মূর্তি এবং তিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। তবু তিনি বার বার যে ভাবে সমুৎপন্ন হন তা বলছি শোন। তিনি যখন দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূত হন, তখনই লোকে বলে যে তিনি উৎপন্ন হয়েছেন। কল্পনান্তে সমস্ত জগৎ এক অর্ণব করে বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রার আশ্রয়ে অনন্তের ফণামণ্ডলে শয়ন করে থাকেন, তখন মধু ও কৈটভ নামের দুই ভয়ঙ্কর অসুর তাঁর কর্ণমল থেকে উদ্ভূত হয়ে ব্রহ্মাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল আশ্রয় করেছিলেন এবং দুই অসুরকে দেখে নিদ্রাচ্ছন্ন বিষ্ণুকে জাগাবার জন্য একাগ্র হৃদয়ে যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন। এই যোগনিদ্রাই বিশ্বের ঈশ্বরী, জগতের ধাত্রী ও স্থিতিসংহারকারিণী। তাঁর তুলনা নেই, তিনি নিজেই নিজের উপমা। ব্রহ্মা তেজোরূপী নারায়ণের এই যোগনিদ্রাকে এই বলে স্তব করলেন।—

> ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।
> সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
> অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
> ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥
> ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
> ত্বয়ৈত্যৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
> বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
> তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥
> মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
> মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥
> প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
> কালরাত্রি মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুষুণ্ডী পরিঘায়ুধা॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥
বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ॥
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥

তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই স্বরস্বরূপ ও বষট্‌কার।
তুমি সুধা, অক্ষর ও নিত্য, তুমি স্থিত ত্রিধা মাত্রাকারে
যা উচ্চারণ করা যায় না তুমি সেই শাশ্বত অর্ধমাত্রা।
তুমি সাবিত্রী, সবার জননী, শ্রেষ্ঠ দেবী তুমি।
তুমি বিশ্বের সৃষ্টি করে আশ্রয় হয়েছ সকলের।
তুমি পালন কর সকলকে, সংহারও কর।
সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, স্থিতিরূপা পালনকালে,
ওগো জগন্ময়ী, সংহারের সময়ে তুমিই সংহাররূপা।
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি,
তুমিই মহামোহা মহাদেবী ও মহাসুরী।

সকলের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের যোজনকারিণী তুমি.
তুমি কালরাত্রি মহারাত্রি ও মোহরাত্রি ভয়ঙ্কর।
তুমি লক্ষ্মী বুদ্ধি ও জ্ঞানরূপিণী ঈশ্বরী,
তুমি লজ্জা পুষ্টি ও তুষ্টি, ক্ষমা ও শান্তিও তুমি।
খড়্গ ও শূলধারিণী, তুমি ঘোররূপিণী, গদা ও চক্রধারিণী,
শঙ্খ ও শরাসনধারিণী, বাণ ভূষণ্ডী ও পরিঘ তোমার আয়ুধ।
তুমি সৌমরূপিণী, সমস্ত সৌমের চেয়েও সুন্দর,
তুমি পরাৎপরা পরমা ও পরমেশ্বরী।
তুমিই সংসারের সব সৎ ও অসৎ বস্তু, সবার আত্মাও তুমি,
তুমি শক্তি সর্বস্বরূপ মহাদেবের আমি তোমার কী স্তব করব!
জগতের যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ,
তাঁকেও তুমি নিদ্রায় অভিভূত রেখেছ। আমি তোমার কী
স্তব করব?

তোমারই প্রভাবে শরীর পেয়েছি আমি বিষ্ণু ও শিব,
তোমার স্তব করতে পারে এমন শক্তি আছে কার!
তুমি উদার প্রভাবের আধার বলে এই ভাবে তোমার
স্তব করলাম।

দেবী, তুমি মোহ সমুদ্ভাবিত কর এই দুর্ধর্ষ অসুর
মধু কৈটভের।

তুমি জাগাও জগৎস্বামী বিষ্ণুকে,
সে এই অসুরদ্বয় সংহার করে রক্ষা করুক আমাকে।

ঋষি বললেন, ব্রহ্মা এই ভাবে স্তব করলে তামসরূপিণী যোগমায়া বিষ্ণুকে প্রবোধিত করে অসুরদ্বয়ের সংহারের জন্য তাঁর মুখ নেত্র নাসিকা বাহু হৃদয় ও বক্ষস্থল থেকে নির্গত হয়ে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নয়নগোচরে আবির্ভূতা হলেন। তিনি পরিত্যাগ করতেই জগন্নাথ জনার্দন তাঁর একার্ণবশায়ী অহিশয্যা থেকে উঠে সেই দুরাত্মা অসুরদের অবলোকন করলেন। অতিবীর্য পরাক্রমশালী অসুররা রোষারুণ

লোচনে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করবার জন্য উদ্যত হয়েছিল। হরি সমুত্থিত হয়ে নিজের বাহু সম্বল করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। পাঁচ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। তারা মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত ও অতিবলোন্মাদে অভিভূত হয়েছিল। তাই জনার্দনকে বলল, আমাদের কাছে বর গ্রহণ কর। ভগবান বললেন, তোমরা যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাক তো এই বর দাও যে আমি যেন তোমাদের বধ করতে পারি। আমি এই একমাত্র বর প্রার্থনা করছি, অন্য বরে আমার প্রয়োজন নেই।

ঋষি বললেন, এইভাবে বঞ্চিত হয়ে তারাও ভগবানকে বঞ্চনা করবার জন্য সমস্ত জগৎ জলময় দেখে বলল, তোমার সঙ্গে যুদ্ধে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, কাজেই তোমাদের হাতে মৃত্যু হওয়াই সর্বতো-ভাবে প্রশস্ত। কিন্তু যেখানে জল নেই, সেখানে আমাদের সংহার কর।

ঋষি বললেন, তখন শঙ্খচক্রধারী ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে নিজের জঘনো-পরি স্থাপন করে চক্রের আঘাতে তাদের উভয়ের মস্তক ছেদন করলেন। ব্রহ্মার স্তবেই মহামায়া উৎপন্ন হয়েছিলেন। এবারে আমি দেবীর প্রভাব বর্ণনা করছি শোন।

মহিষাসুর বধ

ঋষি বললেন, পূর্বাকালে দেবাসুরের শতাব্দ ব্যাপী যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে মহিষাসুর অসুরদের ও পুরন্দর দেবতাদের আধিপত্যে নিয়োজিত হল। মহাবীর্যসম্পন্ন অসুররা দেবসৈন্যকে পরাজিত করে। তাতে মহিষাসুর সমস্ত দেবতাকে জয় করে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হয়। এদিকে দেবতারা পরাজিত হয়ে ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করে বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকটে গিয়ে মহিষাসুরের অনুষ্ঠিত সমস্ত ঘটনা যথাযথ তাঁদের গোচরে আনলেন। তাঁরা বললেন যে মহিষাসুর এখন নিজেই সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের কাজ করছে

এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁরা এখন মানুষের মতো ইতস্তত বিচরণ করছেন। দেবতারা বললেন, এখন আমরা আপনাদের শরণাপন্ন, মহিষাসুর যাতে বিনষ্ট হয় সেই চিন্তা করুন।

দেবতাদের কথা শুনে শিব ও বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁদের মুখ ভ্রুকুটি-কুটিল হল। তারপর ক্রুদ্ধ বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিবের মুখ থেকে মহৎ তেজ নির্গত হল। ইন্দ্রাদি দেবতার শরীর থেকেও তেজ নির্গত হয়ে মিলিত হল। দেবতারা দেখলেন যে সেই তেজরাশি প্রজ্বলিত পর্বতের মতো শিখায় দিগন্ত ব্যাপ্ত করেছে। সেই তেজপুঞ্জ একস্থ হয়ে তার দীপ্তিতে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে নারীর রূপে প্রাদুর্ভূত হল। শিবের মুখ থেকে যে তেজ নিঃসৃত হয়েছিল তাতে তা সেই নারীর মুখ হল, যমের তেজে তাঁর কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজে বাহু, চন্দ্রের তেজে স্তন, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্যের তেজে পায়ের আঙুল, বসুদের তেজে হাতের আঙুল, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দশনপংক্তি, অগ্নির তেজে ত্রিনয়ন, সন্ধ্যার তেজে ভ্রু, বায়ুর তেজে কান এবং অন্যান্য দেবতাদের তেজে তাঁর শিবারূপ সমুদ্ভূত হল।) এই নারী জন্মগ্রহণ করলেন দেখে দেবতারা আহ্লাদিত হলেন। শিব তাঁর নিজের শূল থেকে শূল বার করে তাঁকে দিতেই বিষ্ণু তাঁর চক্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, বায়ু ধনু ও বাণ পূর্ণ তূণীর এবং ইন্দ্র তাঁর বজ্র থেকে বজ্র তৈরী করে দিলেন এবং ঐরাবতের ঘণ্টাও দিলেন। পরে যম কালদণ্ড থেকে দণ্ড, বরুণ পাশ, ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য তাঁর রোমকূপ থেবে রশ্মি, কাল খড়্গ ও নির্মল চর্ম এবং ক্ষিরোদসাগর তাঁকে নির্মল হার অক্ষয় বস্ত্র দিব্য চূড়ামণি কুণ্ডল কটক ললাট ভূষণ কেয়ূর নূপুর কণ্ঠভূষণ ও অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁকে দিলেন পরশু নানাবিধ অস্ত্র অভেদ্য কবচ মালা পদ্ম নানা রত্ন ও হিমালয়ে বহনের জন্য সিংহ। কুবের দিলেন অমৃতের পান পাত্র ও শেষনাগ নাগহার। অন্যান্য দেবতারাও

নানা ভূষণ ও অস্ত্র দিয়ে সম্মান জানাতেই দেবী বারংবার অট্টহাস্য করে উচ্চস্বরে শব্দ করতে লাগলেন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে আকাশ পূর্ণ হল, বিশ্বও পূর্ণ হয়ে বিস্তৃত হতে লাগল। তার প্রতিশব্দে সমুদয় লোক ক্ষুভিত, সাগর কম্পিত, মেদিনী বিচলিত ও পর্বত আন্দোলিত হতে লাগল। দেবতারা সহর্ষে সিংহবাহিনীকে বললেন, তোমার জয় হোক। মুনিরা ভক্তিভরে তাঁর স্তবগানে প্রবৃত্ত হলেন।

এদিকে ত্রিলোক ক্ষুভিত হয়েছে দেখে অসুর সেনা কবচ ধারণ করে ও অসুররা অস্ত্র উদ্যত করে যুদ্ধার্থে অভ্যুত্থান করল। মহিষাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, একি! বলেই সে অসুরে পরিবৃত হয়ে শব্দ লক্ষ্য করে ধাবিত হল এবং নিকটে গিয়ে দেখল যে দেবী তাঁর শরীরের প্রভায় ত্রিলোক ব্যাপ্ত, পদভরে পৃথিবী অবনমিত ও ধনুর্গুণের শব্দে পাতাল ক্ষুভিত করে বিরাজ করছেন। তারপরেই দেবীর সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ বাধল। তারা সেই যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করে দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলল। মহিষাসুরের সেনাপতি চামর ও চিক্ষুর চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। তার অন্য সেনাপতি ছয় অযুত রথ নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। আর একজন সেনানী মহাহনু অযুত হাজার রথ নিয়ে যুদ্ধে এল, অসিলোমা নামে আর একজন সেনাপতি পঞ্চাশ নিযুত রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। বাস্কল নামের এক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে এল ষাট লক্ষ সৈন্য নিয়ে, বহু সহস্র গজবাজী ও কোটি রথ তাকে বেষ্টন করে এগোল। বিড়ালাক্ষ নামের সেনাপতি অযুত সৈন্য ও পঞ্চাশ অযুত রথে পরিবেষ্টিত হয়ে রণস্থলে যুদ্ধ করতে লাগল। অন্যান্য অসুরেরাও অযুত অযুত রথ হস্তী ও অশ্বে পরিবৃত হয়ে দেবীর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। মহিষাসুর নিজে সেই যুদ্ধে যোগদান করলেন কোটি কোটি সহস্র রথ হস্তী ও অশ্বে বেষ্টিত হয়ে। এইভাবে অসুররা মিলিত হয়ে রাশি রাশি তোমর ভিন্দিপাল শক্তি মুষল খড়্গ পরশু

পট্টিশ নিয়ে দেবীর সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করতে লাগল। কেউ শক্তি বা লোহার শলাকা কেউ পাশ প্রক্ষেপ করে কেউ বা খড়্গ প্রহারে তাঁকে সংহারে উদ্যত হল। তাই দেখে দেবী চণ্ডিকা নিজের অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র অবলীলাক্রমে ছেদন করলেন। অনবরত যুদ্ধ করেও তাঁর মুখে কোন আয়াসের লক্ষণ প্রকাশ পেল না। তাই দেখে দেবতা ও ঋষিরা তার স্তবগানে প্রবৃত্ত হলেন। দেবী অসুরদের দেহে অস্ত্র মোচন করতে লাগলেন এবং তাঁর বাহন সিংহও ক্রুদ্ধ হয়ে কেশর কাঁপিয়ে ও ফুলিয়ে অসুর সেনার মধ্যে বিচরণ করতে লাগল। যুদ্ধ করতে করতে দেবী অম্বিকা নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেই তা থেকে শত সহস্র প্রমথ সৈন্য সম্ভূত হয়ে পরশু পট্টিশ অসি ও ভিন্দিপাল প্রহারে অসুর সংহার করতে লাগল এবং দলে দলে পটহ শঙ্খ ও মৃদঙ্গ বাজাতে লাগল। দেবী ত্রিশূল গদা শক্তি ঋষ্টি ও খড়্গাদি প্রয়োগ করে শত শত অসুরের প্রাণ সংহার ও অন্যান্যদের ঘণ্টাব শব্দে বিমোহিত করে নিপাতিত করলেন। কাউকে পাশে আবদ্ধ করে আকর্ষণ করলেন, কাউকে বা খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করলেন। কেউ তাঁর গদায় বিমর্দিত হয়ে মাটিতে শয়ন করল, কেউ মুষলের আঘাতে রক্তবমন করল, কেউ শূলের আঘাতে বিদীর্ণ হৃদয় হয়ে ভূপতিত হল, কেউ বা শরজালে সমাচ্ছন্ন হল। যে অসুররা পিছনে থেকে সেনা চালনা করছিল, তাদের কারও বাহু কারও গ্রীবা ছিন্ন হল, কারও মাথা ধরাশায়ী ও কারও মধ্যস্থল বিদীর্ণ হল। তাঁর অস্ত্র প্রহারে কারও জঙ্ঘা ছিন্নভিন্ন হল। কেউ এক বাহু এক পদ ও এক চক্ষু এবং কেউ দ্বিখণ্ডিত হল। কোন কোন অসুরের শিরশ্ছেদ হবার পর তাদের কবন্ধ পুনরায় উত্থিত হয়ে অস্ত্র নিয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল, কেউ বা খড়্গ শক্তি ও ঋষ্টি হাতে তালে তালে নৃত্য করতে লাগল। আবার কেউ দেবীকে বলতে লাগল, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। যুদ্ধক্ষেত্র দেবীর নিপাতিত রথ হস্তী অশ্ব ও অসুরদের পতনে অগম্য হয়ে উঠল, রক্তের নদী বয়ে গেল তাদের

মধ্য দিয়ে। আগুন যেমন মুহূর্তে তৃণ ও কাষ্ঠ দগ্ধ করে, তেমনি দেবী অম্বিকা ক্ষণকালের মধ্যে অসুরদের বিপুল সৈন্য ক্ষয় করলেন। তাঁর বাহন সিংহও তাদের প্রাণ বধ করতে লাগল। দেবীর নিঃশ্বাসে উৎপন্ন সৈন্যরাও এমনভাবে যুদ্ধ করতে লাগল যে দেবতারা স্বর্গে থেকে তাদের স্তব করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

ঋষি বললেন, সৈন্যরা এই ভাবে নিহত হচ্ছে দেখে সেনাপতি চিক্ষুর ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য দেবীর সামনে এল এবং তাঁর উপর শর বর্ষণ করতে লাগল। দেবী অবলীলাক্রমে তার শরবৃষ্টি নিরাকৃত করে বাণে তার অশ্ব ও সারথিকে সংহার এবং ধনু ও ধ্বজ ছেদন করলেন। তারপর তার সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ করলে সে খড়্গ চর্ম ধারণ করে দেবীর দিকে ধেয়ে এল। সে খড়্গে সিংহের মাথা আহত করে দেবীর হাতে আঘাত করতেই তা চূর্ণ হয়ে গেল। অসুর তখন ভদ্রকালীর দিকে শূল নিক্ষেপ করল। তাই দেখে দেবী নিজের শূল মোচন করলেন। তার আঘাতে অসুরের শূল শত শত খণ্ড হয়ে গেল। চিক্ষুর নিহত হলে চামর গজারোহণে সমাগত হল এবং দেবীর প্রতি শক্তি মোচন করল। দেবী সেই শক্তিকে অভিহত করে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করলেন। চামর এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শূল প্রয়োগ করল। দেবী শর সন্ধান করে তা ছেদন করে ফেললেন এবং তাঁর বাহন সিংহ হাতীর কুম্ভে আরোহণ করে চামরের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। তারা রোষ ভরে হাতীর উপর থেকে মাটিতে নেমে যুদ্ধ করতে লাগল। সিংহ সবেগে আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে তার মাথা পৃথক করে ফেলল। এর পর দেবী শিলা ও বৃক্ষাদি প্রহারে সেনাপতি উদগ্রকে, দন্ত মুষ্টি ও চপেটাঘাতে করালকে, গদাপ্রহারে উদ্ধতকে, ভিন্দিপালে ভাস্করকে, শরে তাম্র ও অন্ধকে এবং ত্রিশূলে উগ্রাস্য উগ্রবীর্য ও মহাহনুকে নিহত করলেন। অসির আঘাতে বিড়ালের মাথা কেটে দুর্ধর ও দুর্মুখকেও যমালয়ে পাঠালেন।

এইভাবে নিজের সৈন্য ক্ষয় হচ্ছে দেখে মহিষাসুর মহিষ রূপ ধারণ করে দেবীর সৈন্যদের ভীত এবং কাউকে তুণ্ডপ্রহারে, কাউকে ক্ষুরনিক্ষেপে, কাউকে লেজের আঘাতে তাড়িত, কাউকে বা শৃঙ্গ-প্রহারে বিদারিত করতে লাগল। এইভাবে বেগ গর্জন ভ্রমণ ও নিঃশ্বাসে প্রমথ সৈন্যদের নিপাতিত করে সিংহকে সংহারের জন্য ধাবিত হল। তাই দেখে দেবী ক্রুদ্ধ হলে অসুরও ক্রোধে ক্ষুর প্রহার করে পৃথিবী ক্ষোদিত ও পর্বত অপসারিত করে গর্জন করতে লাগল। তার সবেগ ভ্রমণে পৃথিবী ক্ষুণ্ণ ও বিশীর্ণ হয়ে উঠল। তার লেজের আঘাতে সাগর প্লাবিত হল, শৃঙ্গ চালনে মেঘ ছিন্নভিন্ন হল এবং নিঃশ্বাসের বাতাসে শত শত পর্বত আকাশ থেকে পড়তে লাগল। এইভাবে গর্জন করতে করতে মহিষাসুর নিকটবর্তী হলে দেবী চণ্ডিকা তাকে সংহারের জন্য রোষাবিষ্টা হয়ে পাশাস্ত্রে তাকে বন্ধন করলেন। বদ্ধ হয়েই সে মহিষ রূপ ত্যাগ করে সিংহ রূপ ধারণ করতেই মহামায়া তার শিরশ্ছেদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অসুর খড়্গ পাণি পুরুষ মূর্তিতে অম্বিকার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হল। দেবী শর প্রয়োগে সেই পুরুষকে ছেদন করলেন, তার খড়্গ চর্মও কেটে দিলেন। তখন মাতঙ্গ মূর্তিতে প্রাদুর্ভূত হয়ে শুণ্ড দিয়ে সিংহকে আকর্ষণ করে গর্জন করতে লাগল। খড়্গ দিয়ে দেবী তার শুণ্ড কাটলেন। তখন সে পুনরায় মহিষ মূর্তিতে ত্রিলোক ক্ষুব্ধ করতে লাগল। তাই দেখে দেবী চণ্ডিকা অমৃত পান করে ক্রোধে হাস্য করতে লাগলেন। আর মহিষ বলবীর্যে সমুদ্ধত হয়ে সগর্জনে শৃঙ্গ দিয়ে ভূধর উৎপাটিত করে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। দেবী শরপ্রয়োগে পর্বত চূর্ণ করে বললেন, যতক্ষণ আমি মধুপান না করছি, ততক্ষণই গর্জন করে নাও। তারপর আমি তোমাকে সংহার করলে দেবতারা গর্জন করবেন।

ঋষি বললেন, এই বলেই তিনি লাফিয়ে মহিষাসুরের উপরে আরোহণ করে তার কণ্ঠদেশে পা রেখে শূল দিয়ে তাড়না করলেন।

দেবীর পায়ে আক্রান্ত হয়ে নিজের মুখ থেকে মহিষাসুরের অর্ধাঙ্গ বার করতেই দেবী অম্বিকা তাকে বদ্ধ করলেন। সে অর্ধ নিষ্ক্রান্ত হয়েই যুদ্ধ করতে লাগল। সুবিপুল খড়্গের আঘাতে দেবী তার শিরশ্ছেদ করে তাকে নিপাতিত করলেন। তাই দেখে দৈত্য সেনা হাহাকার করে পালাতে লাগল। দেবতা ও মহর্ষিরা হর্ষাবিষ্ট হয়ে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। গন্ধর্বরা গান শুরু করল এবং অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগল।

দেবীস্তব

ঋষি বললেন, দেবী মহামায়া সসৈন্যে মহিষাসুরকে বধ করলে ইন্দ্রাদি দেবতারা আহ্লাদে অবনত হয়ে স্তব করতে লাগলেন--

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো-
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা,
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥

যা মুক্তিহেতু রবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ,
অভ্যাস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ
বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী ॥

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়,
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥

মেধাহসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাহসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥

দৃষ্ট্বা তু দেবি! কুপিতং ভ্রুকুটিকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥

দেবী প্রসীদ পরমা ভবতি ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এবনিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥

ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি! তেন ॥

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা॥

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী॥

খড়্গ-প্রভা-নিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তি-নিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ॥

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি! শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি ! বরদে ! ভুবনত্রয়েঽপি ॥

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা ।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদ-সুরারিভবং নমস্তে ॥

শূলেন পাহি নো দেবি ! পাহি খড়্গেন চাম্বিকে ।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে ।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে ।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে ।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥

যে দেবী তাঁর নিজের শক্তিতে এই বিশ্ব গড়েছেন,
সব দেবতার শক্তির সমষ্টি যাঁর মূর্তি,
যাঁর পূজা করেন সমস্ত দেবতা ও ঋষি,
ভক্তি ভরে তাঁকে প্রণাম করি, তিনি মঙ্গল করুন আমাদের ।
তুলনা নেই যাঁর বলের ও প্রভাবের,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যাঁর বর্ণনায় অক্ষম,
সেই চণ্ডিকা পালন করুন নিখিল জগৎ,
আর নাশ করুন অমঙ্গলের ভয় ।

যিনি সুকৃতিদের সাক্ষাৎ শ্রী,
আর মূর্তিমান অলক্ষ্মী দুষ্কৃতিদের,
যিনি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, সাধুদের শ্রদ্ধা ও লজ্জা সজ্জনের,
তাঁকে আমরা প্রণাম করি, তিনি পালন করুন এই বিশ্ব।

তোমার এ রূপ চিন্তার অতীত,
লোকাতীত বিপুল বীর্যে তুমি অমরক্ষয় কর,
যুদ্ধে তোমার অনুষ্ঠান অতিক্রম করেছে সমস্ত দেবাসুরকে,
কেউ তা পারে না, আমরাও অক্ষম তার বর্ণনায়।

তুমি হেতু জগৎ ও ত্রিগুণের, জানো না কোন দোষ,
অপার তোমার মহিমা, হরিহরও জানেন না সব,
সবার আশ্রয় তুমি, তোমারই অংশ এই অখিল জগৎ,
জন্মমৃত্যুহীন আদ্যা ও পরমা প্রকৃতি তুমি।

তুমি স্বাহা,
তোমার নামেই দেবতারা তৃপ্তি লাভ করেন যজ্ঞে।
তুমি স্বধা,
তুমিই পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ।
তুমি মুক্তির হেতু,
চিন্তায় তোমার স্বরূপ জানা যায় না।

মহাব্রতা দেবী, তুমি বিদ্যারূপিণী ভগবতী।
মুনিরা তোমার সাধনা করেন মোক্ষ লাভের জন্য।

তুমি আধার সুবিমল ঋক ও যজুর্বেদের,
রম্যপদ সামগানেরও আশ্রয়,
তুমি দেবী ভগবতী তিন বেদ,
জগতের পরমার্তি বিনাশ কর তুমি।

দেবী, তুমি অখিল শাস্ত্র বিদিত হবার মেধা,
দুর্গতিনাশিনী, তুমি দুস্পার ভব পারাপারের তরণী।

কৈটভারি বিষ্ণুর হৃদয়ে তুমি লক্ষ্মী,
তুমি গৌরী শশিমৌলী মহাদেবের হৃদয়ে।
স্মিত বিকশিত নির্মল মুখমণ্ডল তোমার,
চন্দ্রবিম্বের মতো কমনীয় কনককান্তি,
তবু তোমাকে প্রহার করেছিল মহিষাসুর,
বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নেই।
তোমার সেই মুখ যখন কোপে ভ্রূকুটি করাল হয়ে,
ধারণ করেছিল উদীয়মান শশাঙ্কের মতো রক্তমূর্তি,
তাতেও যে মহিষের মৃত্যু হয় নি, সেও আশ্চর্যের কথা।
কুপিত কৃতান্তকে সামনে দেখে বেঁচে থাকতে পারে কে!
সবার মঙ্গলের জন্য তুমি প্রসন্ন হও দেবী,
তুমি কুপিত হলেই যে সব কুল ধ্বংস হয়
তা জানা গেছে।
এই তো তোমার কোপে মহিষের বিপুল সেনা বিনষ্ট হল।
যাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তুমি বিধান কর অভ্যুদয়,
জনপদে তারাই হয় সম্মানের, ধনলাভও হয়।
ধর্ম অবসন্ন হয় না বলে কীর্তিমান হয় তারা,
পুত্র কলত্র ভৃত্য তাদের বশে থাকে, ধন্য তারা।
সুকৃতী যারা, তোমার প্রসাদে তারা
প্রতিদিন করে ধর্মের অনুষ্ঠান, স্বর্গলাভ হয় তাদের।
তুমি মঙ্গল কর ত্রিলোকের।
ওগো দুর্গা, তোমাকে স্মরণ করে ভয় দূর হয় সকল প্রাণীর।
অকপটে তোমাকে স্মরণ করলে তুমি দাও শুভমতি।
তুমি হরণ কর দারিদ্র্য-দুঃখ ও ভয়,
সব উপকার করার জন্য আর কার চিত্ত সর্বদা দয়ার্দ্র?
এই অসুর বিনাশে জগতের সুখ হল,
এরা যেন আর পাপ করে নরকে না যায়,

স্বর্গলাভ করুক সংগ্রামে মৃত্যুর জন্য।
তোমার ইচ্ছাতেই তো অহিতের বিনাশ হয়

দৃষ্টি দিয়ে তুমি অসুরদের ভস্ম করতে পার,
কিন্তু তা না করে শস্ত্র প্রয়োগ করেছিলে।
শস্ত্রস্পর্শে বীতপাপ হয়ে তারা স্বর্গে যাক,
এই কথা ভেবেই তো তুমি যুদ্ধ করেছিলে।

দেবী, তোমার খড়্গ থেকে প্রস্ফুরিত হয়েছিল প্রভা,
দীপ্তি বিনিঃসৃত হয়েছিল শূলাগ্র থেকে।
তবু তারা দগ্ধ হয় নি তোমার দৃষ্টির সামনে,
তারা দেখেছিল স্নিগ্ধ কিরণময় চন্দ্রের মতো তোমার মুখ।

তোমার শীল দুর্বৃত্ত চরিত্র বিনাশ করে,
তাদের বৃত্ত বিনাশ করে তোমার অতুলনীয় রূপ,
তোমার বীর্যে দেবপরাক্রমহারী অসুররাও বিনষ্ট হয়।
তবু তুমি শত্রুদের প্রতি এত দয়া প্রকটিত কর।

তোমার এই পরাক্রমের সঙ্গে তুলনা হয় না কারও,
তোমার রূপে ভীত হয় শত্রু,
আর মুগ্ধ হয় সমস্ত লোক।
তোমার চিত্তে একই সঙ্গে আছে কৃপা ও নিষ্ঠুরতা।

শুধু তোমাতেই আছে এই
পরস্পরবিরোধী গুণের অধিষ্ঠান।
শত্রুদের সুরলোকে পাঠিয়ে আমাদের রক্ষা করলে
তাদের ভয় থেকে
তোমাকে নমস্কার।

ওগো দেবী অম্বিকা,
তুমি শূল দিয়ে আমাদের রক্ষা কর, রক্ষা কর খড়্গ দিয়ে,
ঘণ্টার শব্দ আর ধনুষ্টঙ্কার দিয়ে পালন কর আমাদের।

ওগো চণ্ডিকা, নিজের শূল পরিভ্রামিত করে
তুমি রক্ষা কর প্রাচ্য প্রতীচ্য দক্ষিণ ও উত্তর।
তোমার যে সৌম্য ও ঘোর রূপ ত্রিলোকে বিচরণ করে,
তা দিয়ে রক্ষা কর এই পৃথিবী ও আমাদের।
ওগো অম্বিকা, তোমার হাতে যে সব অস্ত্র আছে,
তাই দিয়েই আমাদের রক্ষা কর সর্বতোভাবে।

ঋষি বললেন, দেবতারা এইভাবে স্তব করে নন্দনকাননের ফুল গন্ধানুলেপন ও ধূপে জগদ্ধাত্রীর অর্চনা করলেন। তিনি প্রসাদ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে প্রণত দেবতাদের বললেন, তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। তোমাদের পূজায় প্রীতিলাভ করেছি, তাই তোমাদের বর দেব।

দেবতারা বললেন, ভগবতী, আপনি আমাদের জন্য সবই করেছেন। শুধু এই বর দিন যে আমরা স্মরণ করলেই আপনি আমাদের সমস্ত আপদ এই ভাবে বিনাশ করবেন। আর যারা এই স্তবে আপনার আরাধনা করবে, তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আপনি বিত্ত ঋদ্ধি ও বিভব দিয়ে তাদের দারা পুত্রের সম্পদ বৃদ্ধি করবেন।

ঋষি বললেন, রাজা, দেবতারা নিজেদের ও সমস্ত জগতের জন্য দেবী ভদ্রকালীকে এই ভাবে প্রসন্ন করলে তিনি 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন। ত্রিলোকের হিতের জন্য তিনি দেবতাদের শরীর থেকে যেভাবে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন, তা বললাম। এরপর শুম্ভ নিশুম্ভ ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যদের সংহারের জন্য পুনরায় তিনি গৌরী দেহে সমুদ্ভূতা হয়েছিলেন। এবারে সেই বৃত্তান্ত তোমাকে বলছি।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ কথা

ঋষি বললেন, পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ মদবলের আবেশে ইন্দ্রর নিকট থেকে ত্রিলোক ও যজ্ঞভাগ দুইই হরণ করেছিল। তারা

সূর্য হয়েছিল, চন্দ্রের কাজ করত, কুবের যম ও বরুণের অধিকার আত্মসাৎ করেছিল এবং বায়ু ও অগ্নির কাজও করত। ফলে তারা দুজনে সমস্ত দেবতাকে পরাজিত অধিকার-চ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট করে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। দেবতারা এইভাবে পর্যুদস্ত ও নিরাকৃত হয়ে ভগবতী দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন, দেবী, তুমি আমাদের বর দিয়েছ যে বিপদে পড়ে স্মরণ করলেই তুমি আপদ বিনাশ করবে। তারপর তাঁরা হিমালয়ে গিয়ে বিষ্ণুমায়া দেবীর স্তব করতে লাগলেন—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈঋ‌র্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতাঃ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥
যা সাম্প্রতং চোদ্ধত দৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্র মূর্তিভিঃ॥

তুমি দেবী, মহাদেবী, মঙ্গলদায়িনী শিবা,
তুমি প্রকৃতি, শুভদা, তাই তোমাকে নিয়ত প্রণাম করি।
তুমি সংহাররূপিণী শুদ্ধসত্ত্বময়ী ধাত্রী,
তুমি জ্যোতির্ময়ী আনন্দরূপিণী সুখদা,
তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি কল্যাণী, বৃদ্ধিস্বরূপা, অষ্টসিদ্ধি,
তুমি অসুরের শক্তি, নৃপতির লক্ষ্মী, বিশ্বরূপা,
তোমাকে নমস্কার করি।
তুমি দুর্গা, সর্বকারিণী ব্রহ্মরূপা, দুর্গমে পার কর সবাইকে,
সবার প্রতিষ্ঠা তুমি, তমোরূপিণী, প্রচ্ছাদকস্বরূপিণী,
তোমাকে নমস্কার করি।
তুমি অতি সৌম্য, রৌদ্ররূপা তুমি, তোমাকে নমস্কার।
তুমি জগতের প্রাণ প্রকাশ ও ক্রিয়ার শক্তি,
তোমাকে নমস্কার করি।
যে দেবী সর্বজীবে বিষ্ণু মায়া নামে শব্দিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে চেতনা নামে অভিহিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে নিদ্রারূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে ক্ষুধারূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে ছায়ারূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে শক্তিরূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে তৃষ্ণারূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।
যে দেবী সর্ব জীবে ক্ষমারূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে জাতিরূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে লজ্জারূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে শান্তিরূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে শ্রদ্ধা রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে কান্তি রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে লক্ষ্মী রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে বৃত্তি রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে স্মৃতি রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে দয়া রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে তুষ্টি রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে মাতৃ রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যে দেবী সর্ব জীবে ভ্রান্তি রূপে সংস্থিতা,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

যিনি অধিষ্ঠাত্রী ইন্দ্রিয়ের ও অখিল জীবের,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

চৈতন্য রূপে ব্যাপ্ত যিনি সমস্ত চরাচরে,
তাঁকে আমরা নমস্কার করি।

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতারা যাঁর স্তব করেছিলেন,
অশুভ দিনে সুরেন্দ্র যাঁর উপাসনা করেন,
যিনি সবার ঈশ্বরী ও মঙ্গল করেন সকলের,
আপদ ধ্বংস করে তিনি মঙ্গল করুন আমাদের।

দৈত্যতাপিত হয়ে দেবতারা যাঁর বন্দনা করেছেন,
ভক্তি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করলেই যিনি
বিপদ বিনাশ করেন তৎক্ষণাৎ,
তিনি আমাদের মঙ্গল করুন।

ঋষি বললেন, রাজা, দেবতারা এইভাবে স্তব করতে থাকলে দেবী পার্বতী সেখান দিয়ে জাহ্নবীতে স্নান করতে চললেন। যাবার সময় দেবতাদের বললেন, তোমরা কার স্তব করছ? এই কথা বলা মাত্র তাঁর শরীরকোষ থেকে শিবা সমুদ্ভূতা হয়ে বললেন, শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে তাড়িয়েছে, তাই তারা সমবেত হয়ে আমারই স্তব করছে। পার্বতীর শরীর-কোষ থেকে অম্বিকা বিনিঃসৃত হলেন বলে তাঁর নাম হল কৌষিকা। তারপর পার্বতী কৃষ্ণা মূর্তি ধারণ করে কালিকা নামে সংসারে বিখ্যাত হলেন। কালিকা হিমালয় আশ্রয় করে আছেন।

তারপর দেবী অম্বিকা পরম মনোহর রূপ ধারণ করলে চণ্ড ও মুণ্ড তাই দেখে শুম্ভকে গিয়ে বলল, মহারাজ, হিমালয়

উদ্ভাসিত করে এক সুন্দরী নারী বিরাজ করছে, এমন রূপ কোথাও দেখা যায় না। সত্যিই মহারাজ, স্ত্রীদের মধ্যে ইনি রত্ন, এঁর প্রভায় চারিদিক আলো হয়ে আছে। তাঁকে দেখুন, তিনি কে জানুন এবং তাঁকে নিয়ে আসুন। প্রভু, ত্রিলোকে হস্তী অশ্ব মণিরত্ন যা কিছু পাওয়া যায়, সবই আপনার আছে। ইন্দ্রের ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা এনেছেন, পারিজাতও আপনার গৃহে। পিতামহর অধিকৃত হংসযুক্ত বিমান এখন আপনার অঙ্গনে রাখা আছে। ধনেশ্বরের মহাপদ্ম নামে নিধি আপনি এনেছেন, সরিৎপতি আপনাকে অম্লানপঙ্কজা মালা দিয়েছেন. কাঞ্চন প্রসবকারা বরুণের ছত্র আপনার গৃহে, প্রজাপতির রথও আপনার আয়ত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও আপনি যমের উৎক্রান্তিদা নামের শক্তি এনেছেন, বরুণের পাশ আপনার ভ্রাতার করগত হয়েছে, সাগরসম্ভূত সমস্ত রত্নও এখন তাঁর অধিকারে। অগ্নি তাঁর দাহিকা শক্তিতে যে দুখানি বস্ত্র রচনা করেছেন, তা তিনি আপনাকে দিয়েছেন। তবে আপনি কেন এই কল্যাণী স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করছেন না!

শুম্ভ চণ্ড ও মুণ্ডের এই কথা শুনে সুগ্রীবকে দূতরূপে দেবীর কাছে প্রেরণ করল। তাকে বলে দিল যে তুমি আমার আদেশে এই এই কথা বলবে এবং যাতে সে সম্প্রীতি সহকারে এখানে আসে তাই করবে।

এই আজ্ঞা পেয়ে সুগ্রীব পাহাড়ে দেবীর নিকটে এসে মৃদু মধুর বাক্যে বলল, দেবী, বর্তমানে ত্রিলোকের অধিপতি শুম্ভ আমাকে তোমার নিকটে দূত রূপে পাঠিয়েছেন, তাই আমি এসেছি। তিনি দেবতাদের জয় করেছেন, যক্ষ গন্ধর্ব ও রাক্ষসরা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারে না। তিনি যা বলে দিয়েছেন তা শোন। তিনি বলেছেন, এই ত্রিভুবন এখন আমার, দেব গন্ধর্ব উরগাদির সব রত্ন আমার অধিকারে আছে। তোমাকে সংসারে স্ত্রীরত্ন বলে মনে হচ্ছে বলে তুমি আমাদের ভজনা কর—আমাকে অথবা

আমার অনুজ নিশুম্ভকে। তাতে তুমি অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করবে।

ঋষি বললেন, দুর্গা এই কথা শুনে মনে মনে হেসে বললেন, তুমি সত্য বলেছ, কিছুই মিথ্যা নয়। শুম্ভ ও নিশুম্ভ উভয়েই ত্রিলোকের অধিপতি। কিন্তু আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছি, তা মিথ্যা করতে পারি না। আমার বুদ্ধি সামান্য বলেই এ রকম প্রতিজ্ঞা করেছি, যুদ্ধে যে আমাকে জয় ও আমার দর্পনাশ করবে সেই আমাকে পরিগ্রহ করবে। তাই বিলম্বে আব প্রয়োজন নেই, শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে এসে আমাকে জয় করে পাণিগ্রহণ করুক।

দূত বলল, দেবী, তুমি গর্বের কথা বলছ, এরকম আর বলো না। শুম্ভ ও নিশুম্ভের সামনে আসতে পারে, ত্রিলোকে এমন পুরুষ নেই। তুমি স্ত্রীলোক হয়ে একাকী কী ভাবে তাদের সম্মুখীন হবে! আমি বলছি, তুমি শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে যাও। প্রার্থনা করছি, কেশাকর্ষণে হৃত গৌরব হয়ে তোমাকে যেন যেতে না হয়।

দেবী বললেন, স্বীকার করছি যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ উভয়েই বল-বীর্যশালী। কিন্তু কিছু না ভেবে ও বুঝে—প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি। তাই এখন আর কী করতে পারি! তুমি ফিরে গিয়ে আদর সহকারে অসুররাজকে এই কথা বল। যা ভাল হয়, সে তাই করবে।

ধূম্রলোচন বধ

ঋষি বললেন, সুগ্রীব দেবীর এই কথা দৈত্যরাজকে গিয়ে বলল। শুম্ভ তা শুনে রোষাবিষ্ট হয়ে ধূম্রলোচনকে বলল, তুমি সসৈন্যে গিয়ে সবলে তার কেশাকর্ষণ করে আমার কাছে আনো। যদি কেউ তার পরিত্রাণের জন্য তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তো দেবতা যক্ষ বা গন্ধর্ব হলেও তাকে বধ কোরো।

ধূম্রলোচন এই আজ্ঞা পেয়ে ষাট হাজার অসুর সৈন্যে পরিবৃত হয়ে যাত্রা করল। তারপর হিমাচলবাসী দেবীকে দেখে উচ্চস্বরে বলল,

তুমি শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে চল। যদি স্বেচ্ছায় না যাও তো আমি সবলে কেশাকর্ষণে তোমাকে বিহ্বল করে নিয়ে যাব।

দেবী বললেন, তুমি বলবান, বলশালী দৈত্যরাজ তোমাকে পাঠিয়েছে; তুমি এসেছ বলবেষ্টিত হয়ে। তাই সবলে যদি আমাকে নিয়ে যাও তো আমি কী করতে পারি!

এই কথা শুনে ধূম্রলোচন দেবীর দিকে ধাবমান হতেই তিনি এক হুঙ্কারে তাকে ভস্ম করে ফেললেন। তাই দেখে বিপুল অসুর সেনা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর উপরে শক্তি পরশ্বধ ও সায়ক বর্ষণ করতে লাগল। তাতে দেবীর বাহন সিংহ রোষ ভরে কেশর কম্পিত করে অসুর সেনা আক্রমণ করে কর তুণ্ড অধর পাদ ও নখর প্রহারে অসুরদের বাহু বা শির ছিন্ন করে ক্ষণকালের মধ্যে তাদের ক্ষয় করে ফেলল।

এদিকে ধূম্রলোচন বধ ও তার সৈন্যক্ষয়ের সংবাদ শুনে শুম্ভ ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্ড মুণ্ড উভয়কে আজ্ঞা করল, তোমরা বিপুল সৈন্য নিয়ে সেখানে গিয়ে সেই বামাকে ধরে আনো। তার কেশ আকর্ষণ করে কিংবা তাকে বেঁধে আনবে। সংশয় উপস্থিত হলে সমস্ত সৈন্য মিলিত হয়ে অস্ত্র প্রয়োগে তাকে সংহার কোরো। তার বাহন সিংহ বিনিপাতিত হলে অম্বিকাকে বন্ধন করে আমার নিকটে আনবে।

চণ্ড মুণ্ড বধ

ঋষি বললেন, আজ্ঞা পাওয়া মাত্র চণ্ড ও মুণ্ড প্রভৃতি দৈত্যরা চতুরঙ্গিনী বাহিনী নিয়ে প্রস্থান করল। হিমালয় শৃঙ্গে সিংহের উপরে দেবীকে দেখে তারা তাঁকে ধরবার উপক্রম করল। অন্যরা খড়্গ ও ধনু আকর্ষণ করে তাঁর নিকটস্থ হল। তাই দেখে দেবী অম্বিকা রোষ প্রকাশ করতেই তাঁর মুখ কালী বর্ণ হল এবং তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট থেকে করালবদনা কালী নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর হাতে অসি পাশ ও বিচিত্র খট্বাঙ্গ, ভূষণ নরমালা ও পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম। তাঁর দৃশ্য ও স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর—বিস্তৃত বদন ও লোল জিহ্বা। তাঁর গম্ভীর গর্জনে

দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হল। তিনি স্ববেগে সৈন্যদের উপরে পড়ে সকলকে নিপাতিত করে ভক্ষণ করতে লাগলেন। হাতীগুলিকে তাদের ঘণ্টা অঙ্কুশধারী ও পার্ষ্ণিরক্ষকের সঙ্গে এক হাতে ধরে মুখে পুরতে লাগলেন। সারথির সঙ্গে রথ ও ঘোড়াসুদ্ধ অশ্বারোহী মুখে পুরে চর্বণ করে সকলের ভয় উৎপাদন করলেন। কাউকে কেশে কাউকে গলদেশে কাউকে বা পাদপ্রহারে মর্দিত করতে প্রবৃত্ত হলেন। অসুররা যে সব শস্ত্র ও মহাস্ত্র মোচন করল, তা মুখে নিয়ে দাঁতে কেটে ফেললেন। তিনি অসুরদের সব সৈন্য মর্দন করতে লাগলেন। কাউকে ভক্ষণ, কাউকে অসির আঘাতে বধ ও কাউকে খড়্গ দিয়ে তাড়না করলেন। অসুররা তাঁর দন্তাগ্রে অভিহত হয়ে যমালয়ে গেল। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই বিপুল সেনা নিপাতিত হল।

এই দেখে চণ্ড ভীষণ ও ভীমলোচন কালীর দিকে ধাবিত হয়ে ভয়ঙ্কর শরবর্ষণে ও মুণ্ড সহস্র চক্র নিক্ষেপ করে তাঁকে আচ্ছন্ন করল। সেই সব চক্র কালীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করল। তিনি রোষান্বিত হয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন করে হাসতে লাগলেন। তাতে তাঁর দাঁতের প্রভায় দেহ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সিংহে আরোহণ করে চণ্ডের দিকে ধাবিত হলেন এবং তার চুলের মুঠি ধরে অসির আঘাতে মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। চণ্ডকে নিপাতিত হতে দেখে মুণ্ড তার দিকে ধাবিত হতেই দেবী খড়্গের আঘাতে তাকেও ভূপাতিত করলেন। অতি বীর্যশালী চণ্ড ও মুণ্ড নিহত হয়েছে দেখে অবশিষ্ট সৈন্যরা ভয়ে যে যেদিকে পারল পলায়ন করল। তখন কালী চণ্ড মুণ্ডের মাথা নিয়ে চণ্ডিকার নিকটে গিয়ে প্রচণ্ড অট্টহাস্য করে বললেন, আমি চণ্ড ও মুণ্ডকে মহা পশু রূপে আপনাকে উপহার দিচ্ছি। শুম্ভ নিশুম্ভকে আপনি স্বয়ং বধ করবেন।

চণ্ডিকা কালীকে বললেন, দেবী, তুমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে আমার নিকটে এনেছ বলে সংসারে তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হবে।

রক্তবীজ বধ

ঋষি বললেন, চণ্ড মুণ্ড নিহত ও বহু সৈন্য ক্ষয় হয়েছে জেনে শুম্ভ রুষ্ট চিত্তে সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধ সজ্জার আদেশ দিয়ে বললেন, আজ ছিয়াশিজন দৈত্য চতুরঙ্গ দলে পরিবৃত হয়ে যুদ্ধে যাক। কম্বু বংশের চুরাশিজন দৈত্য ও তাদের সেনা নিয়ে বার হোক। এ ছাড়াও কোটি-বীর্য বংশের পঞ্চাশজন অসুর এবং ধৌম্র বংশের একশোজন দৈত্য আমার আদেশে চলুক। কালক দৌর্হৃত মৌর্য ও কালকেয় নামের অসুরবাও সত্বর যুদ্ধ সজ্জায় প্রবৃত্ত হোক। শুম্ভের আজ্ঞা অতি ভয়ঙ্কর, তা লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারও নেই। এই আদেশ দিয়েই শুম্ভ বহু সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হয়ে যাত্রা করল।

এদিকে চণ্ডিকা অসুর সেনাকে আসতে দেখে ধনুষ্টঙ্কার করলেন, তাঁর সিংহও মহানাদে গর্জে উঠল। অম্বিকা ঘণ্টাধ্বনি করে সেই গর্জন আরও বাড়িয়ে দিলেন। শব্দে চারিদিক পূর্ণ করে কালী তাঁর মুখব্যাদান করে এরূপ গর্জন করতে লাগলেন যে তাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অভিভবগ্রস্ত হল। সেই শব্দ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্য সেনা দেবী সিংহ ও কালীকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলল।

এই অবসরে অসুরদের বিনাশের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কার্তিক ও ইন্দ্রের বলবীর্যশালী শক্তি শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চণ্ডিকার নিকটে গেলেন। যে দেবতার যে রূপ ভূষণ ও বাহন, সেই ভাবেই তাঁদের শক্তি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য সমাগত হলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করে হংসযুক্ত বিমানে এলেন। মাহেশ্বরা শক্তি ত্রিশূল নিয়ে বৃষভে চড়ে এলেন, তাঁর হাতে সর্পবলয় ও মাথায় চন্দ্ররেখা ভূষণ। গুহরূপিণী কৌমারী শক্তি হাতে ময়ূর বাহনে এলেন। বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়ে চড়ে শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ ও খড়্গ হস্তে এলেন। হরির যে শক্তি যজ্ঞবরাহ মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তিনি বারাহী রূপে এলেন। নৃসিংহের শক্তি নারসিংহীও পদার্পণ করলেন। ইন্দ্রের

শক্তি ঐন্দ্রী বজ্র হস্তে হাতীর পিঠে এলেন। তারপর স্বয়ং ঈশান দেবশক্তিতে পরিবৃত হয়ে চণ্ডিকাকে বললেন, আমার প্রতি প্রীতি বশে তুমি অসুরদের আশু সংহার কব। তখন দেবীর শরীর থেকে অতি ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড চণ্ডিকা শক্তি নিষ্ক্রান্ত হলেন। শত শত শিবা তাঁর চারি দিকে শব্দ কবতে লাগল। তিনি ধূমের ন্যায় বর্ণশালী জটাজূটধারী মহাদেবকে বললেন, আপনি দূত হয়ে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে গিয়ে বলুন যে ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হোন ও দেবতারা হবির্ভোজন করুন। তোমবা যদি জীবিত থাকতে চাও তো পাতালে যাও, আর যদি বলদর্পে যুদ্ধ করতে চাও তো এসো। আমার পার্শ্ব-চারিণী এই শিবারা তোমাদের মাংস খেয়ে তৃপ্তি লাভ করুক। দেবী শিবকে দৌত্যে নিযুক্ত করলেন বলে সংসারে তিনি শিবদূতী নামে বিখ্যাত হলেন।

কাত্যায়নার এই কথা শুনে অসুররা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর নিকটে এসে রাশি রাশি শর শক্তি ও ঋষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। দেবীও ধনুষ্টঙ্কার করে শর প্রয়োগে তাদের বাণ পরশু শূল ও চক্র অবলীলাক্রমে ছেদন করে ফেললেন। কালী অসুরদের শূলে বিদারিত ও খট্টাঙ্গে বিমর্দিত করে বিচরণ কবতে লাগলেন. ব্রহ্মাণী তাদের গায়ে কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ করে অসুরদের হতবীর্য ও হততেজ করতে লাগলেন। মাহেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে, বৈষ্ণবী চক্র দিয়ে ও কৌমারী শক্তি দিয়ে তাদের বধ করতে প্রবৃত্ত হলে ঐন্দ্রীয় বজ্রে বিদারিত হয়ে দৈত্য ও দানবরা ভূপৃষ্ঠে পড়তে লাগল। বারাহী অসুরদের তুণ্ড প্রহারে বিনষ্ট. দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষত হৃদয় ও চক্রে বিদারিত করে নিপাতিত করতে শুরু করলে নরসিংহী নখে অসুরদের বিদারিত ও ভক্ষণ করে গর্জনে আকাশ প্রতিধ্বনিত করে সমরাঙ্গনে বিচরণ করতে লাগলেন। শিবদূতী প্রচণ্ড অট্টহাস্যে অসুবদের বিমোহিত করে তাদের ভক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। মাতৃকাগণও ক্রুদ্ধ হয়ে বিবিধ উপায়ে অসুরদের বিমর্দিত করতে থাকলে দৈত্য সৈন্যরা পলায়মান হল।

তাদের পালাতে দেখে রক্তবীজ রোষ ভরে যুদ্ধের জন্য অভিযান করল। তার শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়লেই সমপরিমাণ অসুর মাটি থেকে উৎপন্ন হয় বলেই তার নাম রক্তবীজ। সে গদা-হাতে ইন্দ্র-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। ঐন্দ্রী বজ্রে তাকে তাড়না করতেই সেই রক্ত স্রাবে অনুরূপ রূপ ও পরিমাণের যোদ্ধা প্রাদুর্ভূত হল। প্রত্যেক বিন্দু রক্ত থেকে সমান বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করে শস্ত্রপাতে মাতৃকাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। পুনরায় রক্তবীজের মস্তকে বজ্রাঘাত করলে সেই রক্ত থেকে সহস্র পুরুষ প্রাদুর্ভূত হল। বৈষ্ণবী শক্তি তাকে চক্রের আঘাত করলে ঐন্দ্রী তাকে গদাঘাত করলেন। বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে অসুরের রক্ত স্রাব হলে অসংখ্য অসুর উৎপন্ন হয়ে সংসার পরিব্যাপ্ত করল। বারাহী অস্ত্র দিয়ে, কৌমারী শক্তি দিয়ে ও মাহেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করলে সে কোপাবিষ্ট হয়ে সকলকে গদা দিয়ে প্রতিঘাত করল। বহুবিধ শূল ও শক্তির আঘাতে তার শরীর থেকে যে রক্ত পড়ল, তাতে শত শত অসুরের জন্ম হয়ে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হলে দেবতারা ভীত হলেন। তাঁদের বিষণ্ণ দেখে চণ্ডিকা কালীকে বললেন, তুমি মুখ ব্যাদান কর। আমার অস্ত্রে যে রক্তপাত হবে ও তাতে যে রক্তবীজ উৎপন্ন হবে, তা তুমি মুখে নিয়ে ভক্ষণ করবে। এইভাবে তুমি যুদ্ধে বিচরণ কর, তাতেই দৈত্য ক্ষয় হবে। তুমি এই অসুরদের খেতে থাকলে নতুন রক্তবীজ আর উৎপন্ন হবে না। এই কথা বলে তিনি যেই রক্তবীজকে শূলের আঘাত করলেন, কালী তখনই সেই রক্ত মুখে ধারণ করলেন। রক্তবীজ চামুণ্ডাকে গদার আঘাত করলেন, কিন্তু তাতে তাঁর কোন বেদনা হল না। রক্তবীজের দেহ থেকে যত রক্ত পড়ল, চামুণ্ডা তা সমস্তই পান করলেন। তাঁর মুখে যে সব রক্ত-বীজের জন্ম হল, চামুণ্ডা তাদেরও ভক্ষণ করলেন। দেবী কৌষিকী শূল বজ্র বাণ খড়্গ ও ঋষ্টি প্রহার করতে লাগলেন। তাতে রক্তবীজ রক্তশূন্য হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হল। তাই দেখে দেবতারা হর্ষান্বিত হলেন

এবং তাঁদের শক্তিরূপা মাতৃকারাও রক্তমদে উদ্ধত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

নিশুম্ভ বধ

রাজা বললেন, রক্তবীজ নিপতিত হলে শুম্ভ নিশুম্ভ কী করেছিল তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ঋষি বললেন, রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরদের যুদ্ধে নিহত হতে দেখে তারা কোপের বশীভূত হল। অন্য অসুর সেনার সঙ্গে নিশুম্ভ যুদ্ধযাত্রা করল। তার সামনে পিছনে ও দুই পাশে রোষাবিষ্ট অসুররা দেবীকে বিনষ্ট করবার জন্য চলল। শুম্ভও নিজের সৈন্যে পরিবৃত হয়ে চণ্ডিকাকে সংহার করবার জন্য সমাগত হল তারপর শুম্ভ ও নিশুম্ভ বর্ষণমুখর মেঘের মতো শরবৃষ্টি করে যুদ্ধ আরম্ভ করল। চণ্ডিকা সমস্ত বাণ ছেদন করে তাদের সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করলেন। নিশুম্ভ খড়্গ ও চর্ম গ্রহণ করে সিংহের মাথায় আঘাত করল। দেবী তখনই তার খড়্গ ও চর্ম ছেদন করলেন। নিশুম্ভ শক্তি নিক্ষেপ করল, দেবী চক্রে তা দ্বিখণ্ডিত করলেন। নিশুম্ভ ক্রুদ্ধ হয়ে শূল গ্রহণ করতেই দেবী মুষ্টি প্রহারে তা চূর্ণ করলেন। তাই দেখে নিশুম্ভ গদা নিক্ষেপ করল, দেবী ত্রিশূলে তা ছেদন করলেন। এরপর নিশুম্ভ পরশু হাতে এগিয়ে এলে দেবী শরাঘাতে তাকে ভূতলে নিপাতিত করলেন।

ভ্রাতা ভূমিসাৎ হলে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অম্বিকাকে বধ করবার জন্য এল। সে আট হাতে অস্ত্রাদি নিয়ে উঁচু রথে আরোহণ করে আকাশ ব্যাপ্ত করল। তাকে আসতে দেখে দেবী শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কার করে সমস্ত দিক পূর্ণ করলেন। তাঁর সিংহও গর্জন করে উঠল। এই শব্দে মদমত্ত হস্তীরা শুঁড় গুটিয়ে পালাতে লাগল। কালী করাঘাতে পৃথিবীকে আহত করতেই সেই শব্দে অন্য শব্দ তিরোহিত হল। এই সময়ে শিবদূতী অট্টহাস্য করে উঠলে অসুররা ভীত ও শুম্ভ আরও রোষাবিষ্ট হল। দেবী তাঁকে বললেন, দুরাত্মা, থাকো।

এই কথা শুনে আকাশ থেকে দেবতারা 'দেবীর জয় হোক' বলে উঠলেন। শুম্ভ সবেগে এসে শক্তি প্রয়োগ করল, তাতে চারিদিকে অগ্নিশিখা উত্থিত হল। দেবী মহোল্কা প্রয়োগ করে সেই শক্তি নিরস্ত করলেন। তাই দেখে শুম্ভ সিংহের মতো গর্জন করে ত্রিলোক পূর্ণ করল। দেবীর পক্ষ থেকেও বজ্রপাতের মতো ভয়ঙ্কর শব্দ তা পরাহত করল। এই সময়ে দেবী ও শুম্ভ পরস্পারের প্রতি শত সহস্র বাণ নিক্ষেপ ও ছেদন করতে লাগলেন। তারপর দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে শুম্ভকে শূলের আঘাত করলেন এবং শুম্ভ সেই আঘাতে মূর্ছিত হয়ে ধরাতলে পতিত হল।

এই সময়ে নিশুম্ভ চেতনা লাভ করে কার্মুক নিয়ে শর প্রয়োগ করে দেবী কালী ও সিংহ তিনজনকেই এক সঙ্গে আহত করল এবং অযুত বাহুতে অযুত চক্র নিক্ষেপ করে চণ্ডিকাকে,আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারপর দৈত্য সেনায় পরিবৃত হয়ে দেবীকে বধ করবার জন্য ধাবিত হল। চণ্ডিকা খড়্গে তার গদা ছেদন করলেন। দৈত্য শূল হাতে নিতেই দেবী নিজের শূলে তার হৃদয় বিদ্ধ করে ফেললেন। তখনই তার হৃদয় থেকে এক মহাবল পুরুষ 'তিষ্ঠ' বলে নির্গত হল। দেবী উচ্চস্বরে হাস্য করে খড়্গের আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করতেই সে ভূমিতে পতিত হল। ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রা প্রহারে সিংহ তার গ্রীবা ছিন্ন করে অসুরদের ভক্ষণ করতে আরম্ভ করল। কালী ও শিবদূতীও তাই করতে লাগলেন। কৌমারী শক্তি প্রয়োগে অন্যান্য অসুরদের ছিন্নভিন্ন করতে আরম্ভ করলে তারা পলায়ন করতে লাগল। ব্রহ্মাণী মন্ত্রপূত সলিলে অসুরদের নিরাকৃত করতে লাগলেন। মাহেশ্বরী ত্রিশূলপ্রহারে অনেককে বিদারিত করে ভূপাতিত করলেন, বারাহী তুণ্ডের আঘাতে অনেককে চূর্ণ ও বৈষ্ণবী চক্রে অনেককে খণ্ড খণ্ড করলেন। ঐন্দ্রীর বজ্রে অনেকেই ধরাশায়ী হল এবং কালী শিবদূতী ও সিংহ এই তিনজনে অনেক অসুরকে খেয়ে ফেললেন। অবশিষ্টরা প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল।

শুম্ভ বধ

ঋষি বললেন, প্রাণসম ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত ও সৈন্যদের হত দেখে শুম্ভ ক্রোধভরে দেবীকে বলল, দুর্গা, বলমদে তুমি নিতান্ত দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছ। কিন্তু বৃথা গর্ব কোরো না। তোমার নিজের বল নেই, এই সব স্ত্রীর বলেই তুমি যুদ্ধ করছ। তাতেই তোমার অহঙ্কার বেড়েছে।

দেবী বললেন. এই জগতে আমি একাই বিহার করি, আমার আর দ্বিতীয় কে আছে! এরা সব আমারই বিভূতি। এই দেখ, এরা আমার মধ্যে প্রবেশ করছে।

ঋষি বললেন, এই কথা বলামাত্র ব্রহ্মাণী প্রভৃতি স্ত্রীশক্তি দেবীর শরীরে বিলীন হলেন, একাকী রইলেন দেবী অম্বিকা। তখন তিনি বললেন. আমি যে এতক্ষণ বহুবিধ রূপ ও দেহে সংগ্রাম করছিলাম তা সংহরণ করলাম, এখন আমি একাই রইলাম। তুমি পালিও না, স্থির হয়ে যুদ্ধ কর।

অতঃপর দেবী ও শুম্ভ দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সমস্ত দেবতা ও অসুররা তা দেখতে লাগল। তাঁরা ভয়ঙ্কর অস্ত্র বর্ষণ করে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অম্বিকা যে সব অস্ত্র মোচন করতে লাগলেন, শুম্ভ সে সব প্রতিহত করল। আবার শুম্ভের সমস্ত অস্ত্র অম্বিকা হুঙ্কার করেই অবলীলাক্রমে প্রতিহত করলেন। অসুর শত শত শরে দেবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, দেবী কুপিত হয়ে তার ধনু কেটে দিলেন। দৈত্যরাজ শক্তি হাতে নিতেই দেবী চক্র দিয়ে সেই শক্তি ছিন্ন করলেন। শুম্ভ তখন খড়্গ নিয়ে দেবীর দিকে ধাবিত হল, চণ্ডিকা শরসন্ধান করে তার খড়্গ ও চর্ম ছেদন করে ফেললেন। তিনি তার অশ্ব ও সারথি নিহত ও শরাসন ছিন্ন করলে সে মুদ্গর গ্রহণ করল। কিন্তু নিকটে আসবার আগেই দেবী শরে তা ছিন্ন করলেন। তখন সে মুষ্টি উদ্যত করে সবেগে এসে দেবীর হৃদয়ে আঘাত করল। দেবীও তার বক্ষে চপেটাঘাত করলেন। তাতেই সে অভিহত হয়ে ভূমিতে

পতিত হল এবং পুনরায় উঠে দেবীকে নিয়ে আকাশে উঠল। চণ্ডিকা সেখানেও নিরালম্বে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। আকাশে তাঁদের যুদ্ধ দেখে সিদ্ধ ও মুনিরা বিস্মিত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে অম্বিকা তাকে ঘুরিয়ে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। ধরাতলে পড়ে আবার সে মুষ্টি উদ্যত করে সবেগে ধাবিত হল। এই সময়েই দেবী তার বক্ষে শূলের আঘাত করে শুম্ভকে ধরাশায়ী করলেন। সে প্রাণত্যাগ করে মাটিতে পড়তেই সাগর পর্বত ও দ্বীপ সমেত সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল।

এই দুরাত্মা নিহত হলে সংসার প্রসন্ন ও আকাশ নির্মল হল, উৎপাত মেঘ ও উল্কা হল তিরোহিত এবং নদীও যথাযথ পথে প্রবাহিত হল। দেবতারা হর্ষান্বিত হলেন, গন্ধর্বরা গান ধরল, অপ্সরারা নৃত্য করতে লাগল এবং বাদ্য বাদনে প্রবৃত্ত হল অন্যান্যরা। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হল, সূর্য সপ্রতিভ হলেন, অগ্নি শান্তভাবে প্রজ্বলিত হতে লাগলেন এবং দশ দিক শান্ত মূর্তি ধারণ করল।

দেবীর বরদান

ঋষি বললেন, দেবী কাত্যায়নী শুম্ভকে সংহার করলে দেবতারা প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন ও তাঁদের নূতন আশার সঞ্চার হল। তাঁরা ইন্দ্রের সঙ্গে অগ্নিকে পুরোবর্তী করে দেবীর স্তব করতে লাগলেন—

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গ মুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্ত পরমোক্তয়ঃ॥
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
হংসযুক্ত-বিমানস্থে ব্রহ্মাণিরূপধারিণি।
কোশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে
ত্রিশূল-চন্দ্রাহি-ধরে মহাবৃষভবাহিনী।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারী-রূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্র নয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শিবদূতী-স্বরূপেন হতদৈত্য মহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালা বিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয় ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব ভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব ॥

অসুরা সৃগ্বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্ব গর্ত্তেঽতি মহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাত পাক জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বার্তিহারিণি!
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে! লোকানাং বরদা ভব।

শরণাপন্নের আর্তিহারিণী দেবী, তুমি প্রসন্ন হও,
অখিল জগতের জননী, তুমি প্রসন্ন হও।
ওগো বিশ্বেশ্বরী, প্রসন্ন হয়ে রক্ষা কর বিশ্বকে,
তুমি দেবী চরাচরের ঈশ্বরী।
তুমিও একা জগতের আধার,
পৃথিবীরূপে তুমি একে ধারণ করে আছ,
জলরূপে আপ্যায়িত করছ সকলকে,
তোমার বীর্য লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই কারও।
তুমি অনন্তবীর্য বৈষ্ণবী শক্তি,
তুমি বিশ্বের বীজ ও পরম মায়া,
তুমি মোহিত করে রেখেছ সমস্ত,
তুমি প্রসন্ন হলেই মুক্তিলাভ হবে।
সমস্ত বিদ্যা তোমারই ভেদ,
জগতের সমস্ত স্ত্রী তোমারই অংশ,
তুমি একাই সব ব্যাপ্ত করে আছ,
স্তবের অতীত তুমি, কী স্তুতি করব তোমার!
তুমি দেবী সর্বরূপা স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী,
তোমার স্তুতির আর কিছু কি বাকি আছে!
সবার হৃদয়ে তোমার বুদ্ধিরূপে সংস্থিতি,
স্বর্গ-অপবর্গ-দায়িনী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

কলাকাষ্ঠাদিরূপে পরিণাম প্রদায়িনী,
বিশ্বের সংহার শক্তি নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
সর্বমঙ্গলস্বরূপা কল্যাণী সবার্থসাধিনী,
শরণ্য ত্রিনয়ণী গৌরী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী সনাতনী,
গুণের আশ্রয় গুণময়ী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
তুমি শরণাগত দীন ও আর্তের পরিত্রাণ পরায়ণ,
সবার সন্তাপ হারিণী দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
হংস যুক্ত বিমানে ব্রহ্মাণীর রূপে
কুশের জলে শত্রু বিনাশিনী দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
ত্রিশূল চন্দ্র ও অহিধারিণী মহাবৃষভ বাহিনী
মাহেশ্বরী রূপে দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
ময়ূর ও কুক্কুট পরিবৃতা মহাশক্তি ধরা নিষ্পাপ
কৌমারী রূপে দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গাদি শস্ত্র হাতে
বৈষ্ণবী রূপে প্রসন্ন হও দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
উগ্র মহাচক্র হাতে দংষ্ট্রায় বসুন্ধরাকে উদ্ধারকারিণী
বরাহরূপিণী কল্যাণী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
উগ্র নৃসিংহ রূপে দৈত্য হত্যায় উদ্যত
ত্রিলোকের ত্রাণকারিণী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
কিরীট ও বজ্রধারিণী সহস্র নয়নে উজ্জ্বল
বৃত্র প্রাণ হারিণী ইন্দ্র-শক্তি নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
ঘোর রূপে মহাশব্দে মহাবল দৈত্য বিনাশিনী
শিবদূতী স্বরূপা নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
দংষ্ট্রাকরালবদন শিরোমালা বিভূষণ
চামুণ্ডা রূপে মুণ্ড বিনাশিনী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

লক্ষ্মী লজ্জা মহাবিদ্যা শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা ধ্রুবা
মহারাত্রি মহাবিদ্যা রূপে নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
মেধা সরস্বতী বর বিভূতি তমোগুণ রূপে সনাতনী,
তুমি প্রসন্ন হও ঈশ্বরী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
সর্বরূপা সর্বেশা সর্বশক্তি সমন্বিতা
ভয়ে ত্রাণ কর দেবী দুর্গা, তোমাকে নমস্কার।
লোচনত্রয় ভূষিত তোমার সৌম্য বদন
সব থেকে আমাদের রক্ষা করুক কাত্যায়নী, তোমাকে নমস্কার।
জ্বালাকরাল অসুর নিধনকারী তোমার ত্রিশূল
ভয় থেকে আমাদের, রক্ষা করুক ভদ্রকালী, তোমাকে নমস্কার।
তোমার যে জগদ্‌ব্যাপী ঘন্টাধ্বনি দৈত্য-তেজ হরণ করে,
পুত্রের মতো সে আমাদের সমস্ত পাপ হরণ করুক।
অসুরের রক্ত রঞ্জিত তোমার করোজ্জ্বল খড়্গ
আমাদের মঙ্গল করুক চণ্ডিকা, তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি তুষ্ট হলে রোগ হয় নষ্ট,
আর রুষ্ট হলে ভ্রষ্ট হয় অভীষ্ট।

তোমার আশ্রয়ে থাকে না বিপদ,
তোমার আশ্রিতকেই আশ্রয় করে সকলে।

তুমি যে আজ বহু রূপে আত্মমূর্তি নিয়ে
ধর্মদ্বেষী অসুরদের সংহার করলে,
হে দেবী অম্বিকা, তুমি ছাড়া আর কে
এই অসাধ্য সাধন করতে পারত!

তোমার জন্যই লোকের বিদ্যা শাস্ত্র
বিবেক প্রসূত বেদাদি আদি বাক্য,
তুমি ছাড়া আর কে পারত এই অন্ধকার জগৎকে
মমতার গর্তে সবেগে ভ্রমণ করাতে!

যেখানেই আছে রাক্ষস বা বিষাক্ত নাগ,
শত্রু দস্যু বা দাবানল,
তুমি সেখানে বা সাগরে অবস্থান করে
পরিত্রাণ কর এই বিশ্বকে।
বিশ্বকে পালন কর বিশ্বেশ্বরী,
বিশ্বকে ধারণ কর বিশ্বাত্মিকা।
বিশ্বের ঈশ্বরও তোমার বন্দনা করেন,
তোমাতে ভক্তিনম্র হয়ে বিশ্বের আশ্রয় হওয়া যায়
আজ যেমন অসুর বধ করে আমাদের রক্ষা করলে,
তেমনি অরিভয়ে ভীতদের রক্ষা কর, প্রসন্ন হও দেবী
জগতের সমস্ত পাপ দূর কর,
দূর কর উৎপাত প্রভৃতি উপসর্গ।
তোমাকে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন হও দেবী বিশ্বার্তিহারিণী।
ত্রৈলোক্যবাসী এই জন্যেই তোমার পূজা করে, তুমি তাদের বর দাও

দেবী বললেন, বর দেওয়াই আমার স্বভাব। তাই জগতে উপকার হতে পারে, এমন যে বর চাইবে আমি তাই দেব।

দেবতারা বললেন, অখিলের ঈশ্বরী, তুমি বিঘ্নবিপত্তি প্রশমন আমাদের বৈরি বিনাশের বর দাও।

দেবী বললেন, অষ্টাবিংশতি যুগ এলে বৈবস্বত মনুর অধিকারে সময় আমি নন্দ গোপের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে শুম্ভ নিশুম্ভকে আমি বিন্ধ্যাচল আশ্রয় করে বিনাশ করব। পুনরা সংহার মূর্তি পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে এসে বিপ্রচিত্তির বংশের দানবদে বিনাশ করব। সেই অসুরদের ভক্ষণ করতে আরম্ভ করলে আমা দাঁত ডালিম ফুলের মতো রক্তবর্ণ হবে, তার জন্য দেবতা ও মানু আমাকে রক্ত দন্তিকা বলে স্তব করবে। এর পর শত বর্ষ অনাবৃষ্টি জন্য ঋষিরা আমার স্তব করলে আমি অযোনিজা হয়ে উৎপন্ন হ

এবং শত নেত্রে মুনিদের প্রতি দৃষ্টিপাতের জন্য তাঁরা আমাকে শতাক্ষী বলবেন। যতক্ষণ বৃষ্টি না হবে ততক্ষণ আমি তোমাদের দেহ থেকে মানুষের প্রাণ ধারণের উপযোগী শাক উৎপন্ন করে তাদের ভরণ করব। এর জন্য লোকে আমাকে শাকম্ভরী বলবে। সেই সময়েই দুর্গ নামের অসুরকে বধ করার জন্য আমার দুর্গা নাম সংসারে বিখ্যাত হবে। আবার আমি ভয়াবহ বিগ্রহ পরিগ্রহ করে হিমাচল আশ্রয় করে মুনিদের পরিত্রাণের জন্য রাক্ষসদের সংহার করব, তখন আমার নাম হবে ভীমা। এরপর অরুণ নামের অসুর যখন ত্রিভুবনের বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তখন আমি অসংখ্য ষট্‌পদের ভ্রমর মূর্তি নিয়ে তাকে বিনাশ করব, তার জন্য আমার ভ্রমরী নাম হবে। এই ভাবে যখনই দানবদের হাতে মানুষের বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হবে, তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রু নির্মূল করব।

দেবীমাহাত্ম্যের ফলশ্রুতি

দেবী বললেন, যে ব্যক্তি সমাহিত হয়ে তোমাদের স্তবে নিত্য আমার স্তব করবে, আমি তার সমস্ত বিপত্তি বিনাশ করব। যারা মধু-কৈটভ মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভ নিধনে আমার মাহাত্ম্য অষ্টমী নবমী বা চতুর্দশীতে ভক্তিভরে একাগ্র চিত্তে পাঠ বা শ্রবণ করবে, তাদের কোন দুষ্কৃতি থাকবে না বা তার জন্য বিপদ আসবে না। তাদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর হবে ও ইষ্ট বিনাশ হবে না। তাদের শত্রু ও দস্যুভয়, রাজা অস্ত্র অগ্নি ও জল থেকেও ভয় থাকবে না। একাগ্র মনে ও ভক্তিভরে এই মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণই পরম স্বস্ত্যয়ন। এতে মহামারীর যাবতীয় উপসর্গ এবং ত্রিবিধ উৎপাত প্রশমিত হবে। আমার যে আলয়ে নিত্য এই মাহাত্ম্য পাঠ হবে, আমি তা কখনই ত্যাগ করব না, সর্বদাই সেখানে সন্নিহিত থাকব। বলি পূজা অগ্নি কার্য ও মহোৎসবে আমার চরিত্র পাঠ ও শ্রবণ করবে। যে জ্ঞানে

বা অজ্ঞানে আমার এই চরিত পাঠ করে ভক্তি ভরে বলি পূজা বহ্নি
হোম ও মহোৎসব করবে, আমি প্রীতির সঙ্গে তা পরিগ্রহ করব
প্রতি শরৎকালে আমার যে পূজা হয়, তাতে আমার এই মাহাত্ম্য
ভক্তি ভরে শ্রবণ করলে আমার প্রসাদে সর্ববিধ বিঘ্নমুক্ত ও ধনধান্য
পুত্র-সমন্বিত হবে। আমার এই মাহাত্ম্য পবিত্র অবতার পরম্পরা এবং
আমার যুদ্ধ বিক্রম শুনলে লোকে নির্ভয় হবে। এই মাহাত্ম্য শ্রবণে
প্রবৃত্ত হলে লোকের শত্রুনাশ হবে, কল্যাণ হবে এবং বংশ আনন্দিত
হবে। সমস্ত শান্তি কাজে দুঃস্বপ্ন দর্শন ও গ্রহ পীড়ায় এই মাহাত্ম্য
শ্রবণ করবে। তাতে উপসর্গের শান্তি, গ্রহপীড়ার নিবৃত্তি ও দুঃস্বপ্ন
সুস্বপ্নে পরিণত হবে। বালকের উপরে বালগ্রহের দৃষ্টি হলে এই
মাহাত্ম্য পাঠে শান্তি হবে এবং সুহৃদভেদে মৈত্রী সঙ্কলিত হবে
আমার এই চরিত্র পাঠ করা মাত্র দুর্বৃত্তের বল হানি এবং রাক্ষস
পিশাচ ও ভূতের বিনাশ হবে। এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত পাঠে
আমার সান্নিধ্য লাভ হবে। সারা বছর অহর্নিশ পুষ্প অর্ঘ্য ধূপ দীপ
হোম পশু ব্রাহ্মণ ভোজন ও নানাবিধ ভোজ্যে আমার যে প্রীতি হয়
একবার এই চরিত্র পাঠ করলে তার সমান প্রীতি হবে। এ শ্রবণ
করলেও পাপ দূর হবে, রোগ নিবৃত্তি হবে ও বিপদে রক্ষা পাওয়া
যাবে। আমার জন্মের কথা কীর্তন করেও এই ফল পাওয়া যায়
আমার এই দুষ্ট দৈত্য নিধনের জন্য যুদ্ধের কথা শুনলে শত্রুভয় দূর
হবে। তোমরা যে স্তব করলে এবং ব্রহ্মর্ষিরা যে স্তুতি করেছেন, তা
পাঠ বা শ্রবণ করলে শুভ মতির সঞ্চার হবে। অরণ্যে বা প্রান্তরে
অথবা দাবাগ্নিতে পড়লে, দস্যু পরিবৃত বা শত্রু আক্রান্ত অথবা অসহায়
অবস্থায় পড়লে কিংবা বাঘ সিংহ বা হাতী আক্রমণ করলে, রাজার
আজ্ঞায় বধ্য ভূমিতে আনা হলে বা বন্ধনগ্রস্ত হলে অথবা ঝড়ে
পড়লে, কিংবা সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে থাকলে, অথবা দারুণ যুদ্ধে
অস্ত্র-শস্ত্রে আক্রান্ত হলে, কিংবা ভয়ঙ্কর বিঘ্ন পরম্পরার বেদনায়
অস্থির হলে, আমার এই মাহাত্ম্য স্মরণ করা মাত্র সঙ্কট থেকে উদ্ধার

পাওয়া যাবে। আমার চরিত্র স্মরণ করলে আমার প্রভাবে দস্যু বৈরি বা সিংহ দূর থেকেই পলায়ন করবে।

ঋষি বললেন, এই বলেই ভগবতী চণ্ডিকা দেবতাদের সামনে থেকে অন্তর্হিত হলেন। শত্রু নাশের জন্য দেবতারাও নির্ভয় হয়ে স্ব স্ব অধিকার লাভ করে যজ্ঞ ভাগ ভোগে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হবার পর অবশিষ্ট দৈত্যরা পাতালে প্রবেশ করল। রাজা, দেবী ভগবতী জন্ম মৃত্যু বর্জিত হলেও বার বার অবতরণ করে জগতের পরিপালন করেন। তিনিই এই বিশ্বের মোহ উৎপাদন করেন। তাঁর নিকট চাইলে প্রসন্ন হয়ে তিনি বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধি দান করেন। তিনিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে আছেন। প্রলয়ের সময় মহামারী স্বরূপিণী মহাকালী রূপে প্রাদুর্ভূত হন, বিনাশের সময়ে মহামারী মূর্তি পরিগ্রহ করেন। আবার তিনিই সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। তাঁর জন্ম নেই। স্থিতির সময়ে এই সনাতনীই লোকের স্থিতি বিধান করেন, সম্পদের সময়ে তিনিই লোকের গৃহে লক্ষ্মী রূপে অবতরণ করে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। আবার অভাবের সময়ে তিনিই অলক্ষ্মী রূপে তাদের বিনাশ করেন। ফুল ধূপ ও গন্ধাদি দিয়ে তাঁর স্তব ও পূজা করলে তিনি ধন পুত্র ও ধর্মে মতি দেন।

ঋষি বললেন, রাজা, আমি আপনাকে যে দেবীমাহাত্ম্য বললাম, সেই দেবীর প্রভাব এই রকম। তিনি জগৎ ধারণ করে আছেন এবং তিনিই বিষ্ণুর মায়া। তিনি আপনাকে বা এই বৈশ্যকে বা অন্য বিবেকী ব্যক্তিদের যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি মোহিত করেও রাখেন। অনেকে মোহিত হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়। একমাত্র তাঁর আরাধনা করেই লোকে স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হয়।

মার্কণ্ডেয় বললেন, রাজা সুরথ মহর্ষির এই কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করলেন। মমতা ও রাজ্য অপহরণের দুঃখে তাঁর নির্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তপশ্চরণের জন্য প্রস্থান করলেন।

বৈশ্যেরও নির্বেদ জন্মেছিল, সেও তাঁর পথবর্তী হল। তাঁরা উভয়ে দেবী অম্বিকার দর্শনের জন্য নদীর পুলিন আশ্রয় করে দেবীসূক্ত জপ করে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হলেন এবং দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে সেই নদীর তীরেই ফুল ধূপ ও হোম দিয়ে তাঁর উপাসনা করতে লাগলেন। কখনও আহার ত্যাগ করে কখনও বা আহার সংযম করে সমাধিস্থ হয়ে তদ্গত চিত্তে নিজেদের শরীরের রক্ত দেবীর উদ্দেশে বলি স্বরূপ দান করতে আরম্ভ করলেন। এই ভাবে তিন বৎসর আরাধনার পর জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমরা যা প্রার্থনা করছ তা পাবে। আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হয়েছি, তা দেব।

মার্কণ্ডেয় বললেন, রাজা সুরথ এই বর চাইলেন, আমি যেন পরজন্মে রাজ্যচ্যুত না হই এবং ইহজন্মেও যেন শত্রু দলন করে নিজের অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করতে পারি। এর পর বৈশ্য এই প্রার্থনা করলেন, আমার মন মমতায় বদ্ধ হওয়াতে আমি নির্বেদগ্রস্ত হয়েছি। যাতে এই মমতার কারণ আসক্তির বিনাশ হয়, আমার যেন সেই জ্ঞান লাভ হয় এবং আমি যেন প্রজ্ঞাবান হতে পারি।

দেবী বললেন, রাজা, স্বল্পকালের মধ্যেই তোমার রাজ্য লাভ হবে। তুমি সমস্ত শত্রু বিনাশ করে সেই রাজ্য চিরস্থায়ী করতে পারবে। তাছাড়া তুমি দেহাবসানে সূর্যের পুত্র হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সাবর্ণিক নামে মনু হবে। বৈশ্যকে বললেন, তোমাকেও আমি বর দিলাম, তুমি জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধি সমাধান করবে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, দেবী এই ভাবে দুজনকেই অভিলষিত বর দিয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। তাঁরা উভয়ে ভক্তিভরে তাঁর স্তব করলেন। এই ভাবে দেবীর বরে সুরথ সূর্যের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে সাবর্ণি মনু হয়েছিলেন।

॥ দেবীমাহাত্ম্য সমাপ্ত ॥

রুচির উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি তোমাকে সাবর্ণিক মন্বন্তর ও দেবী-মাহাত্ম্যের কথা বললাম। এর পর অপর সাবর্ণিক মনুর বৃত্তান্ত শোন। ইনি দক্ষপুত্র সাবর্ণ। সেই মন্বন্তরে পার মরীচিভর্গ- ও সুধর্মা দেবতা, তাঁরা দ্বাদশ গণে বিভক্ত। তাঁদের ভবিষ্য ইন্দ্র হবেন অগ্নির পুত্র ষড়ানন কার্তিকেয়। মেধাতিথি বসু সত্য জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান সবল হব্যবাহন সপ্তর্ষি হবেন এবং ধৃষ্টকেতু বর্হকেতু পঞ্চহস্ত নিরাময় পৃথুশ্রবা অর্চিষ্মান্ ভূত্যারিম্ন ও বৃহদ্ভয় সাবর্ণের পুত্র ও রাজা হবেন।

এর পর দশম মন্বন্তরের বৃত্তান্ত শোন। ধীমান ব্রহ্মপুত্রের এই মন্বন্তরে সুখাসীন ও নিরুদ্ধ নামে একশো দেবতার আবির্ভাব হবে। শান্তি হবেন ঐ দেবতাদের ইন্দ্র। আপোমূর্তি হবিষ্মান্ সুকৃত সত্য নাভাগ অপ্রতিষ্ঠ ও বাশিষ্ঠ সপ্তর্ষি হবেন। সুক্ষেত্র উত্তমৌজা ভূরিসেন বীর্যবান্ শতানীক বৃষভ অনমিত্র জয়দ্রথ ভূরিদ্যুম্ন ও সুপর্বা মনুর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

এর পর ধর্মপুত্র সাবর্ণ মনুর জন্ম বৃত্তান্ত। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গম কামগ ও নির্মাণপতি এই তিন প্রকার দেবতা ত্রিশ গণে বিভক্ত হয়ে আবির্ভূত হবেন। তার মধ্যে মাস ঋতু ও দিবস নির্মাণপতি হবেন, রাত্রি বিহঙ্গ ও মৌহূর্ত কামগণ হবেন। বিক্রম বৃষ এঁদের ইন্দ্রপদ গ্রহণ করবেন। হবিষ্মান্ বরিষ্ঠ ঋষ্টি আরুণি নিশ্চর বিষ্টি ও অগ্নি সপ্তর্ষি হবেন এবং সর্বগ সুশর্মা দেবানীক পুরূদ্বহ হেমধন্বা দৃঢ়ায়ু হবেন মনুর ভাবী পুত্র।

এর পর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ মনুর দ্বাদশ মন্বন্তর উপস্থিত হলে সুধর্মা সুমনা হরিত রোহিত ও সুবর্ণ পাঁচ দেবতা হবেন। তাঁদের দশ গণ হবে এবং ঋতধামা হবেন তাঁদের ইন্দ্র। দ্যুতি তপস্বী সুতপা তপোমূর্তি তপোনিধি তপোরতি তপোধৃতি হবেন সপ্তর্ষি। দেববান্ উপদেব দেবশ্রেষ্ঠ বিদূরথ মিত্রবান্ মিত্রবিন্দ মনুর ভবিষ্য পুত্র।

তারপর রোচ্য নামে ত্রয়োদশ মনুর পুত্র সপ্তর্ষি রাজা ও দেবতাদের কথা বলছি। সুধর্মা সুকর্মা ও সুশর্মা দেবতা, দিবস্পতি ইন্দ্র এবং ধৃতিমান্ অব্যয় তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুক নির্মোহ সুতপা ও নিষ্প্রকম্প সপ্তর্ষি। চিত্রসেন বিচিত্র নয়তি নির্ভয় দৃঢ় সুনেত্র ক্ষত্র-বৃদ্ধি ও সুব্রত মনুর ভবিষ্য পুত্র।

মার্কণ্ডেয় বললেন, পুরাকালে রুচি নিদ্রা সংযম করে পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতৃগণ তাঁকে গৃহহীন নিঃসঙ্গ দেখে বললেন, তুমি কেন দার পরিগ্রহ করছ না? এতে তুমি দেবঋণ পিতৃঋণ মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণে বদ্ধ হচ্ছ। মৃত্যুর পর তোমার নরক ও অন্য জন্মেও ক্লেশ হবে। রুচি বললেন, দার পরিগ্রহ করলে দুঃখ পেতে হয়, অধোগতি ও নরক ভোগও হয়। আত্মাকে সংযত করলেই মুক্তি। এই জন্যই সৎ বাসনার জলে পূর্বজন্মের পঙ্কলিপ্ত আত্মাকে প্রক্ষালন করা উচিত। পিতৃগণ বললেন, তা ঠিক, কিন্তু তুমি যে পথের পথিক, তাতে কি মুক্তিলাভ হবে! নিষ্কাম হয়ে দান করলে যেমন অশুভ নাশ হয়, তেমনি ভোগেও প্রাক্তন কর্মের ক্ষয় হয়। পাপ পুণ্য নিয়ে মানুষ। রুচি বললেন, বেদে কর্ম মার্গকে অবিদ্যা বলা হয়েছে। তবু আমাকে আপনারা সেই পথ দেখাচ্ছেন কেন? পিতৃগণ বললেন, বেদের কথা সত্য। কিন্তু কর্মে যে এ রকম ঘটে, সে কথা মিথ্যা। কর্মের দ্বারা যে বিদ্যালাভ হয় তাতে সংশয় নেই। তুমি আত্মাকে শুদ্ধ করতে চাও, অথচ বিহিত কর্ম না করার জন্য পাপে জড়িয়ে পড়ছ। বিষ অপকারী পদার্থ হলেও যথাযথ প্রয়োগে যেমন উপকার পাওয়া যায়, তেমনি অবিদ্যা থেকেও উপকার লাভ হয়। তুমি দার পরিগ্রহ কর। বিগর্হিত পথে চলে তোমার জন্ম যেন বিফল না হয়। রুচি বললেন, এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তার উপর দরিদ্র। এ অবস্থায় কে আমাকে কন্যাদান করবে। পিতৃগণ বললেন, বৎস, কথা না শুনলে আমাদের পতন ও তোমার অধোগতি হবে। বলে তাঁরা সহসা অদৃশ্য হলেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, পিতৃগণের কথায় রুচির মন উদ্বিগ্ন হল এবং তিনি পত্নী লাভের জন্য পৃথিবী পর্যটনে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কোথাও তা পেলেন না। তাতে চিন্তান্বিত হয়ে স্থির করলেন যে ব্রহ্মার আরাধনা করবেন। এই ভাবে শতবর্ষ তপশ্চরণের পর ব্রহ্মার দর্শন পেলেন। ব্রহ্মা বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েছি, তোমার কী অভিলাষ বল। রুচি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে সব কথা নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, তুমি প্রজাপতি হয়ে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর সিদ্ধিলাভ করবে। এখন তুমি পিতৃগণের পূজা কর, তাঁরা তুষ্ট হলে কী না দান করেন।

ব্রহ্মার কথায় রুচি নদীর তীরে পিতৃগণের সন্তোষের জন্য একাগ্র মনে ভক্তি ভরে স্তব করতে আরম্ভ করলেন, শ্রাদ্ধে যাঁরা দেবতা রূপে অধিষ্ঠান করেন, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। যাঁরা এই অখিল জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁরা আমার এই শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হয়ে আমার হিত করুন।

সহসা সমুচ্ছিত তেজ রাশি তাঁর সামনে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে ফেলল। তাই দেখে রুচি নতজানু হয়ে আবার স্তব আরম্ভ করলেন, যাদের মূর্তি নেই, আছে শুধু তেজ, তাঁদের আমি নমস্কার করি। তাঁরা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

রুচি দেখলেন যে তিনি যে পুষ্প ও গন্ধানুলেপন নিবেদন করেছিলেন, তাতেই বিভূষিত হয়ে পিতৃগণ তাঁর সামনে অবস্থান করছেন। তাই দেখে তিনি ভক্তি ভরে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁদের পৃথক ভাবে স্তব করে বললেন, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার। প্রসন্ন হয়ে পিতৃগণ বললেন, তুমি বর নাও। রুচি বললেন, ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করতে আদেশ করেছেন। তাই আমি পত্নী লাভে ইচ্ছা করি। পিতৃগণ বললেন, এই মুহূর্তেই এখানে তোমার মনোরমা পত্নী আবির্ভূত হবেন। তাঁর গর্ভে তোমার যে পুত্র জন্মাবে, তিনি হবেন মনু। তিনি রৌচ্য নামে মন্বন্তরের অধিপতি হবেন।

তাঁর পুত্ররা হবেন পৃথিবী পালক এবং তুমি প্রজাপতি হয়ে সিদ্ধিলাভ করবে। যে ভক্তি ভরে তোমার এই স্তোত্র পাঠ করে আমাদের স্তব করবে, তাকে আমরা আত্মজ্ঞান অর্থ পুত্র আরোগ্যাদি বিবিধ ভোগ প্রদান করব। শ্রাদ্ধে এই স্তোত্র পাঠে আমাদের দ্বাদশ বার্ষিকী তৃপ্তি হবে। গয়ায় পুষ্করে কুরুক্ষেত্রে ও নৈমিষে শ্রাদ্ধ করলে যে ফললাভ হয়, এই স্তোত্র শ্রবণ করলে সেই ফললাভ হবে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, পিতৃগণ প্রস্থান করলে নদী থেকে প্রম্লোচা নামের অপ্সরা উত্থিত হয়ে রুচির সামনে এসে বলল, বরুণের পুত্র পুষ্কর ও আমার সুন্দরী কন্যাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করছি, গ্রহণ কর। তোমাদের পুত্র মনু হবেন। রুচি সম্মত হতেই প্রম্লোচা তাঁর কন্যা মালিনীকে জল থেকে তুললেন এবং রুচি মুনিদের এনে সেই নদীর তীরেই বিহিত বিধানে তার পাণি গ্রহণ করলেন। তাঁদের পুত্রই রৌচ্য নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর মন্বন্তরের সব কথা তোমাকে বলেছি।

ভূতির উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় বললেন, এর পর ভৌত্যের উৎপত্তি ও তাঁর অধিকারের দেবতা ঋষি পুত্র ও রাজাদের কথা শোন। ভূতি নামে অঙ্গিরার এক শিষ্য ছিলেন। তিনি অতি কোপন স্বভাব ছিলেন ও ভয়াবহ শাপ দিতেন, মিষ্ট কথা বলতে তিনি জানতেন না। বায়ু তাঁর আশ্রমে ধীরে প্রবাহিত হতেন, সূর্যও মৃদু তাপ দিতেন, মেঘও এমন ভাবে বর্ষণ করত যে কদম হত না এবং চন্দ্রও নাতিশীত কিরণ বিকিরণ করতেন। এমন কি ঋতুরাও তাঁর ভয়ে নিজেদের পর্যায় ক্রম ত্যাগ করে তাঁর আজ্ঞায় আশ্রমের বৃক্ষে সব সময়ে ফল পুষ্প ফোটাত। তাঁর প্রভাবে ভীত আশ্রমের নিকটস্থ জলও তাঁর ইচ্ছায় কমণ্ডলুতে প্রবেশ করত। তিনি অপুত্রক ছিলেন

বলে মনে মনে স্থির করলেন যে পুত্র কামনায় তিনি আহার সংযম করে শীত বা অনলে পাতিত হয়ে তপস্যা করবেন। কিন্তু এই ভাবে তপস্যা করেও যখন পুত্র লাভে সমর্থ হলেন না, তখন তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

তার ভ্রাতা সুবচা যজ্ঞে ভূতিকে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি যজ্ঞে যাবেন বলে তার এক শান্ত স্বভাব বিনীত বুদ্ধিমান শিষ্য শান্তিকে বললেন, আমি সুবচার যজ্ঞে যাব, তুমি আশ্রমে থেকে অগ্নি যাতে নির্বাপিত না হয় তার জন্য জাগ্রত থাকবে। শিষ্য 'যে আজ্ঞা' বলতেই গুরু ভ্রাতার যজ্ঞে গেলেন।

এদিকে শান্তি যখন গুরুর জন্য সংগ্রহ পুষ্প ফল আহরণ প্রভৃতি কর্মে প্রবৃত্ত হলেন, অগ্নি তখনই নির্বাপিত হলেন। শান্তি দুঃখিত ও ভীত হয়ে ভাবতে লাগলেন, এখন কী করা যায়। তার আশ্রিত অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে দেখলে বিষম বিপদে পড়তে হবে, অন্য অগ্নি স্থাপন করলেও ভস্ম হতে হবে। গুরু ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রত্যক্ষ করেন, সুতরাং এ বিষয় গোপন থাকবে না। এই সমস্ত ভেবে তিনি অগ্নির শরণাপন্ন হলেন এবং চিত্ত সংযত করে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হয়ে তার স্তব করতে লাগলেন, সর্বভূতের সাধন স্বরূপ বিরাটরূপী অগ্নিকে নমস্কার। তুমি প্রসন্ন হও, আমাকে রক্ষা কর। তোমার যে কল্যাণময় রূপ ও সাতটি জিহ্বা, তাই দিয়ে আত্মজ পুত্রকে পিতার ন্যায় তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমি তোমার স্তব করছি।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এই ভাবে স্তব করলে অগ্নি তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। শান্তি বললেন, আপনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে আমি কৃতার্থ হলাম। আপনি এই বর দিন যে গুরু যেন আশ্রমে ফিরে দেখতে পান যে অগ্নিগৃহে আপনি আগের মতোই সন্নিহিত আছেন। আর একটি অনুগ্রহ করুন। আমার নিঃসন্তান

গুরুর যেন একটি পুত্র লাভ হয় এবং তিনি যেন সেই পুত্রের মতো সমস্ত প্রাণীতেই মৈত্রীভাব অবলম্বন করেন। অগ্নি বললেন, তুমি গুরুর জন্যই দুটি বর চাইলে, নিজের জন্য নয়। আমি তোমার প্রতি আরও প্রীত হয়ে বলছি যে তুমি যা চাইলে তাই হবে। তোমার গুরু সর্বজীবে মৈত্রী প্রদর্শন করবেন এবং তাঁর পুত্র ভৌত্য নামে মন্বন্তরের অধিপতি হবেন। যে তোমার এই স্তোত্র দিয়ে আমার স্তব করবে, তার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ ও পুণ্য সঞ্চয় হবে। এই কথা বলেই অগ্নি অন্তর্হিত হলেন এবং শান্তি পুলকিত কলেবরে গুরুর আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন যে গুরুর প্রতিষ্ঠিত অগ্নি পূর্বের ন্যায় জাজ্বল্যমান আছেন।

আশ্রমে ফিরে গুরু বললেন, বৎস, তোমার ও অন্যান্য জীবের প্রতি আমার এত মৈত্রী সঞ্চারিত হয়েছে কেন, তা বুঝতে পারছি না। তোমার জানা থাকলে বল। শান্তি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা গুরুর গোচর করলেন। সব শুনে গুরু সস্নেহে তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁকে সমুদয় বেদ প্রদান করলেন।

যথাসময়ে ভৌত্য নামে মনু ভূতির পুত্র রূপে জন্মালেন। তাঁর মন্বন্তরে চাক্ষুষ কনিষ্ঠ পবিত্র ভ্রাজির ও ধারাবৃক এই পাঁচ দেবতা আবির্ভূত হবেন। শুচি হবেন ইন্দ্র। অগ্নীধ্র অগ্নিবাহু শুচি মুক্ত মাধব শক্র ও অজিত সপ্তর্ষি হবেন। মনুর পুত্র হবেন গুরু গভীর ব্রধ্ন ভরত অনুগ্রহ স্ত্রীয়াণী প্রতীর বিষ্ণু সংক্রন্দন তেজস্বী ও সুবল।

তোমাকে আমি চতুর্দশ মন্বন্তরের কথা বললাম। ক্রমানুসারে এই মন্বন্তর কথা শুনলে পুণ্য সঞ্চয় ও সন্ততি লাভ হয়।

সূর্যের কথা

ক্রৌষ্টুকি বললেন, এখন আমার ব্রহ্মা থেকে রাজাদের বংশ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, যিনি জগতের মূল সেই প্রজাপতি থেকে

আরম্ভ করে সমস্ত রাজার উৎপত্তি ও চরিত কথা শোন। বহু যজ্ঞ ও যুদ্ধ জয় করেছেন, এমন অনেক রাজা এই বংশ অলংকৃত করেছেন। এঁদের বংশকথা শুনলে পাপমোচন হয়। পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় নিজের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের ও বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে তাঁর পত্নীর সৃষ্টি করেন। অদিতি দক্ষের কন্যা রূপে উৎপন্ন হলেন এবং কশ্যপ সেই কন্যার গর্ভে সূর্যের জন্ম দিলেন। সূর্য ব্রহ্ম স্বরূপ, জগতের বরদাতা, আদি মধ্য ও অনন্ত স্বরূপ এবং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর থেকেই এই অখিল জগতের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁতেই তা প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড, সর্বভূত, সর্বাত্মা, পরমাত্মা ও সনাতন।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, সূর্যের স্বরূপ ও কেন তিনি কশ্যপের পুত্র হলেন তা শোনবার ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এই সংসার অন্ধকারে বিলীন হলে এক অণ্ড উদ্ভূত হয়। তার ক্ষরণ নেই এবং তা সকলের আদি কারণ। পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তার অন্তরে থেকে তা বিদারিত করেন। এই ব্রহ্মাই জগতের স্রষ্টা। তাঁর মুখ থেকে ওম্ শব্দের উৎপত্তি হয়, তা থেকে প্রথমে ভূ, পরে ভুবঃ ও স্বঃ উদ্ভূত হয়। এই তিনই সূর্যের স্বরূপ এবং ওম্ থেকেই তাঁর সূক্ষ্ম রূপ আবির্ভূত হয়েছে। তার পর তা থেকে মহ জন তপ ও সত্য ইত্যাদি ভেদে স্থূল ও স্থূলতর সপ্ত মূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। এই সব রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। আমি যে ওম্ স্বরূপ পরম সূক্ষ্ম রূপের কথা বললাম, তাই সবার আদি ও অন্ত স্বরূপ। এই রূপের কোন আকার নেই। ইনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং এটিই তাঁর বপু।

সেই অণ্ড বিভিন্ন হলে ব্রহ্মার প্রথম মুখ থেকে প্রথমে ঋক্ পরে দক্ষিণ মুখ থেকে যজুঃ ও পশ্চিম মুখ থেকে সাম আবির্ভূত হয়। তার পর উত্তর মুখ থেকে অথর্ব প্রকটিত হয়। আদি তেজ ওমের সঙ্গে এই সব মিলিত হতেই অন্ধকার বিনষ্ট হয় এবং সংসার

সুনির্মল হয়ে অধঃ ঊর্ধ্ব ও তির্যক স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তারপর সেই ছন্দোময় তেজ মণ্ডলী ভূত হয়ে পরম তেজের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এই ভাবেই আদিতে উদ্ভূত হন বলেই তাঁর নাম হয় আদিত্য। এই অব্যয়াত্মক তেজই বিশ্বের কারণ। ঋক যজু সাম সংজ্ঞার ত্রয়ীই প্রাতে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তাপ প্রদান করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি কালে ঋঙ্ময়, বিষ্ণু স্থিতিকালে যজুর্ময় ও রুদ্র অন্তকালে সামময় হয়ে থাকেন। এই জন্যই ভাস্কর বেদাত্মা, বেদসংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় পরম পুরুষ এবং তিনিই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু। রজ ও সত্ত্বাদি গুণ আশ্রয় করে তিনিই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি বেদমূর্তি ও অখিল মর্ত্যমূর্তি, আবার অমূর্তিও। তিনি আদি ও বিশ্বের আশ্রয়, তিনি জ্যোতি স্বরূপ। তিনি বেদান্ত গম্য ও পরাৎপর। তাই দেবতারা সর্বদা তাঁর স্তব করেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, সূর্যের তেজে ঊর্ধ্ব ও অধ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পিতামহ চিন্তা করতে লাগলেন, আমি সৃষ্টি করলেই সূর্যের তেজে তা বিনাশ পাবে। জল ছাড়া বিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই ভেবে ব্রহ্মা তন্ময় হয়ে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন, তুমি সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। আমি সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছি, কিন্তু তোমার তেজ তাতে বিঘ্ন করছে তাই তুমি তোমার তেজ উপসংহরণ কর।

এই স্তবে সূর্য তাঁর তেজ সংহরণ করে স্বল্পমাত্র তেজ ধারণ করলেন। তখন ব্রহ্মা কল্পান্তরে যে রকম সৃষ্টি করেছিলেন, সেই রকম দেবতা অসুর মানুষ পশু বৃক্ষ লতা ও নরক সৃষ্টি করলেন।

সেই সময়ে তাঁর মরীচি নামে যে পুত্র উদ্ভূত হলেন, কশ্যপ তাঁরই পুত্র। তিনি কাশ্যপ নামে পরিগণিত হয়ে থাকেন। দক্ষের তেরটি কন্যা তাঁর স্ত্রী। তাঁর দেব দৈত্য ও উরগাদি বহু পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। অদিতি দেবতাদের, দিতি দৈত্যদের ও দনু দানবদের জন্মদান করেন। বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ, যক্ষ রাক্ষস ও পক্ষীরা জন্মাল। কদ্রু নাগ মুনি ও গন্ধর্ব প্রসব করলেন। ক্রোধা থেকে কুলা ও রিষ্টা থেকে

অপ্সরার জন্ম হল। ইরার গর্ভে ঐরাবত প্রভৃতি উৎপন্ন হল, তাম্রা শ্যেনী প্রভৃতি কন্যার জন্ম দিলেন, ইলার গর্ভে পাদপের জন্ম হল এবং প্রধা প্রসব করলেন পতগ।

কশ্যপের পুত্রদের মধ্যে দেবতারাই প্রধান। ব্রহ্মা তাঁদের যজ্ঞভাগভাগী ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর করলেন। তাদের বৈমাত্র দৈত্য ও দানবরা মিলিত হয়ে তাঁদের বিঘ্ন করতে লাগল। রাক্ষসরাও তাতে যোগদান করল। এর জন্য উভয় পক্ষে দারুণ যুদ্ধ হল। দেবমানের এক হাজার বছর যুদ্ধের পর দেবতাদের পরাজয় হল। দৈত্য ও দানবরা জয়ী হয়ে আরও প্রবল হয়ে উঠল। অদিতি তাঁর পুত্রদের দুরবস্থা দেখে নিয়ম বন্ধন ও আহার সংযম করে একাগ্র হৃদয়ে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন, তুমি তেজস্বীদের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। এই ভাবে বহুকাল অহর্নিশ স্তব করবার পর অদিতি দেখলেন যে রাশীকৃত তেজ একসঙ্গে আকাশ ও পৃথিবী আশ্রয় করে দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে বিরাজ করছে। তিনি ভীত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, তুমি প্রসন্ন হও। ভক্তের প্রতি অনুকম্পা কর, রক্ষা কর আমার পুত্রদের।

সূর্য তখন তাঁর তেজ-মণ্ডল থেকে আবির্ভূত হয়ে তপ্ত তাম্রের মতো কলেবরে অদিতির নয়নগোচরে এলেন। অদিতি তাঁকে প্রণাম করতেই সূর্য বললেন, বর প্রার্থনা কর। অদিতি নতজানু হয়ে তাঁকে বললেন, দৈত্য ও দানবরা আমার পুত্রদের ত্রিভুবন ও যজ্ঞভাগ হরণ করেছে। তুমি নিজের অংশে তাদের ভাই হয়ে শত্রু নাশ কর। সূর্য বললেন, আমি তোমার গর্ভে সহস্রাংশে জন্ম নিয়ে তোমার পুত্রদের শত্রু বিনাশ করব। বলেই অন্তর্হিত হলেন।

তারপর সূর্যের সৌষুম্ন নামে কর অদিতির উদরে অবতরণ করলে তিনি কৃচ্ছ্র সাধন করে সেই দিব্য গর্ভ বহন করতে লাগলেন। তাই দেখে কশ্যপ কিঞ্চিৎ কুপিত হয়ে বললেন, তুমি উপবাস করে এই গর্ভাণ্ডকে মারবে নাকি! অদিতি বললেন, একে আমি মারিত

অর্থাৎ মারিনি, এ বিপক্ষের মৃত্যুর নিমিত্ত হবে। বলে অদিতি ক্রুদ্ধ হয়ে সেই গর্ভ ত্যাগ করলে তা তেজে প্রজ্বলিত হতে লাগল। তাই দেখে কশ্যপ স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। তাতে সূর্য সেই গর্ভাণ্ড থেকে প্রকট হয়ে নিজের তেজে চারি দিক পরিব্যাপ্ত করলেন। দৈববাণী হল, তুমি এই অণ্ডকে মারিত অর্থাৎ মেরে ফেললে বলে তোমার এই পুত্রের নাম হবে মার্তণ্ড। ইনি জগতে সূর্যের কাজ করবেন এবং অসুরদের সংহার করবেন।

এই কথা শুনে ইন্দ্র অসুরদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং সেই যুদ্ধে মার্তণ্ডের দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁর তেজে অসুররা ভস্মীভূত হল।

মার্কণ্ডেয় বললেন, প্রজাপতি বিশ্বকর্মা সূর্যকে প্রসন্ন করে তাঁর কন্যা সংজ্ঞাকে সম্প্রদান করলেন। তাঁদের সন্তান তিনজন, দুটি পুত্র ও একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈবস্বত মনুর কথা পূর্বেই বলেছি। তাঁর পর যম ও যমী যমল জন্মেছিলেন। বিবস্বান্ মার্তণ্ড তাঁর তেজে স্থাবর-জঙ্গমময় তিন লোক সন্তপ্ত করে তুললেন। সংজ্ঞা সূর্যের সেই রূপ দেখে কিছুতেই তাঁর তেজ সহ্য করতে না পেরে নিজের ছায়াকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আমি আমার পিতৃগৃহে যাচ্ছি। তুমি আমার কথায় সূর্যের নিকট নির্বিকার ভাবে থাকো এবং আমার দুই পুত্র ও কন্যাকে লালন পালন কর। কিন্তু সাবধান, সূর্যের নিকট এ কথা প্রকাশ কোরো না। ছায়া বললেন, সূর্য আমার কেশ গ্রহণ বা শাপ দান না করা পর্যন্ত আমি এ কথা তাঁকে বলব না। তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। ছায়ার এই উত্তর পেয়ে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে গিয়ে কিছুকাল বাস করলেন। কিন্তু পিতা তাঁকে বার বার স্বামীর কাছে যাবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বড়বা অর্থাৎ অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তর কুরুতে গিয়ে নিরাহারা হয়ে তপশ্চরণ করতে লাগলেন।

এদিকে ছায়া সংজ্ঞার রূপ নিয়ে সূর্যের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর গর্ভেও দুই পুত্র ও এক কন্যা হল। যিনি আগে জন্মালেন, তিনি বৈবস্বত মনুর তুল্য, সেইজন্য তিনি সাবর্ণি নামে বিখ্যাত হলেন।

দ্বিতীয় পুত্র শনৈশ্চর গ্রহ হলেন এবং কন্যা তপতীকে রাজা সম্বরণ পত্নীত্বে গ্রহণ করেন।

ছায়া নিজের সন্তানদের যেমন স্নেহ করতেন, সংজ্ঞার সন্তানদের তেমন করতেন না। মনু তা ক্ষমা করেন, কিন্তু যম তা পারলেন না। বালস্বভাবের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পাদপ্রহারে উদ্যত হলেন। তাতে ছায়া শাপ দিলেন, তোমার ঐ পা পতিত হবে। যম এই শাপে পীড়িত চিত্ত হয়ে মনুর সঙ্গে একযোগে পিতাকে সব বললেন। যম বললেন, মা আমাদের বড়দের সমান স্নেহ করেন না বলে আমি লাথি মারতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু মারি নি। কিন্তু তিনি আমার পা খসে যাবে বলে শাপ দিয়েছেন। ছেলেরা বিগুণ হলেও মা কখনও তা হন না। তাই আমাদের মনে হচ্ছে যে উনি আমাদের প্রকৃত মা নন। তা হলে এ রকম শাপ দিতে পারতেন না। আমার পা যাতে মায়ের শাপে পড়ে না যায়, আপনি তাই করুন। সূর্য বললেন, পুত্র, তুমি ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী। তোমার যখন রাগ হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সব শাপেরই প্রতিঘাত আছে। কিন্তু মায়ের শাপের নিবর্তন হয় না। আমি তোমাকে এই অনুগ্রহ করছি যে কৃমিরা তোমার পায়ের মাংস নিয়ে মহীতলে পড়বে, তাতেই তোমার মায়ের কথা সত্য ও তোমার পরিত্রাণ হবে।

তার পর সূর্য ছায়াকে বললেন, পুত্ররা সবাই সমান, তবু তুমি একজনকে কেন বেশি স্নেহ কর? তারা বিগুণ হলেও মা কখনও শাপ দেয় না। এতে মনে হচ্ছে, তুমি ওদের জননী সংজ্ঞা নও, অন্য কেউ আমার কাছে এসেছ। কিন্তু ছায়া এ কথার উত্তর দিলেন না বলে সূর্য আত্মাকে সমাহিত করে যোগে সমস্ত ঘটনা অবলোকন করলেন। তারপর তিনি শাপ দিতে উদ্যত হলে ছায়া ভয়ে সব কথা নিবেদন করলেন।

... ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শ্বশুরের নিকটে গেলেন। তাঁকে সব দক্ষ

করতে অভিলাষী দেখে বিশ্বকর্মা বললেন, তোমার তেজ দুঃসহ হয়ে উঠেছিল বলেই সংজ্ঞা তোমার তেজহীন স্নিগ্ধ রূপের জন্য কঠোর তপস্যা করছে। সেখানে গেলেই তুমি তা দেখতে পাবে। ব্রহ্মার কথা আমার মনে পড়ছে। যদি তুমি চাও তো আমি তোমার রূপ কমনীয় করে দিতে পারি।

সূর্যের রূপ পূর্বে মণ্ডলাকার ছিল। সেই জন্য তিনি বিশ্বকর্মাকে বললেন, তাই করুন। বিশ্বকর্মা এই আজ্ঞা পেয়ে সূর্যকে শাকদ্বীপে ভ্রমিতে আরোপিত করে তেজ ক্ষয় করতে উদ্যত হলেন। তাতে পৃথিবী আকাশে উঠলেন এবং গ্রহ চন্দ্র ও তারাদের সঙ্গে আকাশ আকুল হয়ে উঠল। সমুদ্রের জল বিক্ষিপ্ত ও পাহাড় বিদীর্ণ হল। সূর্য সবেগে ভ্রমণ করাতে আকাশ পাতাল ও পৃথিবী বিভ্রান্ত হয়ে উঠল। দেবতা ও দেবর্ষিরা ব্রহ্মার সঙ্গে স্তব করতে লাগলেন, তুমি জগতের নাথ, সকলের শান্তি বিধান কর। এই সময়ে ইন্দ্রও এসে বললেন, তোমার জয় হোক। বশিষ্ঠ প্রমুখ সপ্তর্ষি ও বালখিল্যরাও সূর্যের স্তব করতে লাগলেন। বিদ্যাধর রাক্ষস যক্ষ পন্নগ ও গন্ধর্ব হাহা হুহু তুম্বুরুর সঙ্গে নারদ মিলিত হয়ে স্তবগানে প্রবৃত্ত হলেন। অপ্সরা-গণ অভিনয় সহকারে নৃত্য আরম্ভ করল এবং নানাবিধ বাদ্যে চারি দিক কোলাহলে পূর্ণ হল। বিশ্বকর্মা ধীরে ধীরে সূর্যের তেজ কুঁদে চেঁচে ফেলতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে স্তব করলেন, তুমিই সমস্ত প্রভার আকর, তোমাকে প্রণাম করি।

বিশ্বকর্মা এইভাবে সূর্যের তেজের ষোড়শ ভাগ মণ্ডলস্থ করলেন এবং পনের ভাগ তেজ চেঁচে ফেলাতে তাঁর শরীর কান্তিময় হল। সেই পনর ভাগ তেজ কুঁদে বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর চক্র, শিবের শূল, কুবেরের শিবিকা, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়র শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদেরও অস্ত্র নির্মাণ করে দিলেন।

এর পর সূর্য সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞা তপস্যার জন্য বড়বা মূর্তি ধারণ করেছেন। তিনিও উত্তর কুরুতে গিয়ে অশ্ব

মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর কাছে গেলেন। পরপুরুষ-শঙ্কায় সংজ্ঞা তাঁর পৃষ্ঠ রক্ষণে তৎপর হয়ে সামনে এলেন। এতে পরস্পরের নাসিকা যোগ হলে নাসারন্ধ্র দিয়ে সূর্যের তেজ বড়বায় প্রবেশ করল। তাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বের মুখ থেকে উৎপন্ন হলেন। তারপর রেবন্তের জন্ম হল। তাঁর শরীরে কবচ, হাতে ধনুর্বাণ ও তূণ এবং তিনি অশ্বারোহণ করে আছেন।

সূর্য এর পরে তাঁর নির্মল ও শান্ত রূপ প্রদর্শন করলে সংজ্ঞা আহ্লাদিত হলেন। সূর্য তাঁকে নিজের গৃহে ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর প্রথম পুত্র বৈবস্বত মনু হলেন। দ্বিতীয় পুত্র যম ধর্মের অনুসারী হলেন, তাঁর নাম হল ধর্মরাজ। একমাত্র ধর্মে তাঁর দৃষ্টি ও শত্রু-মিত্রে সমভাব দেখে সূর্য তাঁকে যমের কাজে নিয়োগ করলেন, তাঁকে লোকপাল পদ ও পিতৃগণের আধিপত্যও দিলেন। যমুনাকে নদী করে দিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবতাদের বৈদ্য পদে নিযুক্ত করলেন এবং রেবন্তকে গুহ্যকদের অধিপতি করে বললেন, তোমাকে স্মরণ করলে লোকের শত্রুভয় দস্যুভয় ও বিপদ দূর হবে। ছায়ার পুত্র সাবর্ণও ভবিষ্য কালে অষ্টম মনু হবেন। তিনি এখনও মেরুপৃষ্ঠে ঘোর তপস্যা করছেন। তাঁর ভ্রাতা শনৈশ্চর পিতার আজ্ঞায় গ্রহ হয়েছেন। যারা সূর্যের এই জন্ম ও মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাদের আপৎ দূর হয় ও অহোরাত্র কৃত পাপের শান্তি হয়।

রাজ্যবর্ধনের উপাখ্যান

ক্রৌষ্টুকি বললেন, সূর্যের কথা আমার আরও শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, পুরাকালে সূর্য যা করেছিলেন, তাও তোমাকে বলছি। দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন রাজা হয়ে এমন ভাবে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন যে তাঁর রাজ্যে ধন ও জন বৃদ্ধি হতে লাগল এবং কোন উপসর্গ বা ভয় রইল না। সাত হাজার বছর এক দিনের মতো অতিবাহিত হয়ে গেল। দাক্ষিণাত্যের রাজা বিদূরথের কন্যা মানিনী

ছিলেন তাঁর রাণী। একদিন তিনি সমবেত রাজাদের সামনেই অশ্রুপাত করলেন। রাজা বার বার এই অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাণী রাজার মাথার পলিত কেশ দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন, আপনার চুল পেকে সাদা হয়েছে। রাজা হেসে সবার সামনেই বললেন, আমি তো জীবনে সবই ভোগ করেছি। এখন আমার অরণ্যবাসের সময়। কাজেই তুমি এর জন্য কেঁদো না। এ কথা শুনে সকলে বলল, মহারাজ, আপনি বনে গেলে আমরাও আপনার সঙ্গে যাব। রাজা বললেন, আমার মাথায় যে পাকা চুল, তা মৃত্যুর দূত স্বরূপ। এখন আমার পুত্রকে রাজা করে ভোগ সুখে বিরত হয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করার সময় এসেছে। তিনি দৈবজ্ঞদের বললেন পুত্রের রাজ্যাভিষেকের লগ্ন স্থির করতে।

কিন্তু রাজার কথায় সবার মন এমন ব্যাকুল হয়ে উঠল যে তাঁরা বললেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞান নষ্ট হয়েছে। তখন অন্য স্থান থেকে ব্রাহ্মণ আনা হলেও তাঁরা বললেন, যতদিন আমরা বাঁচব, ততদিন আপনাকেই সিংহাসনে দেখতে চাই। কিন্তু রাজা যখন কোন মতেই রাজী হলেন না, তখন সকলে মিলে মন্ত্রণা করে স্থির করলেন যে সূর্যের আরাধনা করে রাজার আয়ু প্রার্থনা করা হবে।

তাঁরা অর্ঘ্য ও উপচার দিয়ে সূর্যের পূজায় প্রবৃত্ত হলেন। কেউ মৌনী হয়ে জপ করতে লাগলেন, কেউ সাম গান করতে লাগলেন, কেউ আহার পরিহার করে নদীর তীরে শয়ন করে তপশ্চরণ, কেউ অগ্নিহোত্র পরায়ণ হয়ে রবিসূক্ত জপ এবং কেউ বা সূর্যের দিকেই দৃষ্টি ন্যস্ত করে রইলেন। সকলের এই অধ্যবসায় দেখে সুদামা নামে এক গন্ধর্ব সেখানে এসে বললেন, যদি সূর্যের আরাধনা করতে চাও তো কামরূপে মহাশৈলের উপরে সিদ্ধগণ নিষেবিত বিশাল নামের বনে যাও। সেই বন সিদ্ধক্ষেত্র. সেখানে উপাসনা করলে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে।

এই কথা শুনেই দ্বিজাতিরা সেখানে গিয়ে সূর্যের পবিত্র ও

মঙ্গলময় আয়তন দেখলেন এবং আহার সংযম ও আলস্য ত্যাগ করে ধূপ পুষ্প গন্ধ ও অনুলেপন দিয়ে জপ হোম করে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন. যিনি দেবতাদেরও ঈশ্বর, আমরা সেই সূর্যের শরণাপন্ন হলাম। যিনি জগতের জীবন, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। এই ভাবে তিন মাস স্তব করার পরে সূর্য সন্তুষ্ট হয়ে অরুণসম প্রভায় মণ্ডল থেকে অবতরণ করে তাঁদের দর্শন দিলেন। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন. তুমি আমাদের সকলকে রক্ষা কর। সূর্য বললেন, তোমরা কী চাও বল। তাঁরা বললেন. আমাদের রাজা যেন স্থির যৌবন ও নিরোগ হয়ে দশ হাজার বছর বেঁচে থাকেন। তথাস্তু বলে সূর্য দুর্নিরীক্ষ্য হলেন।

বর লাভ করে তাঁরা রাজার কাছে ফিরে এসে সব কথা তাঁকে জানালেন। রাণী মানিনী আহ্লাদিত হলেন। কিন্তু রাজা চিন্তাগ্রস্ত হলেন, কোন কথা বললেন না। রাণী বার বার এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার সামনে তোমরা সবাই মরবে, আর আমি জীবিত থেকে তা দেখব, এ আমার অভ্যুদয় নয়, এ মহা বিপদের কথা। রাণী বললেন সত্যিই তাই। কিন্তু এখন উপায় কী! রাজা বললেন, এবারে আমি সেই পর্বতে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করব। তোমরাও যাতে আমার সঙ্গে দশ হাজার বছর বেঁচে থাকো, তার জন্যেই তপস্যা করব। 'আচ্ছা' বলে রাণীও রাজার সঙ্গে পর্বতে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। আহার পরিহার করে শীতাতপ সহ্য করে কিঞ্চিদধিক এক বছর কঠিন তপস্যার পরে সূর্যের নিকট অভিলষিত বরলাভ করে তাঁরা ফিরে এলেন। তারপর তিনি অনেক যজ্ঞ করলেন, দান করলেন এবং সবার সঙ্গে স্থির যৌবন নিয়ে সব কিছু ভোগ করলেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, ভৃগুবংশীয় প্রমতি সবিস্ময়ে গাথা গান করেছিলেন, সূর্য ভক্তির কী শক্তি! রাজ্যবর্ধন নিজের ও স্বজনের আয়ু বৃদ্ধি করে নিয়েছিলেন। ক্রৌষ্টুকি, তোমার কথাতেই আমি

সূর্যের এই মাহাত্ম্য বললাম। ব্রাহ্মণেরা এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করলে সপ্তরাত্র কৃত পাতক মুক্ত হয়।

ইলার কথা

মার্কণ্ডেয় বললেন, সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি মনু সূর্যের পুত্র। ইক্ষ্বাকু নাভগ রিষ্ট নরিষ্যন্ত নাভাগ পৃষধ্র ও ধৃষ্ট মনুর পুত্র। এঁরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ। মহাপরাক্রান্ত ও কীর্তিমান এবং সকলেই পৃথিবী-পালক হয়েছিলেন। মনু পুনরায় বিশিষ্টতর পুত্র কামনায় মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করে ইলা নামে কন্যা লাভ করেন। কন্যা জন্মেছে দেখে মনু মিত্রা-বরুণকে বললেন, পুত্র লাভের জন্যই আমি যজ্ঞ করেছিলাম, আপনারা প্রসন্ন হয়ে থাকলে এই বর দিন যে এই কন্যা পুত্র হোক। তাঁরা তথাস্তু বলতেই সেই কন্যা সুদ্যুম্ন নামে পুত্রে রূপান্তরিত হল।

একবার মৃগয়ার জন্য বিচরণের সময় ঈশ্বরের কোপে পড়ে সুদ্যুম্ন স্ত্রী হয়ে পুরূরবা নামে এক পুত্র প্রসব করলেন। তার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পুনরায় পুরুষত্বলাভ করে রাজা হলেন। তাঁর তিন পুত্রের নাম উৎকল বিনয় ও গয়। এঁরা রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু পুরূরবার জন্ম তাঁর স্ত্রী অবস্থায় বলে তিনি পৃথিবীর ভাগ পান নি। তার কারণ তিনি বুধের পুত্র। বশিষ্ঠের কথায় তাঁকে প্রতিষ্ঠান নামে পুর দেওয়া হয়, তিনি সেখানকার রাজা হলেন।

পৃষধ্রের কথা

মনুর পৃষধ্র নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি মৃগয়ার জন্য অরণ্যে গিয়ে কোন মৃগ পেলেন না। ইতস্তত ভ্রমণ করে তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অবস্থায় কোন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের হোমধেনু দেখে তাকে গবয় ভেবে শরাঘাত করলেন। হোমধেনুটির হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় তা ধরাতলে পতিত হল। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচারী পুত্র বাভ্রবা এই দৃশ্য দেখে রুষ্ট হয়ে উঠলেন। রাজা তাঁর দুই চোখ লোল ও আবিল দেখে বললেন,

আপনি ব্রাহ্মণ হয়েও শূদ্রের মতো রোষ প্রকাশ করছেন কেন? রাজার কথায় ঋষির পুত্র তাঁকে শাপ দিয়ে বললেন. আপনাকে শূদ্র হতে হবে। রাজাও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশাপ দেবার জন্য উদ্যত হয়ে হাতে জল নিলেন এবং ঋষির পুত্রও রাজার বিনাশের জন্য রোষপরবশ হলেন। এই সময়ে ঋষি সেখানে এসে তাঁকে প্রতিষেধ করে বললেন, বৎস, কোপ উন্নতির পরম শত্রু বলে তা পরিহার কর। কোপে তপস্যার বিনাশ হয়, আয়ুক্ষয় হয় ও জ্ঞানেরও হানি হয়। রাজা যদি জেনে শুনেও হোমধেনু বধ করে থাকেন, তবু নিজের হিতবুদ্ধিতে তাঁকে দয়া করা উচিত, আর না জেনে এই কাজ করে থাকলে তো শাপযোগ্য হতেই পারেন না। কারণ তাঁর মনে পাপ নেই।

এই কথায় রাজা পৃষধ্র মুনির পুত্রকে প্রণাম করে বললেন, আপনি প্রসন্ন হোন, আমি না জেনে এই গাভী বধ করেছি। ঋষি পুত্র বললেন, আমি আজন্ম মিথ্যা বলি নি, তাই আমার শাপের অন্যথা হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় শাপ আর দিলাম না। পিতা তাঁর বালক পুত্রকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং রাজা পৃষধ্রও শূদ্র হলেন।

নাভাগের উপাখ্যান

দিষ্টের পুত্র নাভাগ প্রথম যৌবনে পদার্পণ করে এক বৈশ্য কন্যাকে দেখে মদন শরে বিদ্ধ হলেন। তিনি সেই কন্যার পিতার নিকটে গিয়ে তাকে চাইলেন। কন্যার পিতা নাভাগের পিতাকে জানতেন। তাই বললেন, আপনারা রাজা, আমরা ভৃত্য, আপনাদের সমকক্ষ নই। তাই আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বন্ধন হতে পারে না। রাজপুত্র বললেন, ভিন্ন জাতি হলেও মানুষকে যোগ্যতা দেখতে হয়, আপনি আমাকে কন্যা সম্প্রদান করুন। বৈশ্য বললেন, আমরা দুজনেই পরাধীন। তাই আপনি পিতার অনুমতি নিয়ে কন্যাকে গ্রহণ করুন। রাজপুত্র বললেন, সত্য কথা। কিন্তু এ কথা গুরুজনকে বলা যায় না। বৈশ্য বললেন, তাহলে আমিই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।

এই বলে বৈশ্য রাজাকে সব কথা নিবেদন করলেন। রাজা পুত্রকে ডেকে ঋচীক প্রমুখ ব্রাহ্মণদের উপদেশ চাইলেন। ঋষিরা বললেন, রাজপুত্র, আপনার যদি বৈশ্য কন্যায় অনুরাগ জন্মে থাকে তো তাই ধর্ম বলে গণ্য হবে। কিন্তু ন্যায়ানুসারে প্রথমে কোন রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতে হবে। তার পরে একে বিবাহ করে উপভোগ করলে কোন দোষ হবে না। কিন্তু এখন একে হরণ করলে আপনাকে জাতিভ্রষ্ট হতে হবে।

রাজপুত্র এ কথা গ্রাহ্য না করে তখনই বেরিয়ে গিয়ে সেই কন্যাকে গ্রহণ করে বললেন, আমি রাক্ষস বিবাহ পদ্ধতি অনুসরণ করে এই বৈশ্য কন্যাকে হরণ করলাম, যার সামর্থ্য আছে সে একে মুক্ত করুক।

বৈশ্য রাজার শরণ নিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিপুল সেনা-বাহিনীকে আদেশ দিলেন, দুষ্ট নাভাগকে বধ কর। কিন্তু যুদ্ধে রাজপুত্র তাদের অধিকাংশকেই নিপাতিত করলেন। এই সংবাদ পেয়ে রাজা নিজে যুদ্ধ করতে এলেন এবং পিতাপুত্রের যুদ্ধে পুত্র পিতাকে অস্ত্র দিয়ে অতিক্রম করলেন।

এই সময়ে অন্তরীক্ষ থেকে পরিব্রাট মুনি এসে রাজাকে বললেন, যুদ্ধে বিরত হোন। আপনার পুত্রের ধর্ম নষ্ট হয়েছে এবং বৈশ্যের সঙ্গে যুদ্ধ সঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করে পরে অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহ করলে তার ধর্মের হানি হয় না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্যও এই ক্রমানুসারী ব্যবস্থা। তারা সবর্ণার পাণিগ্রহণ না করে অন্য-তরা বিবাহ করলে পতিত হয়ে থাকে। এই জন্যই আপনার এই পুত্র বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। আপনি ক্ষত্রিয় বলে আপনার সঙ্গে এর যুদ্ধের অধিকার নেই।

এই কথা শুনে রাজা যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন এবং রাজপুত্র নাভাগ বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হলেন। তারপর রাজার নিকটে এসে নাভাগ বললেন, মহারাজ, আমাকে যা করতে হবে আদেশ করুন। রাজা বললেন, বাভ্রব প্রভৃতি তপস্বীরা যা বলেন,

তাই কর। মুনিরা ও সভাসদবর্গ বললেন, কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালনই এঁর ধর্ম হবে।

নাভাগ তাই করতে লাগলেন। ভনন্দন নামে তাঁর এক পুত্র হল। মা তাকে বললেন, তুমি গোপাল অর্থাৎ পৃথিবীপাল হও। এই আদেশ পেয়ে ভনন্দন হিমালয় নিবাসী রাজর্ষি নীপের নিকটে গিয়ে বললেন, মা আমাকে গোপাল হতে বলেছেন। পৃথিবী পালন করতে হলে পৃথিবীর সম্মতি কী ভাবে পাওয়া যাবে? রাজর্ষি নীপ তাঁকে অস্ত্রবিদ্যা দিলেন। তা পেয়ে ভনন্দন নীপের আদেশে বসুরাত প্রভৃতি পিতৃব্য পুত্রদের নিকটে গিয়ে অর্ধেক রাজত্ব দাবী করলেন। তাঁরা বললেন, তুমি বৈশ্যের পুত্র, তুমি কেমন করে পৃথিবী ভোগ করবে!

এই কথায় ভনন্দন তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং ধর্ম যুদ্ধে তাঁদের সকলকে পরাজিত করে পৃথিবী আত্মসাৎ করলেন। শত্রুজয় করে ভনন্দন সমস্ত পৃথিবী ও রাজ্য পিতাকে দিলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না। স্ত্রীর সামনেই বললেন, এই রাজ্য এখন তোমার, তুমিই পালন কর। পিতার আজ্ঞা পালন করি নি বলেই আমি বৈশ্য হয়ে রাজা হই নি। আমি মানী, তোমার বাহুবলে জয় করা রাজ্য ভোগ করা আমার উচিত হবে না।

এই কথায় তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা হেসে বললেন, তুমি বৈশ্য নও, আমিও বৈশ্যকুলে জন্মাই নি। তুমি নিজেও ক্ষত্রিয়, আমারও জন্ম ক্ষত্রিয় বংশে। রাজা সুদেব তাঁর পত্নীদের সঙ্গে বিহার করবার জন্য তাঁর সখা ধূম্রাশ্বের পুত্র নলের সঙ্গে আম্রকাননে গিয়েছিলেন। পান ভোজনের পরে তাঁরা এক পুষ্করিণীর তীরে চ্যবনের পুত্র প্রমতির সুন্দরী স্ত্রীকে দেখতে পেলেন এবং দুর্মতি নল রাজার সামনেই তাঁকে গ্রহণ করল। সেই স্ত্রী 'আমাকে রক্ষা করুন' বলে বার বার চিৎকার করলে প্রমতি সেখানে ছুটে এসে রাজাকে দেখতে পেয়ে বললেন, আপনি ওকে নিবৃত্ত করুন। রাজা বললেন, আমি বৈশ্য, ক্ষত্রিয় নই।

আপনার স্ত্রীকে রক্ষার জন্য আপনি কোন ক্ষত্রিয়ের নিকটে যান। প্রমতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি বৈশ্যই বটে। ক্ষত থেকে রক্ষা করেই ক্ষত্রিয় হয়। তোমার যখন সে গুণ নেই, তুমি ক্ষত্রিয় নও। তুমি কুলাঙ্গার বৈশ্য হবে। রাজাকে এই শাপ দিয়ে প্রমতি নলকে বললেন, তুমি মদোন্মত্ত হয়ে আমারই আশ্রমে আমার স্ত্রীকে সবলে গ্রহণ করেছ বলে তুমি এখনই ভস্ম হবে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নলের শরীর থেকে আগুন বেরিয়ে তাকে ভস্মে পরিণত করল। মহর্ষির এই প্রভাব দেখে রাজা সুদেব প্রণাম করে বললেন, আমি সুরাপানে আকুল হয়েছিলাম। আমাকে ক্ষমা করে আপনি শাপ প্রতিসংহার করুন। রাজার কথায় প্রমতি শান্ত হয়ে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। তবে কোন ক্ষত্রিয় সবলে তোমার কন্যাকে গ্রহণ করলে তুমি পুনরায় ক্ষত্রিয় হবে। এই জন্যেই আমার পিতা রাজা সুদেব বৈশ্য হয়েছিলেন। আর আমি কে, তাও তোমাকে বলছি শোন। পুরাকালে রাজর্ষি সুরথ গন্ধমাদনের অরণ্যে তপস্বী হয়েছিলেন। একদিন তিনি শ্যেনের মুখ থেকে ভ্রষ্ট এক শারিকাকে দেখে মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভঙ্গের পর তাঁর শরীর থেকে আমি উৎপন্ন হলাম। তাঁর মনে স্নেহের সঞ্চার হওয়াতে তিনি আমাকে গ্রহণ করে কৃপাবতী নাম রাখলেন। আমি তাঁর আশ্রমে বড় হতে লাগলাম ও সখীদের সঙ্গে বনে বিচরণ করতাম। একদিন অগস্ত্যের ভ্রাতা বনে ফলমূল সংগ্রহ করছিলেন। আমার সখীরা তাঁর রোষ উৎপাদন করলে তিনি আমাকে বৈশ্যজা হবে বলে শাপ দিয়েছিলেন। আমি নিরপরাধ বলাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, দুষ্টের সংসর্গে থাকলে অদুষ্টকেও দুষ্ট হতে হয়। তবে তুমি আমাকে প্রণিপাত করে প্রসন্ন করেছ বলে বলছি যে তুমি বৈশ্য হয়ে জন্মে নিজের পুত্রকে যখন রাজ্যপালনের জন্য পাঠাবে, তখন জাতিস্মরা হয়ে স্বামীর সঙ্গে আবার ক্ষত্রজাতি হবে। তাই বলছি, আমরা কেউই বৈশ্য নই।

নাভাগ এই কথা শুনে বললেন, পিতার আদেশে আমি যে রাজ্য ত্যাগ করেছি, তা আর গ্রহণ করব না। তুমি এই রাজ্য ভোগ কর, অথবা ছেড়ে দাও।

পিতার কথায় ভনন্দন দারপরিগ্রহ করে ধর্মানুসারে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হলেন। সকলে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং তাঁর শাসন সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হল।

বৎসপ্রীর উপাখ্যান

ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্রী গুণে পিতাকেও অতিক্রম করলেন। বিদূরথের কন্যা সৌনন্দা তাঁর সহধর্মিণী হলেন। বৎসপ্রী দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু দৈত্যরাজ কুজৃম্ভকে বধ করে তাঁকে পেয়েছিলেন।

ক্রোষ্টুকি জিজ্ঞাসা করলেন, বৎসপ্রী কীভাবে কুজৃম্ভকে বধ করে তাঁকে পেয়েছিলেন, সেই কথা বলুন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, বিদূরথ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁর দুই পুত্রের নাম সুনীতি ও সুমতি। একদিন রাজা অরণ্যে মৃগয়ায় গিয়ে এক বিশাল গর্ত দেখে চিন্তান্বিত হলেন। এমন সময়ে সুব্রত নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ সেখানে এলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? ঋষি বললেন, পৃথিবীর সব কথা জানাই তো রাজার কর্তব্য। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে রসাতলে এক প্রচণ্ড প্রকৃতির দানব বাস করছে। পৃথিবীকে জৃম্ভিত করে বলে তার নাম কুজৃম্ভ। বিশ্বকর্মা সুনন্দ নামে যে মুষল নির্মাণ করে ছিলেন, সে তা হরণ করে তাই দিয়ে শত্রু বধ করে এবং পৃথিবীকে বিদারিত করে অসুরদের পথ করে দেয়। এও এই রকমের একটি পথ। ঐ অসুরকে জয় না করে আপনি পৃথিবী ভোগ করবেন কেমন করে! সে যজ্ঞ ধ্বংস করে ও দেবতাদেরও নিপীড়িত করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্পর্শমাত্রেই তার মুষল নিবীর্য হয় এবং পরদিন আবার বীর্যবিশিষ্ট হয়। ঐ দুরাচার অসুর এ কথা জানে না। আপনাকে সব কথা বললাম, আপনার

পুরের কাছেই সে গর্ত করেছে, আপনি নিশ্চিন্ত আছেন কেমন করে জানি না। এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

রাজা নিজের পুরে ফিরে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। মুষলের প্রভাব ও তার হানির কথাও বললেন। রাজকন্যা মুদাবতী পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। কয়েকদিন পরে সখীপরিবৃত হয়ে মুদাবতী উপবনে গেলেন এবং কুজ,ম্ভ সেই সময়ে তাকে হরণ করল। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুই পুত্রকে বললেন, নির্বিন্ধ্যা নদীর তটে যে গর্ত আছে সেই পথে গিয়ে মুদাবতীর হরণকারীকে হত্যা কর।

তারা সেই গর্ত দিয়ে পাতালে গিয়ে সসৈন্যে কুজ,ম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। মায়াবলশালী কুজ,ম্ভ সমস্ত সৈন্য সংহার করে রাজপুত্রদের বন্দী করল। এই সংবাদ পেয়ে রাজা বললেন, দৈত্যকে বধ করে যে আমার পুত্রদের উদ্ধার করবে, আমি তাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করব। রাজার এই ঘোষণা ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্রীর কানে গেল। তিনি এসে বললেন, আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি সকলকে উদ্ধার করব। রাজা তাঁর প্রিয় সখার পুত্রকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার সিদ্ধিলাভ হোক।

বীর বৎসপ্রী খড়্গ ও ধনু নিয়ে পাতালে গিয়ে ধনুষ্টঙ্কার করলেন। সেই শব্দ শুনে কুজ,ম্ভ সসৈন্যে এগিয়ে এল। দুদলের সমান সৈন্য ছিল এবং উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হল। তিনদিন যুদ্ধের পরে অসুর তার মুষল আনতে গেল। সেই মুষল অন্তঃপুরে থাকে এবং গন্ধ মালা ও ধূপ দিয়ে তার পূজা করা হয়। মুদাবতী মুষলের কথা জানতেন বলে তা স্পর্শ করলেন। অসুর সেই মুষল নিয়ে যুদ্ধে এসে দেখল যে মুষল পাত ব্যর্থ হচ্ছে। বার বার মুষলের আঘাত করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। রাজপুত্র অসুরের অন্যান্য অস্ত্র পরাহত করে তাকে রথহীন করলেন এবং অনলাস্ত্রে তাকে সংহার করলেন। রসাতলে নাগরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হল। পুষ্পবৃষ্টি হল, গন্ধর্বরা গান গাইল এবং বাদ্য বাজতে লাগল। রাজপুত্র দৈত্যদের বধ করে

রাজার দুই পুত্র ও কন্যা মুদাবতীকে উদ্ধার করলেন। কুজৃম্ভের মৃত্যুর পর নাগরাজ অনন্ত সেই মুষল গ্রহণ করলেন এবং মুদাবতীর নাম রাখলেন সুনন্দা। সুনন্দ নামের মুষলের প্রভাব নষ্ট করবার জন্য তিনি বারবার মুষল স্পর্শ করেছিলেন বলেই এই নাম রাখলেন। সকলকে রাজার নিকট এনে প্রণিপাত করে বৎসপ্রী বললেন, এবারে আমাকে কী করতে হবে বলুন।

রাজা বললেন, আজ দিন ভাল। আমার শত্রু নিপাত হল, অপত্যদের অক্ষত দেহে ফিরে পেলাম এবং তুমি আমার জামাতা হবে। আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর। রাজপুত্র বললেন, আপনার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্তব্য।

তখন রাজা তাঁর কন্যা মুদাবতীর সঙ্গে ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্রীর বৈবাহিক বিধি সমাহিত করলেন। ভনন্দন বৃদ্ধ হয়ে বনে গেলে বৎসপ্রী রাজা হলেন এবং তাঁর সুশাসনে কোন ভয় ও উপসর্গ রইল না।

সুনন্দার বারোটি পুত্র হয়েছিল। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রাংশু রাজা হয়েছিলেন এবং অন্যান্য ভ্রাতারা ভৃত্যের মতো তাঁর বশবর্তী হল। তিনি অসংখ্য যজ্ঞ করেন এবং প্রজাদের পুত্রের মতো পালন করেন। তাঁর পুত্র প্রজাতির যজ্ঞে দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্র এসে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করে অতুল তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। তিনি জম্ভ নামের অসুর ও আরও নিরানব্বই জন অসুর ও তাদের সৈন্য বধ করেছিলেন।

খনিত্রের উপাখ্যান

প্রজাতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে খনিত্র বিখ্যাত রাজা হয়েছিলেন। তিনি শান্ত স্বভাব সত্যবাদী ও সকল প্রাণীর হিতকারী ছিলেন এবং সর্বদা বলতেন, সকলেই সর্বতোভাবে সুখে থাকুক। তিনি তাঁর অন্য চার ভাইকে চারটি পৃথক রাজ্য দেন—শৌরিকে প্রাচী, উদাবসুকে

দক্ষিণ, সুনয়কে প্রতীচী ও মহারথকে উত্তর দিকে নিয়োজিত করেন। তাঁদের পৃথক গোত্র পুরোহিত ও মন্ত্রী ছিলেন।

একদিন শৌরির মন্ত্রী বিশ্ববেদী তাঁকে নির্জনে বললেন, এই পৃথিবী যাঁর এবং সমস্ত রাজা যাঁর বশীভূত, তিনিই প্রকৃত রাজা এবং তাঁরই পুত্ররা রাজা হবেন। অন্যরা ক্রমান্বয়ে স্বল্পভোগী হয়ে অবশেষে কৃষিজীবী হবেন। তাই বলছি, আমাদের সহায়তায় আপনি সমগ্র রাজ্য ভোগ করুন। শৌরি বললেন, আমাদের জ্যেষ্ঠ রাজা হয়েছেন, আমরা তাঁর অনুজ। আমরা পাঁচ ভাই ও পৃথিবী একা। আমরা সবাই কী করে পৃথিবী ভোগ করতে পারি? বিশ্ববেদী বললেন, আপনি জ্যেষ্ঠ হয়ে একাই রাজ্য শাসন করুন না! শৌরি বললেন, পুত্রের মতো জ্যেষ্ঠ আমাদের স্নেহ করেন। বিশ্ববেদী বললেন, রাজ্য প্রার্থীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বলে কিছু নেই, যে যখন রাজ্য করে সে-ই জ্যেষ্ঠ।

রাজা শৌরি সম্মত হলে মন্ত্রী বিশ্ববেদী তাঁর সহোদরদের বশে আনলেন এবং তাঁদের পুরোহিতদের খনিত্রের আভিচারিকে নিয়োজিত করলেন। চারজন পুরোহিত প্রতিদিন উৎকট আভিচারিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলে চারটি ভয়ঙ্কর কৃত্যা আবির্ভূত হল। শূল হাতে তারা খনিত্রের নিকটে গেল; কিন্তু তাঁর দোষস্পর্শহীন পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবে তারা নিরস্ত হয়ে সেই সব পুরোহিত ও মন্ত্রী বিশ্ববেদীকে যুগপৎ আক্রমণ করল এবং তাদের দগ্ধ করে ফেলল।

পৃথক পুরে বাস করেও তারা একই সঙ্গে বিনষ্ট হওয়ায় সকলেই বিস্মিত হল। রাজা খনিত্রও এই সংবাদে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন; কিন্তু তার কারণ জানতে পারলেন না। একদিন বশিষ্ঠ তাঁর গৃহে এলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। এর উত্তরে বশিষ্ঠ আদ্যোপান্ত সব কথা রাজার গোচরে আনলেন। খনিত্র এই কথা শুনে 'হা হতোস্মি' বলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, আমি পাপাত্মা বলে আমার জন্যই চারজন ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হয়েছেন এই বলে তিনি তাঁর পুত্র

ক্ষুপকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে তিনি রাণীকে নিয়ে তপস্যার জন্য বনে গেলেন। সাড়ে তিনশো বছর তপস্যার পর তিনি প্রাণ বিসর্জন করলেন। তাঁর ও রাণীদের অক্ষয় লোক লাভ হল।

ক্ষুপ ও বিবিংশের কথা

খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ রাজা হয়ে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করতে লাগলেন। একদিন সুতরা বলল, পুরাকালে যেমন ক্ষুপ রাজা ছিলেন, তিনিও তেমনি হয়েছেন। রাজা বললেন, আমি ক্ষুপের চরিত শুনতে চাই, আমিও তাঁর মতো হতে চেষ্টা করব। সুতরা বলল, তিনি গোব্রাহ্মণকে করহীন করেছিলেন এবং ষষ্ঠাংশ দিয়েই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রাজা এই কথা শুনে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তাঁর অনুসরণ করব, গো ও ব্রাহ্মণ আমাকে যে কর দিয়েছেন আমি তা প্রত্যর্পণ করব।

রাজা এই প্রতিজ্ঞা করে তা রক্ষা করলেন। তিনি শুধু শস্য নিয়েই তিনটি যজ্ঞ করলেন। গো ও ব্রাহ্মণেরা যে কর দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের সেই পরিমাণ ধন দিলেন।

তার রাণীর নাম প্রমথা। তিনি যে বীরপুত্রের জন্ম দেন, তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় বিদর্ভবংশীয় নান্দনীর। তাঁদের পুত্রের নাম বিবিংশ। বিবিংশর রাজত্বকালে পৃথিবী শস্যে পূর্ণ হল, লোকের বিত্ত হলেও গর্ব হল না। রাজা বহু যজ্ঞ করে সংগ্রামে নিহত হয়ে স্বর্গে গেলেন।

খনীনেত্র করন্ধম অবীক্ষিত ও মরুত্তের উপাখ্যান

মার্কণ্ডেয় বললেন, বিবিংশের পুত্রের নাম খনীনেত্র। তিনি মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং এত যজ্ঞ করেছিলেন যে গন্ধর্বরা বিস্ময়ান্বিত হয়ে গান করেছিল যে পৃথিবীতে খনীনেত্রের মতো যাজ্ঞিক নেই। তিনি সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান হয় নি। সেইজন্য তিনি পুত্র কামনায়

পিতৃযজ্ঞের জন্য মাংস সংগ্রহে একাকী মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। এই সময়ে এক মৃগ বন থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে বলল, আপনি আমাকে বধ করে অনুষ্ঠান করুন।

রাজা বললেন, সমস্ত মৃগ আমাকে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে। তুমি কেন মৃত্যুর জন্য আত্মদান করছ ?

মৃগ বলল, আমি নিঃসন্তান বলে আমার জন্ম বৃথা হয়েছে, তাই এই প্রাণ ধারণের আর প্রয়োজন নেই।

এই সময়ে আর একটি মৃগ এসে তার সামনেই বলতে লাগল, মহারাজ, এই মৃগকে বধ করে আপনার কোন কাজ হবে না। আপনি আমাকে বধ করে অভীষ্ট কাজ করুন। পুত্রের জন্যই যখন পিতৃযজ্ঞ করবেন, তখন নিঃসন্তান মৃগের মাংসে বাঞ্ছিত ফল পাবেন না।

রাজা বললেন, এর পুত্র নেই বলে বৈরাগ্য। তোমার বৈরাগ্যের কারণ কী ?

মৃগ বলল, আমার অনেক পুত্র কন্যা এবং তাদের জন্য চিন্তায় আমি যেন দাবানল জ্বালার মধ্যে বাস করি। সর্বদাই আমাদের মানুষ ও পশুকে ভয় করে চলতে হয়। কখন কার কী হয়, এই ভেবে সারাক্ষণ সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতে হয়। এই দুঃখেই আমি প্রাণত্যাগ করতে চাই।

প্রথম মৃগ বলল, মহারাজ, অনেক পুত্র বলে এই মৃগ ধন্য, একে বধ করবেন না। আমার সন্তান নেই, আপনি আমাকে বধ করুন।

দ্বিতীয় মৃগ বলল, তোমার এক দেহজনিত দুঃখ বলে তুমিই ধন্য। আমার বহু দেহ বলে দুঃখও অনেক। যখন একা ছিলাম, তখন নিজের দেহের জন্যই এক দুঃখ ছিল। স্ত্রী পেয়ে দুঃখ দ্বিধাভূত হয়। এখন অপত্যদের নিয়ে দুঃখও সমান সংখ্যার।

রাজা বললেন, পুত্রবান ব্যক্তি ধন্য না অপুত্রক, তা জানি না। পুত্রের জন্যই আমার এই আরম্ভ। কারণ শুনেছি যে পুত্র না থাকলে

ঋণে আবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু প্রাণীবধ না করে আমি তপস্যা করে পুত্রলাভের চেষ্টা করব।

তারপর তিনি গোমতীতে গিয়ে কঠোর তপশ্চরণে ইন্দ্রের স্তব করতে লাগলেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি বর প্রার্থনা কর। রাজা বললেন, আমি অপুত্রক, আমার পুত্র হোক। ইন্দ্র তথাস্তু বললে তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে এসে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর এক পুত্র হল, পিতা তার নাম রাখলেন বলাশ্ব।

পিতার মৃত্যুর পর বলাশ্ব রাজা হয়ে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে বশে আনলেন। কিন্তু পরে তারা কর বন্ধ করে নিজেদের রাজ্যে অভ্যুত্থিত হয়ে তাঁর ভূমি আত্মসাৎ করল। তিনি দুর্বল হয়ে নিজের নগরেই অবস্থিতি করতে লাগলেন। তারপর সেই রাজারা মিলিত হয়ে তাঁর পুরে এসে তাঁকে রুদ্ধ করল। এই অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়েও তিনি কিছু করতে পারলেন না। রক্ষার কোন উপায় না দেখে তিনি মুখে দু হাত চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাতে শত শত রথ অশ্ব ও যোদ্ধা তাঁর হাতের বিবর থেকে বহির্গত হল। রাজা সেই বলে পরিবৃত হয়ে সকলকে জয় করে পুনর্বায় তাদের বশে এনে কর আদায় করলেন এবং পূর্বের সৌভাগ্যে অলঙ্কৃত হলেন। তাঁর কর যুগলের ধুতি বা কম্পন থেকে সৈন্য উদ্ভূত হয়েছিল বলে লোকে বলাশ্বকে করন্ধম বলে। স্বয়ং ধর্মের নিকট বল পেয়ে শত্রু বিনাশ করে তিনি ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

বীর্যচন্দ্রের কন্যা বীরা স্বয়ম্বরে করন্ধমকে পরিগ্রহ করেছিলেন। অবীক্ষিত নামে তাঁদের এক পুত্র জন্মালে রাজা দৈবজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার পুত্র শুভলগ্নে ও শুভনক্ষত্রে জন্মেছে তো? এর ওপর কোন দুষ্ট গ্রহের দৃষ্টি নেই তো?

দৈবজ্ঞরা বললেন, মহারাজ, গুরু ও শুক্র সপ্তম স্থানে থেকে এঁকে অবৈক্ষত অর্থাৎ এঁর প্রতি দৃষ্টি করেছেন, সোম চতুর্থ স্থানে থেকে সমবেক্ষতে অর্থাৎ দৃষ্টি করছেন এবং বুধ উপান্তে থেকে একে অবৈক্ষত

অর্থাৎ দর্শন করেছেন। কিন্তু সূর্য মঙ্গল ও শনি এঁকে নাবৈক্ষত অর্থাৎ এঁর ওপর দৃষ্টিপাত করেন নি। কাজেই আপনার এই পুত্র ধন্য এবং ইনি মহারাজা হবেন।

রাজা সহর্ষে বললেন, তোমরা যে বারবার অবৈক্ষত শব্দ প্রয়োগ করলে তার জন্য এই পুত্র অবীক্ষিত নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হবেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, অবীক্ষিত বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শিতা লাভ করে কণ্বের পুত্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করলেন। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে, বুদ্ধিতে বাচস্পতিকে, কান্তিতে চন্দ্রকে, তেজে সূর্যকে, ধৈর্যে সাগরকে এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন। হেমধর্মের কন্যা বরা, সুদেবের কন্যা গৌরী, বলির কন্যা সুভদ্রা, বীরের কন্যা লীলাবতী, বীরভদ্রের কন্যা নিভা, ভীমের কন্যা মাল্যবতী এবং দম্ভের কন্যা কুমুদ্বতী স্বয়ম্বরে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। যে কন্যারা স্বয়ম্বরে তাঁকে গ্রহণ করেন নি, তিনি সবলে সমবেত রাজাদের ও কন্যার পিতৃকুলকে পরাজিত করে সেই সব কন্যাকে গ্রহণ করেন।

একবার বৈদিশাধিপতি বিশালের কন্যা বৈশালিনী স্বয়ম্বরে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তিনি বলগর্বিত হয়ে সমবেত সমস্ত রাজাকে পরাভূত করে বৈশালিনীকে হরণ করেন। অবীক্ষিত বারবার যে সব রাজাকে এইভাবে পরাজিত করেন, তাঁরা নির্বেদগ্রস্ত হয়ে পরস্পর বলাবলি করলেন, তোমাদের ক্ষত্রিয় জন্মে ধিক্। অবীক্ষিত একা অনায়াসে এই কন্যাকে গ্রহণ করল, অথচ তোমরা মিলিত হয়েও কিছু করতে পারলে না। ক্ষত অর্থাৎ আক্রান্ত হলে আত্মাকে ত্রাণ কর বলেই তোমরা ক্ষত্রিয়. শত্রু বিনাশ করে আজ তা প্রমাণ কর। এই বলে সমস্ত রাজারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রথে গজে অশ্বে বা পদব্রজে অবীক্ষিতের সম্মুখীন হলেন। প্রবল যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে অবীক্ষিত ধর্মানুসারে অনেককেই পরাজিত করলেন। কিন্তু অনেকে ধর্মত্যাগ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যাঁর যেমন ইচ্ছা ও সুবিধা সেইভাবেই তাঁরা একযোগে আঘাত করে অবীক্ষিতকে

ভূপাতিত করে বন্ধন করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে বৈদিশপুরে রাজা বিশালের কাছে এলেন। রাজা ও পুরোহিতরা অবীক্ষিতের সঙ্গে সেই স্বয়ম্বরা কন্যাকে বললেন, এই সমবেত রাজাদের মধ্যে যাকে অভিরুচি তাকেই তুমি বরণ কর। কিন্তু বার বার বলা সত্ত্বেও যখন রাজকন্যা কাউকে বরণ করলেন না, তখন রাজা দৈবজ্ঞকে বিবাহের দিন স্থির করতে বললেন। দৈবজ্ঞ বললেন, সামনেই শুভ দিন আছে, সেই দিন বিবাহের উদ্যোগ করবেন। আজ মহাবিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল, আজ আর বিবাহে প্রয়োজন নেই।

করন্ধমের পত্নী বীরা ও অন্যান্য রাজারা সকলেই শুনলেন যে অবীক্ষিত বদ্ধ হয়েছেন। পুত্রকে অধর্ম করে বদ্ধ করা হয়েছে বলে রাজা সামন্ত রাজাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। অনেকেই বললেন যে অধর্ম যুদ্ধে বদ্ধ করা হয়েছে বলে সমস্ত রাজাকেই বধ করা হোক। আবার অনেকে বললেন যে অবীক্ষিতই প্রথমে ধর্মত্যাগ করেছিলেন। কারণ তিনি সেই কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক তাকে গ্রহণ করে সমস্ত রাজপুত্রকে বিপক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁরা সম্মিলিত হয়ে তাঁকে বশ করেছেন। তাঁদের কথা শুনে রাণী বীরা সকলের সামনে বললেন, আমার পুত্র সকলকে জয় করে কন্যাকে গ্রহণ করেছিল। তার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হলে তারা অধর্ম করে যুদ্ধ করে। হীন লোকেরা যাচ্ঞা করে, যাচ্ঞা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, বলপূর্বক গ্রহণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। অতএব যুদ্ধের জন্য আপনারা তৎপর হোন। পত্নীর কথায় রাজা করন্ধম যুদ্ধের আয়োজন করলেন। তারপর বিশাল ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। তিন দিন যুদ্ধের পর প্রায় পরাজিত হলে রাজা বিশাল স্বয়ং অর্ঘ্য হাতে রাজা করন্ধমের সামনে এলেন এবং তাঁর পুত্রকে মুক্তি দিলেন।

পরদিন রাজা বিশাল কন্যার বিবাহের জন্য উপস্থিত হলে অবীক্ষিত বললেন, আমি এঁকে বা অন্য কোন কন্যাকেও আর পরিগ্রহ করব না, কারণ এঁর সামনে আমি পরাজিত হয়েছি। শত্রুর হাতে যার যশ ও

বীর্য নষ্ট হয় নি এমন কাউকে ইনি বরণ করুন। রাজপুত্রের কথায় রাজা বিশাল কন্যাকে বললেন, তুমি এর কথা শুনলে, তুমি যাকে চাও তাকেই পতিরূপে বরণ করতে পার। কন্যা বললেন, অনেকে একত্র হয়ে এঁকে অন্যায় ভাবে পরাজিত করেছে, ইনি অনেকবার সকলকে জয়ও করেছিলেন। তাতে এঁর বিক্রম প্রকাশিত হয়েছে এবং ইনি ধর্মানুসারে যুদ্ধ করেছেন। আমি শুধু এঁর রূপে লুব্ধ হই নি, এঁর শৌর্য ও ধৈর্যও আমার মন হরণ করেছে। কাজেই এঁকে ছাড়া অন্যকে আমি বরণ করব না।

বিশাল বললেন, রাজপুত্র, আমার কন্যা ঠিকই বলেছে। তুমি একে পরিগ্রহ কর। রাজপুত্র বললেন, না, আমি এঁকে বা আর কোন কন্যাকে কখনই পরিগ্রহ করব না। তখন রাজা করন্ধম পুত্রকে বললেন, বৎস, তোমাতে এব দৃঢ় অনুরাগ, তাই এঁকে গ্রহণ কর। রাজপুত্র বললেন, তাত, আমি কখনও আপনার আজ্ঞা ভঙ্গ করি নি, তাই আমাকে এমন আজ্ঞা করুন যা আমি রাখতে পারি। এর পর রাজা বিশাল কন্যাকে বললেন, তোমার মন ফেরাও। এখানে অনেক রাজপুত্র আছেন, তাঁদের মধ্যে কাউকে বরণ কর। কন্যা বললেন, ইনি আমাকে গ্রহণ না করলে তপস্যা করেই আমি জীবন কাটাব।

রাজা করন্ধম বিশালের সঙ্গে তিনদিন কাটালেন এবং অনেক পুরাবৃত্ত শুনিয়ে রাজপুত্রকেও ফিরিয়ে আনলেন। এ দিকে সেই কন্যা বনে গিয়ে অনাহারে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। তিন মাস পরে তাঁর মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হলে তিনি দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তাই দেখে দেবতারা দেবদূতকে তাঁর কাছে পাঠালেন। দেবদূত এসে বললেন, তুমি এই শরীর ত্যাগ কোবো না, তুমি চক্রবর্তীর জননী হবে। তোমার পুত্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করবেন, তিনি দেবতাদের শত্রু তরুজিৎ ও অয়ঃশঙ্কুকে সংহার করে ছ হাজার যজ্ঞ করবেন। রাজকন্যা বললেন, স্বামী ছাড়া আমাব পুত্র হবে কেমন করে? আমি

তো প্রতিজ্ঞা করেছি যে অবীক্ষিত ছাড়া আর কেউ আমার পতি হবে না। দেবদূত বললেন, তোমাকে এর বেশি বলার প্রয়োজন নেই, তুমি অধর্ম করে আত্মত্যাগ কোরো না। বলে তিনি প্রস্থান করলেন এবং রাজকন্যাও দেহ পোষণ করতে লাগলেন।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এদিকে অবীক্ষিতের জননী বীরা পুত্রকে ডেকে বললেন, তোমার পিতার মত নিয়ে আমি দুষ্কর কিমিচ্ছক ব্রতের জন্য উপবাস করব। তোমার পিতার কোষ থেকে অর্ধেক ধন আমি দেব। তুমি রাজী হলেই আমি এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারি। অবীক্ষিত বললেন, পিতার ধন আছে, তিনি দিতে পারেন। আমার শরীর দিয়ে যা সম্ভব, আমি তা করব। রাণী এই কথায় ব্রতের জন্য উপবাস করে কুবের নিধি ও নিধিপালদের এবং লক্ষ্মীর পূজা করলেন।

এই সময়ে রাজার নীতিশাস্ত্র বিশারদ সচিবরা নির্জনে রাজাকে বললেন, আপনার এখন শেষ বয়স, অথচ অবীক্ষিত নিঃসন্তান। তিনি পরলোকে গেলে আপনার বংশের ক্ষয় হবে ও পিতৃগণের জলপিণ্ড লোপ পাবে। অতএব আপনার পুত্রকে এ বিষয়ে মনোযোগী করুন।

রাজা তখন শুনতে পেলেন যে রাণীর পুরোহিত সমাগত অর্থীকে বলছেন, তোমাদের কার কী ইচ্ছা বল। রাজপুত্র অবীক্ষিতও বললেন, আমার এই শরীর দিয়ে কার কী কাজ হতে পারে বল। মায়ের কিমিচ্ছক ব্রতের জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমরা যা চাইবে আমি তাই দেব।

রাজা করন্ধম পুত্রের এই কথা শুনে তাঁর নিকটে এসে বললেন, বৎস, আমিও একজন অর্থী। অবীক্ষিত বললেন, সাধ্য অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হোক, আমি অবশ্য তা করব। রাজা বললেন, আমাকে পৌত্রের মুখ দেখাও। অবীক্ষিত বললেন, আমি আপনার একমাত্র পুত্র এবং ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেছি। আমি কেমন করে আপনাকে

পৌত্রের মুখ দেখাব ? রাজা বললেন এতে তোমার পাপ হচ্ছে। অবীক্ষিত বললেন, আপনি অন্য আদেশ করুন। রাজা বললেন, শত্রুরা একত্র হয়ে যুদ্ধ করলে জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু তায় জন্য বৈরাগ্য আশ্রয় করা মূর্খতা। ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করে আমাকে পৌত্রের মুখ দেখাও। রাজা যখন কিছুতেই অন্য কিছু চাইলেন না, তখন অবীক্ষিত বললেন, কিমিচ্ছক দান করব বলে আমি সংকটেই পড়েছি। আমি সত্য-পাশে বদ্ধ, তাই আমাকে আজ্ঞা পালন করতেই হবে।

এর পর একদিন অবীক্ষিত মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। সহসা তিনি শুনতে পেলেন যে কোন নারী বার বার চিৎকার করে বলছে, আমাকে রক্ষা কর। 'ভয় নেই' বলে তিনি সবেগে শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। দনুর পুত্র দৃঢ়কেশ সেই নারীকে আক্রমণ করেছিল বলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছিলেন, আমি রাজা করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিতের স্ত্রী, দুরাত্মা অসুর আমাকে হরণ করছে। হায়, যার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না, তার স্ত্রী হয়ে আজ আমার এই অবস্থা!

অবীক্ষিত এই কথা শুনে ভাবলেন, আমার স্ত্রী এই বনে! না, এ কোন রাক্ষসের মায়া! যাই হোক, যখন এসে পড়েছি, তখন ব্যাপারটা জানতে হবে। এই ভেবে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন যে দৃঢ়কেশ একাকী এক মনোরমা সালঙ্করা কন্যাকে গ্রহণ করেছে বলেই তিনি ত্রাহি শব্দে চিৎকার করছেন। অবীক্ষিত তাঁকে বললেন, ভয় নেই ; এবং দৃঢ়কেশকে বললেন, তুমি হত হলে। কার সাধ্য রাজা করন্ধমের রাজ্যে কেউ অন্যায় করে! তাঁকে দেখে সেই তন্বঙ্গী বললেন, আমি সেই রাজারই পুত্রবধূ ও অবীক্ষিতের স্ত্রী। এই দুষ্ট আমাকে হরণ করছে, আমাকে পরিত্রাণ করুন।

অবীক্ষিত ভাবতে লাগলেন, এই কন্যা কেমন করে আমার স্ত্রী ও পিতার পুত্রবধূ হলেন! তবে আগে এঁকে উদ্ধার করি, পরে সব

কথা জেনে নেব। এই ভেবে দানবকে বললেন, এই কন্যাকে ছেড়ে দিয়ে পালাও, নইলে মরতে হবে। দানব তখনই কন্যাকে ছেড়ে দণ্ড নিয়ে অবীক্ষিতের দিকে ধাবমান হল। দুজনের ঘোর যুদ্ধ হল এবং সেই যুদ্ধে অবীক্ষিত দানবের মাথা কেটে তাকে ভূপাতিত করলেন। দেবতারা 'সাধু সাধু' বলে তাঁকে বললেন, তুমি বর নাও। পিতার প্রিয় কামনায় অবীক্ষিত পুত্র প্রার্থনা করলেন। দেবতারা বললেন তুমি যে কন্যাকে মুক্ত করলে তারই গর্ভে তোমার চক্রবর্তী পুত্র জন্মাবে। রাজপুত্র বললেন, পিতার নিকট সত্যপাশে বদ্ধ বলেই আমি পুত্র কামনা করেছি। যুদ্ধে পরাজয়ের পরেই আমি দারপরিগ্রহ ত্যাগ করেছি। আমি যেমন বিশাল রাজার কন্যাকে পরিত্যাগ করেছি, তেমনি তিনিও আমার জন্যই অন্য পুরুষের সংসর্গ ত্যাগ করেছেন। এখন আমি কেমন করে নির্দয়ের মতো অন্য নারী পরিগ্রহ করব! দেবতারা বললেন, ইনিই তোমার সেই স্ত্রী বিশাল রাজকন্যা, তোমার জন্যই তপস্যা করছেন। এঁরই গর্ভে তোমার যে পুত্র জন্মাবে, সে সপ্তদ্বীপের রাজা হয়ে সহস্র যজ্ঞ করবে ও চক্রবর্তী হবে।

এই বলে দেবতারা প্রস্থান করলে অবীক্ষিত পত্নীকে বললেন, কী ব্যাপার বল। পত্নী বললেন, তুমি আমাকে ত্যাগ করলে আমিও সবাইকে ত্যাগ করে অরণ্য আশ্রয় করি। তপস্যায় ক্ষীণ হয়ে দেহত্যাগ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেবদূত এসে আমাকে নিবৃত্ত করে বলেন যে আমার চক্রবর্তী পুত্র হবে এবং সে অসুর সংহার করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করবে। এরই জন্য আমি দেহত্যাগ করি নি। পরশু গঙ্গা হ্রদে স্নান করতে গেলে এক বৃদ্ধ নাগ আমাকে আকর্ষণ করে রসাতলে নিয়ে যায়। সেখানে সহস্র নাগ তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে আমার স্তব ও পূজা করে এবং বলে যে তোমার পুত্র আমাদের বধ করতে উদ্যত হলে তুমি তাকে নিবারণ কোরো। তারা কোন অপরাধ করবে বলেই এই অনুরোধ করছি। আমি রাজী হতেই

তারা আমাকে এইভাবে অলঙ্কৃতা করে আলোকে এনেছে। আমি আবার পূর্বের মতো রূপবতী হয়েছি বলেই দুর্মতি দৃঢ়কেশ আমাকে হরণ করতে চেয়েছিল। তোমার জন্যই আমি এ যাত্রায় উদ্ধার পেলাম, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাকে পরিগ্রহ কর।

অবীক্ষিত এই ভোগত্যাগী কন্যাকে সানুরাগে বললেন, আমি সকলকে জয় করে তোমাকে পেয়েছিলাম, পরে শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে তোমাকে ত্যাগ করেছি। এখন কী করব বল। কন্যা বললেন, এই রমণীয় বনেই আমার পাণিগ্রহণ কর। আমাদের এই সকাম সমাগম সুখ শান্তি বিধান করবে। রাজপুত্র বললেন, তাই হোক।

মার্কণ্ডেয় বললেন, এই সময়ে তুলয় নামে এক গন্ধর্ব অন্যান্য গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের নিয়ে সেখানে এসে বললেন, রাজপুত্র এ আমারই কন্যা ভামিনী, অগস্ত্যের শাপে এ বিশালের কন্যা হয়েছে। খেলার সময় এ অগস্ত্যের ক্রোধ উৎপাদন করেছিল বলে ঋষি একে মানুষী হও বলে শাপ দিয়েছিলেন। আমরা ঋষিকে বুঝিয়েছিলাম যে এ বালিকা, না বুঝে শুনে অপরাধ করেছে। ঋষি বলেছিলেন, বালিকা বলেই সামান্য শাপ দিয়েছি। ঋষির শাপেই সে বিশালের কন্যা হয়ে জন্মেছে। তুমি একে গ্রহণ কর, এর পুত্র চক্রবর্তী হবে।

রাজপুত্র অবীক্ষিত সম্মত হয়ে তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন। তুম্বুরু যথাবিধি বৈবাহিক হোম করলেন, দেবতা ও গন্ধর্বরা গান করতে লাগলেন এবং নৃত্য আরম্ভ করলেন অপ্সরারা। মেঘ থেকে পুষ্পবর্ষণ হল, দেববাদ্য বেজে উঠল। তারপর তাঁরা তুলয়ের সঙ্গে গন্ধর্বলোকে গেলেন, অবীক্ষিতও ভামিনীর সঙ্গে সেখানে গিয়ে বিবিধ আমোদ আহ্লাদে বিচরণ করতে লাগলেন। সেখানেই বিহার করতে করতে ভামিনীর এক পুত্র জন্মাল। তার জন্য মহোৎসব শুরু হল—গান বাজনা ও অপ্সরাদের নৃত্য। তুম্বুরু এসে জাতকর্ম করলেন, দেবতা ও দেবর্ষিরা এলেন, এলেন শেষ বাসুকি তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা, যক্ষ ও গুহ্যক প্রধানরা। তাঁদের আগমনে গন্ধর্বলোক আকুল হয়ে উঠল।

তুম্বুরু জাতকর্মাদি শেষ করে বালকের স্বস্ত্যয়ন করলেন। তার পর অশরীরী বাণী শোনা গেল, তোমার গুরু বার বার মরুৎ শব্দ প্রয়োগ করলেন বলে এই বালক পৃথিবীতে মরুত্ত নামে বিখ্যাত হবে। ইনি চক্রবর্তী হয়ে সপ্তদ্বীপ বসুমতী ভোগ করবেন। এই দৈববাণী শুনে সমবেত সকলেই সন্তোষ লাভ করলেন।

তার পর অবীক্ষিত স্ত্রীপুত্র নিয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে নিজের পুরে ফিরলেন। তিনি নিজের পুত্রকে তাঁর পিতার কোলে দিয়ে বললেন, আমি মার কিমিচ্ছক ব্রতে আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এখন এই পৌত্রকে কোলে নিয়ে তার মুখ দেখুন। তার পর সব কথা তাঁকে নিবেদন করলেন। রাজা করন্ধম পৌত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দে অশ্রুপাত করে বললেন, আমি ভাগ্যবান। তিনি গন্ধর্বদের অর্ঘ্য দিয়ে সম্মান করলেন। পুরে সকলেই আনন্দে প্রবৃত্ত হল।

সেই বালক শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো বড় হতে লাগলেন; আচার্যদের নিকট বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র এবং ভার্গবের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করলেন। রাজা বিশালও দৌহিত্রের যোগ্যতার কথা শুনে আনন্দিত হলেন। একদিন রাজা করন্ধম অবীক্ষিতকে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, বনে যাব। তুমি রাজ্য গ্রহণ কর। অবীক্ষিতও তপস্যার জন্য বনে যেতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। তিনি বিনীত ভাবে বললেন, আমার মন থেকে লজ্জা এখনও যায় নি। আমি বন্দী হয়েছিলাম, আপনি আমাকে মোচন করেছিলেন, নিজের বীর্যে উদ্ধার পাই নি। নিজের পৌরুষ না থাকলে আমি কেমন করে পৃথিবী পালন করব! আপনি বরং অন্য কাউকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। পিতা বললেন, পিতা যেমন পুত্রের ভিন্ন নয়, পুত্রও তেমনি পিতার সমান। তোমাকে পিতাই মোচন করেছিল, অন্য কেউ নয়। পুত্র বললেন, হৃদয়কে আমি ফেরাতে পারব না। আজও আমার সে লজ্জা যায় নি। যারা পিতার উপার্জিত অর্থ ভোগ করে, পিতা যাদের কৃচ্ছ্র মুক্ত করেন

অথবা যারা পিতার নামে লোকসমাজে পরিচিত, আমাদের বংশে যেন তেমন কেউ না জন্মে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, পিতা বার বার বললেও অবীক্ষিত যখন রাজী হলেন না, তখন তাঁর পুত্র মরুত্তকেই রাজা করা হল এবং করন্ধম সস্ত্রীক তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন। সহস্র বৎসর তপস্যা করে তিনি ইন্দ্রলোকে গেলেন। তাঁর রাণী বীরাও ভার্গব ঔর্বের আশ্রমে থেকে শত বৎসর তপস্যা করলেন।

ক্রৌষ্টুকি বললেন, এবারে আমার মরুত্তের কথা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, পিতার আজ্ঞায় মরুত্ত পিতামহের রাজ্য পেয়ে ধর্মানুসারে প্রজা পালন ও বহু যজ্ঞ করেছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির ভ্রাতা সম্বর্ত তাঁর ঋত্বিক ছিলেন। শত যজ্ঞ করে তিনি ইন্দ্রকেও অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে গাথা রচিত হয়েছিল যে মরুত্তের সমান যজমান পৃথিবীতে হয় নি।

একদিন এক তপস্বী এসে বললেন, রাজা, নাগেরা তপস্বীদের দংশন করেছে দেখে আপনার পিতামহী বলে পাঠিয়েছেন যে আপনি যে রাজ্য শাসনে সমর্থ নন, তা প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। কেননা আপনার পিতামহ ও পূর্বপুরুষের আমলে যা ঘটে নি, এখন তা ঘটছে। নাগেরা পাতাল থেকে এসে সাতজন মুনিকে দংশন করেছে এবং জলাশয় দূষিত করেছে। রাজা না হওয়া পর্যন্তই ভোগ সুখে মত্ত হয়ে থাকা চলে, কিন্তু রাজার শরীর ভোগের জন্য নয়, ক্লেশ স্বীকার করে পৃথিবী পালন করতে হয়।

রাজা মরুত্ত এই কথা শুনে লজ্জিত হয়ে বললেন, ধিক্ আমাকে! এই বলেই শরাশন নিয়ে ঔর্বের আশ্রমে এসে পিতামহীকে প্রণাম ও তাপসদের বন্দনা করলেন। তারপর তিনি সর্পদষ্ট ঋষিকুমারদের দেখে বললেন, নাগেরা আমার বীর্যের অবমাননা করেছে। এবারে আমি এদের কী দশা করি তা দেবাসুর ও মানুষ দেখুক। এই

বলেই তিনি পাতাল ও পৃথিবীর সমস্ত নাগ বিনাশের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করলেন। সেই মহাস্ত্রের তেজে সমস্ত জ্বলে উঠল, হাহাকার করে উঠল নাগেরা। তারা বস্ত্র অলঙ্কার ত্যাগ করে পাতাল ছেড়ে মরুত্তের জননী ভামিনীর শরণাপন্ন হল। এক সময় তিনি তাদের অভয় দিয়েছিলেন বলে তারা এসে বলল, আপনার পুত্রকে নিবারণ করুন, আমাদের প্রাণ রক্ষা হোক। ভামিনী তাদের কথা শুনে স্বামীকে বললেন, এদের কথা আমি তোমাকে বলেছি, এরা এখন আমার শরণ নিয়েছে। তুমি মরুত্তকে নিবারণ কর, আমরা বললে সে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হবে। অবীক্ষিত বললেন, কোন গুরুতর অপরাধের জন্যই মরুত্ত বোধহয় ক্রুদ্ধ হয়েছে, কাজেই তার ক্রোধের শান্তি করা সহজ হবে মনে হয় না। নাগেরা বলল, আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি। আর্তের পরিত্রাণের জন্য ক্ষত্রিয়রা অস্ত্র ধারণ করেন। অবীক্ষিত বললেন, আমি তোমার পুত্রকে বলব নাগদের পরিত্রাণ করতে হবে। কিন্তু তাতে মরুত্ত যদি অস্ত্র সংবরণ না করে, তবে অস্ত্র দিয়েই আমাকে তার অস্ত্রের প্রতিষেধ করতে হবে। বলে তিনি ধনুর্বাণ হাতে স্ত্রীকে নিয়ে ভার্গব ঔর্বের আশ্রমে গেলেন।

সেখানে গিয়ে অবীক্ষিত দেখলেন যে তাঁর পুত্রের অস্ত্রের শিখা দিগন্তর ব্যাপ্ত করে অগ্নি উদ্‌গীরণ করছে এবং তা পাতালেও প্রবেশ করেছে। তিনি পুত্রকে বললেন, মরুত্ত, ক্রোধের বশীভূত না হয়ে তুমি অস্ত্র উপসংহার কর। পুত্র তাঁকে প্রণাম করে বললেন, তাত, এই নাগেরা গুরুতর অপরাধ করেছে। এরা ব্রহ্মহত্যা করেছে বলেই আমি এদের বধ করতে উদ্যত হয়েছি। আপনি কিছু বলবেন না। অবীক্ষিত বললেন, এই ব্রাহ্মণেরা নিহত হয়ে নরকে গেলেও তোমাকে আমার কথা রাখতে হবে। তুমি অস্ত্র প্রয়োগে নিবৃত্ত হও। মরুত্ত বললেন, এই পাপীদের নিগ্রহ না করলে আমাকেই নরকে যেতে হবে, কাজেই আমাকে নিবারণ করবেন না। অবীক্ষিত বললেন, নাগেরা আমার শরণাপন্ন হয়েছে, কোপে আর প্রয়োজন

নেই। মরুত্ত বললেন, এরা দুষ্ট ও অপরাধী, আমি এদের ক্ষমা করব না। নিজের ধর্ম লঙ্ঘন করে আমি কী ভাবে আপনার কথা রাখব!

পিতা এইভাবে বার বার বলার পরেও পুত্র যখন অস্ত্র উপসংহার করলেন না, তখন তিনি বললেন. পৃথিবীতে তুমিই কেবল অস্ত্রজ্ঞ নও, আমিও অস্ত্র পেয়েছি। বলে অবীক্ষিত কালাস্ত্র গ্রহণ করে ধনুকে যোজনা করলেন। তার থেকে শিখা উদ্গত হতে লাগল, সমুদ্র ও পর্বতও ক্ষুভিত হল। মরুত্ত উচ্চস্বরে বললেন, আমি দুষ্টের দমনের জন্য সংবর্তক অস্ত্র যোজনা করেছি, আপনাকে বধের জন্য নয়। আমি আপনার পুত্র। আমাকে বধের জন্য আপনি কেন কালাস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হয়েছেন? অবীক্ষিত বললেন, আমরা শরণাগত পরিত্রাণে সংকল্প করেছি, তুমি তার ব্যাঘাত করছ। হয় আমাকে বধ করে এই সব সর্পকে সংহার কর, তা না হলে তোমাকে বধ করেই আমাকে এদের রক্ষা করতে হবে। মরুত্ত বললেন, পিতা হোন বা গুরু হোন, প্রজা পালনে বিঘ্ন করলে রাজা তাকে অবশ্য বধ করবেন। স্বধর্ম পালন করা আমারও কর্তব্য।

মার্কণ্ডেয় বললেন, পিতাপুত্র উভয়ে পরস্পরকে বধে উদ্যত হয়েছে দেখে ভার্গবাদি মুনিরা এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং মরুত্তকে বললেন, পিতার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করা তোমার কর্তব্য নয়। অবীক্ষিতকেও বললেন, এই প্রখ্যাত বিক্রম পুত্রকে সংহার করা তোমারও উচিত নয়। মরুত্ত বললেন, আমি রাজা, আমার কর্তব্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। অবীক্ষিত বললেন, শরণাগতকে রক্ষা করা আমারও কর্তব্য। ঋষিরা বললেন, এই নাগেরা সভয়ে বলছে যে দুষ্ট নাগেরা যে ব্রাহ্মণদের দংশন করেছে, তাদের তারা বাঁচিয়ে দেবে। অতএব পিতাপুত্রের বিবাদে প্রয়োজন নেই। তোমরা দুজনেই ধর্মজ্ঞ ও নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ।

এই সময়ে অবীক্ষিতের জননী বীরা এসে বললেন, মরুত্ত আমার কথাতেই নাগদের বধ করতে উদ্যত হয়েছে। মৃত ব্রাহ্মণেরা যদি

জীবিত হন তাহলে আমার কথাও থাকবে এবং তোমার শরণাপন্নরাও বাঁচবে। মরুত্তের জননী ভামিনী বললেন, পাতালবাসী এই সর্পদের রক্ষা করতে আমিই আমার স্বামীকে বলেছিলাম।

মার্কণ্ডেয় বললেন, সেই নাগেরা দিব্য ওষধিজাত ও বিষ সংহরণ দিয়ে ব্রাহ্মণদের সঞ্জীবিত করল। মরুত্ত পিতাকে প্রণাম করলে অবীক্ষিত তাকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বীরা ও ঋষিদের নিকট বিদায় নিয়ে সকলে ফিরে গেলেন।

কঠিন তপস্যায় বীরা পতিলোক লাভ করলেন। মরুত্তের স্ত্রী বিদর্ভ কন্যা প্রভাবতী, সুবীর কন্যা সৌবীরা, মগধরাজ কেতুবীর্যের কন্যা সুকেশী, মদ্ররাজকন্যা কেকয়ী, কেকয়ের কন্যা সৌরিন্ধ্রী, সিন্ধুরাজকন্যা বপুষ্মতী এবং চেদিরাজকন্যা সুশোভনা। তাঁদের আঠারোটি পুত্র হয়। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও প্রধান নরিষ্যন্ত।।

নরিষ্যন্ত ও দমের উপাখ্যান

ক্রৌষ্টুকি বললেন, এইবারে মরুত্তের পুত্রদের কথা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মার্কণ্ডেয় বললেন, সাত হাজার বছর সমগ্র পৃথিবী ভোগ করে মরুত্ত নরিষ্যন্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে গেলেন। সেখানে একাগ্রচিত্তে তপস্যা করে তিনি দেবলোকে যান।

নরিষ্যন্ত বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করে ভাবলেন যে তাঁরা সকলেই পরাক্রান্ত যাগশীল ও দানশীল ছিলেন, তাঁরা করেন নি এমন কিছু করা দরকার। এই ভেবে তিনি এমন এক যজ্ঞ করলেন যা কেউ করেন নি। তিনি ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী এত ধন সম্পদ দান করলেন যে পরে আর যাজকতার জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না। পুনরায় যজ্ঞের জন্য যার কাছেই যান, তিনিই বলেন যে নিজেরা যজ্ঞ করেও আমরা আপনার দেওয়া ধন নিঃশেষ করতে পারি নি।

পৃথিবীপতি হয়েও তিনি ঋত্বিক ব্রাহ্মণ পেলেন না। তিনি দান করতে আরম্ভ করলে কেউ দান নিতে এল না। তিনি বললেন, কোন ব্রাহ্মণ ধনহীন নয়। এ সৌভাগ্যেরই কথা। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁর যজ্ঞ করেন। রাজা নরিষ্যন্ত এই রকমের ধর্মাত্মা বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম দম। বভ্রুর কন্যা ইন্দ্রসেনার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। জননীর জঠরে তিনি নয় বৎসর ছিলেন। এর জন্য জননীকে যে দম অবলম্বন করতে হয় এবং তিনিও দমশীল হবেন বলে পুরোহিতরা তার দম নাম রাখেন। রাজপুত্র দম নররাজ বৃষপর্বার নিকট ধনুর্বেদ, তপোবনবাসী দৈত্যরাজ তুন্দুভির নিকট অস্ত্রগ্রাম প্রয়োগ, শক্তির নিকট বেদ-বেদাঙ্গ এবং রাজর্ষি আষ্টিষেণের নিকট যোগ শিক্ষা করলেন।

দশার্ণের অধিপতি চারুকর্মার কন্যা সুমনা স্বয়ম্বরে দমকে পতিরূপে বরণ করলেন। এদিকে মদ্ররাজের পুত্র মহানন্দ সুমনার অনুরাগী ছিলেন। এ ছাড়াও বিদর্ভ রাজপুত্র ও সংক্রন্দনের পুত্রও সুমনার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরা তিনজন দমকে বরণ করতে দেখে পরস্পর মন্ত্রণা করলেন, চল, আমরা এই কন্যাকে সবলে গৃহে নিয়ে যাই। এ আমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই বরণ করে ধর্মপত্নী হতে পারে; আর তা না করলে দমকে যে বধ করবে সে তারই স্ত্রী হবে। তিনজনে এই কথা ঠিক করে সেই কন্যাকে গ্রহণ করলেন। রাজাদের মধ্যে অনেকেই চিৎকার করে উঠলে দম সবার দিকে চেয়ে বললেন, স্বয়ম্বরকে লোকে ধর্মকার্য বলে, কাজেই বলুন এঁরা সবলে এই কন্যাকে গ্রহণ করে ধর্ম না অধর্ম করেছেন। এ যদি অধর্ম না হয়, তাহলে এই কন্যায় আমার প্রয়োজন নেই। নতুবা আমার এ প্রাণ রাখার প্রয়োজন নেই। রাজা চারুকর্মা অন্য রাজাদের বললেন, দম ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে যা বললেন, আমার যাতে ধর্ম লোপ না হয় আপনারা তার মীমাংসা করুন। কোন রাজা বললেন, পরস্পর অনুরাগ

থাকলে গান্ধর্ব বিধিই প্রশস্ত। ধর্মানুসারে আপনার কন্যা দমেরই পরিগ্রহ, অন্য কারও নয়। অন্য রাজারা বললেন, ক্ষত্রিয়রা শস্ত্র-জীবী, তাই রাক্ষস বিধিই তাদের অসাধারণ ধর্ম। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে কন্যা হরণ করলে রাক্ষস বিবাহ অনুসারে তারই পরিগ্রহ হবে। এইজন্যই মহানন্দরা এই কাজ ধর্ম বলে মনে করছেন। আগের রাজারাও মেনে নিলেন যে ক্ষত্রিয়দের রাক্ষস বিধিও প্রশস্ত কল্প। কিন্তু পিতার যখন কন্যা সম্প্রদানে অধিকার আছে, তখন দমই এই কুমারীর প্রকৃত বর। পিতার নিকট থেকেই কন্যা হরণ করাকে রাক্ষস বিধি বলে, স্বামীর পরিগৃহীতা কন্যা হরণকে তা বলে না। সুমনা যখন সমস্ত রাজাদের সামনে দমকে বরমাল্য দিয়েছে, তখন গান্ধর্ব মতেই বিবাহ হয়েছে, রাক্ষস বিধানে নয়।

দম এই কথা শুনে ধনুর্যোজনা করে বললেন, যদি কেউ বল প্রয়োগ করে আমার সামনেই আমার স্ত্রীকে হরণ করে তাহলে আমি ক্লীব হয়ে জন্মেছি, পুরুষ নই। আর সুন্দরী সুমনা যাঁর স্ত্রী না হবেন, তাঁর জীবনেই বা প্রয়োজন কী! এই বলে তিনি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হলেন। সেই রাজপুত্রদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে দম মহানন্দের মাথা কাটলেন। তার মৃত্যুর পরে অন্য রাজারা যুদ্ধে নিরস্ত হলেন। শুধু দাক্ষিণাত্যের কুণ্ডিনাধিপতি মহীপালের পুত্র বপুষ্মান যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু দমের আঘাতে ভূতলে পড়ে আর যুদ্ধ করলেন না; সুমনাকে নিয়ে দম প্রস্থান করলেন। দর্শনরাজ প্রীত হয়ে দমের সঙ্গে সুমনার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে দম নানাবিধ যৌতুক নিয়ে দেশে ফিরলেন।

তাঁরা ফিরে এলে নরিষ্যন্তের পুরে মহোৎসব হল। উভয়ে পিতামাতাকে প্রণাম করলেন। পরে নানা রমণীয় স্থানে বিহার করতে লাগলেন।

রাজা নরিষ্যন্ত পরিণত বয়সে দমকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে পত্নী ইন্দ্রসেনার সঙ্গে বনে গিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। একদিন

সংক্রন্দনের পুত্র বপুষ্মান মৃগয়ায় এসে তাঁদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে? নরিষ্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন বলে ইন্দ্রসেনা সব কথা বললেন। বপুষ্মান তাঁর শত্রুর পিতার পরিচয় পেয়ে 'এতদিনে পেয়েছি' বলে রাজার জটাজূট ধরে খড়্গ হাতে বললেন, যে আমাকে জয় করে সুমনাকে হরণ করেছে, তার পিতাকে আমি বধ করব। দম এসে রক্ষা করুক। বলে ইন্দ্রসেনার সামনেই নরিষ্যন্তের মাথা কেটে ফেললেন। তাই দেখে মুনিরা ও বনবাসীরা তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

বপুষ্মান চলে যাবার পর ইন্দ্রসেনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একজন শূদ্র-তাপসকে পুত্রের নিকট পাঠালেন। বললেন, তুমি তো স্বচক্ষে সব দেখেছ, তুমি আমার পুত্রকে সব কথা বল। বোলো যে আশ্রমবাসী তাপসদের যে সে রক্ষা করছে না, তা ঠিক হচ্ছে না। বপুষ্মান তার পিতাকে বধ করে নি, এ আঘাত তাকেই করা হয়েছে। পুরাকালে পিতার মৃত্যু কেউই সহ্য করে নি। তারও তা করা উচিত নয়। এই সব কথা বলে ইন্দ্রদাসকে বিদায় দিয়ে ইন্দ্রসেনা পতির দেহ আলিঙ্গন করে আগুনে প্রবেশ করলেন।

ইন্দ্রদাস দমকে সব কথা জানালে ঘৃতাহুত অগ্নির মতো তিনি জ্বলে উঠলেন। বললেন, আমি জীবিত থাকতে আমার পিতাকে বপুষ্মান অনাথের মতো বধ করল! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই তো আমরা নিযুক্ত আছি। বিলাপ না করে যদি তার রক্তে আমি পিতার তর্পণ না করি, তাহলে আমি আগুনে প্রবেশ করব।

এই প্রতিজ্ঞা করে দম মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বপুষ্মানের উদ্দেশে যুদ্ধ যাত্রা করলেন এবং সীমাপালদের সংহার করতে করতে ত্বরায় দক্ষিণে অগ্রসর হলেন। তিনি নিকটস্থ হলে বপুষ্মানও সসৈন্যে নগর থেকে বহির্গত হয়ে দূতের মুখে বলে পাঠালেন, তোমার পিতা তোমার অপেক্ষা করছেন। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে শীঘ্র এসো।

এই কথা শুনে দম এগিয়ে গিয়ে বললেন, পুরুষ কথায় গর্ব করে না।

তারপর দুজনের তুমুল যুদ্ধ বাধল। দেবতা সিদ্ধ ও গন্ধর্বরা এই যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। বপুষ্মানের সেনাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হলে সেনারা পলায়ন করল। দম বপুষ্মানকে বললেন, আমার পিতা শস্ত্র ত্যাগ করে তপস্যা করছিলেন বলে তাঁকে তুমি হত্যা করেছ, এখন পালাচ্ছ কোথায়?

বপুষ্মান নিবৃত্ত হয়ে সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দম একে একে বপুষ্মানের সাত পুত্র অনুজবর্গ সম্বন্ধী ও মিত্রদের বধ করে তারই সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ শুরু করলেন। এক সময়ে তাকে মাটিতে ফেলে বললেন, আমি এই ক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ককে বধ করছি। সকলে দেখুন। বলে অসির আঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। তিনি তাঁর রক্তে স্নান করতে উদ্যত হলে দেবতারা তাঁকে প্রতিষেধ করলেন। দম তাঁর রক্তে উদক ক্রিয়া ও মাংসে পিণ্ডদান করে পিতার ঋণ শোধের পর নিজের পুরে ফিরে এলেন।

সূর্যবংশে এই রকম রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ফলশ্রুতি

পক্ষীরা বললেন, মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকিকে বিদায় দিয়ে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধান করলেন। আমরা তাঁর নিকটে যা শুনেছিলাম তা বললাম। স্বয়ং স্বয়ম্ভু মার্কণ্ডেয়কে এই অনাদি সিদ্ধ বিষয় বলেছিলেন। এই পুণ্য ও পবিত্র কথা পাঠ বা শ্রবণ করলে আয়ুবৃদ্ধি হয়, কামার্থ সিদ্ধি হয় ও পাতকে উদ্ধার হওয়া যায়। পিতামহ যে অষ্টাদশ পুরাণ কীর্তন করেছেন, তার মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ সপ্তম। ব্রাহ্ম পাদ্ম বৈষ্ণব শৈব ভাগবত নারদীয় মার্কণ্ডেয় আগ্নেয় ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত নৃসিংহ বারাহ স্কন্ধ বামন কৌর্ম মাৎস্য গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ বা নিত্য ত্রিসন্ধ্যা জপ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের

ফল পাওয়া যায়। তার মধ্যে এই চতুর্বিধ প্রশ্ন সমন্বিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠ বা শ্রবণে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। এই পুরাণ পাঠ শেষ হলে উৎসব করে দান করতে হয়।

জৈমিনি বললেন, ভারতেও আমার যে সন্দেহ দূর হয় নি আপনারা তা করলেন। আপনাদের মঙ্গল হোক। বলে জৈমিনি তাঁদের পূজা করে নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ সমাপ্ত